কিডনী রোগ

সম্পাদনায়
অধ্যাপক মতিউর রহমান
ডাঃ হোসনে আরা বেগম চারু

প্রকাশক ও গ্রন্থস্বত্ব ঃ (১) ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
(২) অধ্যাপক মতিউর রহমান
৬১, সায়েন্স ল্যাবরেটরী রোড (চার তলা)
ঢাকা।

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ মোঃ শফিউল আলম আজাদ
ভিতরে ছবি এঁকেছেন ঃ ফারুক আহমেদ
ভিতরে ছবি তুলেছেন ঃ আব্দুর রহমান

মুদ্রণ ঃ বিকাশ মুদ্রণ
৩/১ গার্ডেন রোড (পশ্চিম তেজতুরী বাজার)
ঢাকা– ১২১৫

মূল্য ঃ দুই শত টাকা ।

KIDNEY ROG, A Bengali text book on Kidney Diseases,
Edited by Prof Matiur Rahman & Dr. Hosne Ara Begum (Charu).
Published by Dr. Md. Tahminur Rahman (Sajal) & Prof Matiur Rahman

উৎসর্গ

যাদের ত্যাগ ও অনুপ্রেরণায় এ পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হয়েছে —

মিসেস সামসুন্নাহার রহমান
মায়া, ইভা, মামুন ও মারুফ
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
সজনী, স্বর্ণালী ও স্বরূপা

প্রস্তাবনা

এককালে অনেক প্রতিরোধযোগ্য কিংবা দুরারোগ্য ব্যধি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা ছিলনা বলে কত লোক প্রাণ হারিয়েছে তার হিসাব মেলা মুস্কিল। বিগত দুই দশকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশাতীত অগ্রগতি লাভ হয়েছে। বিশ্বজোড়া গবেষণার সুফল আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করে থাকি। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি এখন চিকিৎসকের কবলে, এমনিক সম্পূর্ণ নির্মূল করাও সম্ভব। গুটি বসন্ত প্রতিরোধের ফলে এখন সম্পূর্ণ নির্মূল। ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, হাম, পোলিও এখন প্রতিরোধের আওতায়। সামগ্রিকভাবে যাচাই করে দেখলে স্বীকার করতে হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দিন দিন এগিয়ে চলেছি।

যে বিষয় নিয়ে এই পুস্তক প্রণয়ন এবং যার সম্বন্ধে প্রস্তাবনা লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে স্মরণকালে গবেষণার ফলে তার অগ্রগতি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। শুধু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নয়, নিরাময়ের দিকেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবদান এখানে অনস্বীকার্য্য। একদিতে যেমন কিডনী রোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সম্যক উপলব্ধির ফলে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ যান্ত্রিক সাহায্যে আমরা এককালীন দুর্বিসহ জীবনকে শুধু দীর্ঘায়িত নয় বরং সুখময় করে তুলি, অন্যদিকে তেমনি সার্থক সংযোজনের ফলে অনেক অসহায় রোগীর মুখে আশার সঞ্চার করতে পারি।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে যদি প্রয়োগের সুযোগ না থাকে, জনগণ যদি এর থেকে বঞ্চিত হয় তবে সে অবস্থা শুধু দুঃখের নয়, যে কোন জাতির জন্য শুধু লজ্জার নয়, বলতে গেলে অপমানেরও। সাম্প্রতিককালে এতদিনের অবহেলিত কিডনী রোগ একদিকে যেমন সরকারের দৃষ্টি আর্কষণ করেছে অন্যদিকে তেমনি কিছু সংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সকলের মনে আশার সঞ্চার করেছে।

বিষয় যাই হোক না কেন, বিজ্ঞানের যে কোন শাখাই হোক না কেন প্রয়োগের পুর্বশর্ত, উপলব্ধির প্রধান উপকরণ জ্ঞান। কিডনী রোগের বিভিন্ন দিক এই পুস্তকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকগণ সংকলন /রচনা করেছেন।

চিকিৎসা পেশায় যারা নিয়োজিত তাদের উদ্দেশ্যেই এই প্রকাশনা। মাতৃভাষায় সংকলিত হওয়ার ফলে অনেক পাঠক নিঃসন্দেহে এতে উপকৃত হবেন।

বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব যারা হাতে নিয়েছেন এবং যারা বিভিন্ন পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানই। তাদের নিরলস প্রচেষ্টা সফল হউক। যাদের উদ্দেশ্যে এই বইটি লেখা তারা এর সদ্ব্যবহার করুক। দেশের প্রতিটি অঞ্চলের অগণিত কিডনী রোগীরা এ রোগের সু–চিকিৎসা ভোগ করুক এই কামনা করি ।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম
জাতীয় অধ্যাপক

ভূমিকা

আজকাল খবরের কাগজের পাতা খুললেই যে রোগটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, উৎকণ্ঠিত করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ভাবে এবং যে রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল তা হোল কিডনী রোগ বিশেষতঃ কিডনী ফেইলার বা কিডনী অকেজো হয়ে যাওয়া। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে কিডনী রোগ একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা। দু'একটি পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশে কিডনী রোগের ব্যাপকতা সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। পি, জি, হাসপাতালের নেফ্রোলজী বিভাগের ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৯ সালের ভর্ত্তির পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে শতকরা প্রায় ৪৬ জন রোগী ক্রনিক রেণাল ফেইলারে ভুগছে। কিডনী রোগের উপর দেশে পরিচালিত গবেষণা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ধারণা করা হয় যে বাংলাদেশের মোট ৫০ লক্ষ লোকের কোন না কোন কিডনী রোগ রয়েছে এবং প্রতি বৎসরে ১৫,০০০ রোগীর কিডনী একেবারেই অকেজো হয়ে যাচ্ছে এবং পরিণতিতে মৃত্যুবরণ করছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বহির্বিভাগ এর ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সালের রোগীর ভর্ত্তির পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে শতকরা ৩ জন রোগীর কোন না কোন কিডনী রোগ আছে। কিডনীর রোগ সমূহ হাসপাতালের ভর্ত্তির অষ্টম কারণ এবং মৃত্যুর কারণগুলোর মধ্যে চতুর্থ প্রধান কারণ। অন্যদিকে শিশুদের (২—১০ বৎসর) মধ্যে একুইট কিডনী ফেইলার এর প্রকোপ আমাদের দেশে খুব বেশী। ১৯৮৩—১৯৮৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৩০০ শিশু পি, জি, হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে শুধু একটি রোগে—এই একুইট কিডনী ফেইলিওর এবং এদের শতকরা ৯০ ভাগ মৃত্যুবরণ করেছে। অন্য আর একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় যে স্কুল ছাত্র—ছাত্রীদের শতকরা ০.৮ জনের নেফ্রাইটিস এবং শতকরা প্রায় ১.৫ জনের কিডনীর প্রদাহ বা ইনফেকশান আছে। উন্নত বিশ্বের মধ্যে আমেরিকায় বৎসরে কমপক্ষে ৩৫,০০০ লোক কিডনী রোগে মারা যায়। সেখানে মেয়েদের সর্বমোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০% বিভিন্ন ধরণে কিডনীর প্রদাহে জীবনের কোন না কোন সময়ে ভুগে থাকেন। আবার আমেরিকার মোট জনসংখ্যার শতকরা ১% বেঁচে থাকা অবস্থায় কোন না কোন সময়ে কিডনীতে পাথর হয়। সুতরাং কিডনী রোগের ব্যাপকতা শুধু বাংলাদেশেই নয় বরং উন্নত বিশ্বেও প্রায় একইভাবে বিরাজমান।

এন্ড ষ্টেজ রেণাল ফেইলার হলে রোগীর ডায়ালাইসিস বা

ট্রান্সপ্লান্টেশান প্রয়োজন। এগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ এবং উন্নয়নশীল দেশে সবার পক্ষে এই চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব নয় ফলে এ সমস্ত রোগীর মৃত্যু অপরিহার্য্য। কিডনী রোগের এই ব্যাপকতার কথা চিন্তা করে সরকার একটি জাতীয় কিডনী ট্রাষ্ট গঠন করেছেন। এই প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ ইতিমধ্যেই পি, জি, হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রুগীর নিয়মিত হেমোডায়ালিসিস হচ্ছে এবং কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন সাফল্যজনকভাবে করা হচ্ছে। একটি জাতীয় কিডনী ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কাজও এগিয়ে চলেছে। পি, জি হাসপাতলের কিডনী বিভাগটির প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় যারা সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে তদানিন্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী অধ্যাপক এ, কিউ, এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও তৎকালিন পি, জির পরিচালক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিডনী রোগের এই ব্যাপকতা সত্ত্বেও পরিতাপের বিষয় হোল কিডনী রোগ সম্পর্কে জনসাধারণ এবং রোগীদের অসচেতনতা, চিকিৎসক ও মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের কিডনী রোগ সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞানের অভাব। উপরন্তু বিদেশী ভাষায় কিডনী রোগের উপর পুস্তক প্রকাশনার প্রাচুর্য্য থাকলেও মাতৃভাষায় কিডনী রোগ সম্পর্কিত কোন পুস্তক নাই। মূলতঃ এই কয়টি কারণই আমাদের এই বই লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে।

যারা এই পুস্তক রচনায় সাহায্য করেছেন বিশেষতঃ ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল), ইফতেখার হাসান খান, ডাঃ জাফর উল্লাহ সিকদার, ডাঃ মানোয়ার আহসান, মোমিনুল হক, মোঃ রফিকুল ইসলাম, এম, এম, হায়াত সেকেন্দার, তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। যদি কোন ডাক্তার, ছাত্র, রোগী বা জনসাধারণ এই পুস্তক পড়ে সামান্যতম উপকৃত হন তাহলে আমাদের প্রচষ্টা সার্থক মনে করব। বহু আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কিছু ভুল—ত্রুটি হয়ত এ পুস্তকে আছে এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকদের কাছ থেকে বইটির গঠন মূলক সমালোচনা আশা করি যা আমাদের ভবিষ্যত প্রচেষ্টা আরও সুন্দর করবে। পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহতালার কাছে শোকরিয়া জানাই বইটির সমাপ্তি ও প্রকাশে।

ঢাকা
২১/৭/৯০ ইংরেজী
৫/৫/১৩৯৬ বাংলা

অধ্যাপক মতিউর রহমান

ডাঃ হোসনে আরা বেগম (চারু)

এই বইয়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ রচয়িতাদের অবস্থান

১। **অধ্যাপক মতিউর রহমান**
এমবিবিএস (ঢাকা), এফআরসিপি (ইউ কে),
এফসিপিএস (বাংলাদেশ),
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, নেফ্রোলজী,
আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

২। **অধ্যাপক এম, এ, ওয়াহাব**
এমবিবিএস (ঢাকা), এফআরসিএস (এডিনবরা)
এফআরসিএস (ইং)
অধ্যাপক সার্জারী (ইউরোলজী),
আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

৩। **অধ্যাপক গোলাম রসুল**
এমবিবিএস, এফআরসিএস,
পরিচালক, মেডিকেল এডুকেশান ও জনশক্তি উন্নয়ন,
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৪। **মেজর জেনারেল কে, এম, সিরাজ জিন্নাত**
এমবিবিএস, এফআরসিএস
কনসালটেন্ট সার্জন, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা।

৫। **অধ্যাপক মোঃ খলিলুর রহমান**
অধ্যাপক, এনাসথেশিয়া বিভাগ,
আইপিজিএমআর, ঢাকা।

৬। **অধ্যাপক কে, এম, ইকবাল**
এমবিবিএস (ঢাকা), ডিএ, এফএফএআর,
সিএস (আই), এফএফএআরসিএস,
অধ্যাপক, এনাসথেসিওলজী, আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

৭। **অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন**
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ব্লাড ট্রান্সফিউশন
আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

৮। **ডাঃ হারুণ উর রশীদ**
এমবিবিএস (রাজশাহী), এফসিপিএস (বাংলাদেশ),
পি.এইচ. ডি (ইউ কে),
সহযোগী অধ্যাপক, নেফ্রোলজী,
আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

৯। **ডাঃ সাজ্জাদুর রহমান**
এমবিবিএস, এফআরসিএস,
সহযোগী অধ্যাপক, পেডিয়াট্রিক্স সার্জারী
আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

১০। **ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান**
এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিপিএস (বাংলাদেশ),
এমএসসি (ইউ কে),
সহযোগী অধ্যাপক, নেফ্রোলজী,
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

১১। **ডাঃ হোসনে আরা বেগম (চারু)**
এমবিবিএস (ঢাকা), এম.ফিল এনাটমী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়),
এমএসসি (এনাটমী এবং এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথলজী, ইউকে)
সহযোগী অধ্যাপিকা, এনাটমী,
আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

১২। **ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)**
এমবিবিএস (ঢাকা), এমফিল প্যাথলজী (ঢাঃ বিঃ),
কোর্স কো-অর্ডিনেটর (সহকারী অধ্যাপক) ও বিভাগীয়
প্রধান, মাইক্রোবায়োলজী, বারডেম, শাহবাগ, ঢাকা।

১৩। **ডাঃ দীপ্তি চৌধুরী**
এমবিবিএস (চট্টগ্রাম), এফসিপিএস (বাংলাদেশ),
সহযোগী অধ্যাপক, নেফ্রোলজী,
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

১৪। **ডাঃ এস. এ. এম. গোলাম কিবরিয়া**
এমবিবিএস, এফসিপিএস,
সহযোগী অধ্যাপক, ইউরোলজী বিভাগ
আইপিজি এম এণ্ড আর, ঢাকা।

১৫। **ডাঃ এম. এ. সালাম**
এমবিবিএস, এফসিপিএস,
সহকারী অধ্যাপক, ইউরোলজী বিভাগ,
আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

১৬। **ডাঃ এ. কে. এম. আনোয়ারুল ইসলাম**
এমবিবিএস, এফসিপিএস,
সহকারী অধ্যাপক, ইউরোলজী,
আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

১৭। **ডাঃ জুবায়ের আহমেদ**
এমবিবিএস, ডিবিএসটি,
সহকারী অধ্যাপক, ব্লাড ট্রান্সফিউশন
আইপিজিএম এণ্ড আর, ঢাকা।

১৮। **মিসেস শানে আরা কবীর**
সহকারী পরিচালক,
ডায়েট ও পুষ্টি, বারডেম, শাহবাগ, ঢাকা।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পৃষ্ঠা

১. **কিডনীর এনাটমী** ১
ডাঃ হোসনে আরা বেগম (চারু)
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

২. **কিডনীর ফিজিওলজী** ৮
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
ডাঃ হোসনে আরা বেগম (চারু)

৩. **কিডনী রোগের লক্ষণ ও রোগ নির্ণয়** ১৪
অধ্যাপক মতিউর রহমান
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

৪. **কিডনী রোগ সম্পৃক্ত ফ্লুইড এবং ইলেকট্রোলাইট এর অস্বাভাবিকতা (সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং এসিড বেস ব্যালান্স)** ৩৫
অধ্যাপক মতিউর রহমান
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. **জন্ম ও বংশগত কিডনী রোগ সমূহ** ৬০
ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

২. **ইউরিনারী ট্রাকট ইনফেকশন** ৬৭
অধ্যাপক মতিউর রহমান

৩. **গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটস** ৭৬
অধ্যাপক মতিউর রহমান

৪. **কিডনী সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য কিছু সিসটেমিক রোগ (এস এল ই ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশান)** ১০১
অধ্যাপক মতিউর রহমান
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

৫. **কিডনী পাথুরে রোগ** ১২৮
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
ডাঃ হারুন উর রশীদ

৬. **কিডনীর টিউমার** ১৩৪
অধ্যাপক এম, এ, ওয়াহাব
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

৭. **গর্ভাবস্থা ও কিডনী** ১৪০
অধ্যাপক মতিউর রহমান
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

৮. **জেনিটো ইউরিনারী টিউবারকুলোসিস** ১৪৬
অধ্যাপক মতিউর রহমান
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

তৃতীয় অধ্যায়

১. **একুইট রেনাল ফেইলার** ১৫২
অধ্যাপক মতিউর রহমান

২. **ক্রনিক রেনাল ফেইলার** ১৬০
ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান

৩. **পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস** ১৬৬
ডাঃ দিপ্তী চৌধুরী

৪. **হেমোডায়ালিসিস** ১৭৬
অধ্যাপক মতিউর রহমান

চতুর্থ অধ্যায়

১. **কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশন**
(ক) **ইমিউনোবায়োলজী ও রিজেকশনের পূর্ব চিহ্ন** ১৮৩
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
(খ) **কিডনী সংযোজনঃ মেডিকেল দিক** ১৯৬
ডাঃ হারুন উর রশীদ

(গ) কিডনী সংযোজনঃ সার্জিকাল দিক ২০৪
অধ্যাপক গোলাম রসুল
মেজর জেনারেল কে, এম, সিরাজ জিন্নাত
অধ্যাপক এম, এ, ওয়াহাব
ডাঃ সাজ্জাদুর রহমান
ডাঃ এস, এ, এম, গোলাম কিবরিয়া
ডাঃ এম, এ, সালাম
ডাঃ এ, কে, এম, আনোয়ারুল ইসলাম

(ঘ) কিডনী সংযোজন ও এনাসথেসিয়া ২০৮
অধ্যাপক কে এম, ইকবাল
অধ্যাপক খলিলুর রহমান
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

(ঙ) কিডনী সংযোজনে ব্লাড ট্রান্সফিউশানঃ
ভাল ও খারাপ দিক ২১৫
অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন
ডাঃ জুবায়ের আহমেদ
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

(চ) কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশান এর আর্থ—
সামাজিক ও আইনগত দিক ২২০
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
অধ্যাপক মতিউর রহমান

(ছ) রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশণের তাৎক্ষণিক
ও সুদুর প্রসারী জটিলতা ২২৫
অধ্যাপক মতিউর রহমান
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

পঞ্চম অধ্যায়

১। কিডনী রোগীর খাদ্য ২৩১
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
মিসেস শানেয়ারা কবীর
অধ্যাপক মতিউর রহমান

২। কিডনী রোগ প্রতিরোধ ২৪২
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
ডাঃ হোসনে আরা বেগম (চারু)

৩। কিডনীর জন্য ক্ষতিকারক ঔষধ সমূহ ২৪৬
অধ্যাপক মতিউর রহমান
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

৪। কিডনী রোগ সম্পর্কিত কিছু বায়োকেমিকেল
টেষ্টের স্বাভাবিকমান ২৫৪
ডাঃ মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. পরবর্তী পড়ার জন্য ২৫৯
২. পরিশিষ্ট ২৬২
৩. শুদ্ধিপত্র ২৬৪

১ম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

কিডনীর এনাটমী
(ANATOMY OF KIDNEY)

হোসনে আরা বেগম (চারু)
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

কিডনী বা বৃক্ক হচ্ছে শরীরের দুটো অত্যন্ত জরুরী অর্গান বা অংগ যা স্বাভাবিক ভাবে শিরদাঁড়ার দু-পার্শ্বে পেটের ভিতর পেছন দিকে থাকে। এদের আকৃতি অনেকটা বাংলা ৫ অংকের মত। এদের কার্য্যকরী বা ফাংশনাল ইউনিট হচ্ছে নেফ্রন যা প্রতিটি কিডনীতে ১০ লক্ষের মত থাকে।

ভ্রূণতত্ব বা এমব্রায়োলজিক্যালী পূর্ণ বয়স্ক বা প্রাপ্ত বয়স্কলোকের কিডনী বা মেটানেফ্রোন আদিম বা প্রিমিটিভ অংগ প্রোনেফ্রস এবং মেটানেফ্রোন এর প্রত্যাবৃত্তি বা রিগ্রেশনের মাধ্যমে তৈরী হয়। কিডনীর কালেকটিং সিষ্টেম নির্গমন নালী বা উলফিয়ান ডাক্ট থেকে সৃষ্টি হয়। এই নালী পরবর্তীতে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং রেণাল ক্যালিস এবং কালেকটিং টিবিউলে রুপান্তরিত হয়। কার্য্যকরী নেফ্রনতৈরী হয় মেটানেফ্রন থেকে এবং তা কালেকটিং সিষ্টেমের সম্প্রসারণশীল অংশের সংগে সংযুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং একটি জিনিষ পরিস্কার যে কিডনীর জন্মগত দোষ বা ত্রুটি মেটানেফ্রোস, কালেকটিং সিষ্টেম বা উভয়েরই ভ্রূণগত সময়ে বাড়ন্তের ত্রুটির জন্য হতে পারে।

প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের কিডনীর ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম। বৃক্ক-নালী বা ইউরেটার যখন কিডনীর হাইলাসে প্রবেশ করে এটা ফানেল এর মত একটি গহ্বর তৈরী করে যার নাম হচ্ছে পেলভিস। এই পেলভিস থেকে ২ থেকে ৩ টা প্রধান শাখা বের হয় যাদের বলা হয় মেজর ক্যালিসেস এবং এরা প্রত্যেকে পরবর্তীতে ৩ থেকে ৪ টা উপ শাখায় বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে যাদের বলা হয় মাইনর ক্যালিসেস। প্রতিটি স্বাভাবিক কিডনীতে প্রায় ১২ টা মাইনর (৮ - ১৫ টা) ক্যালিস থাকে। একটি কিডনীকে লম্বা লম্বি ভাবে দুভাগ করলে দুটো পরিস্কার ভাগ দেখা যায়। (ছবি - ১) বাহিরের ১.২ থেকে ১.৫ সেন্টিমিটার

banglainternet.com

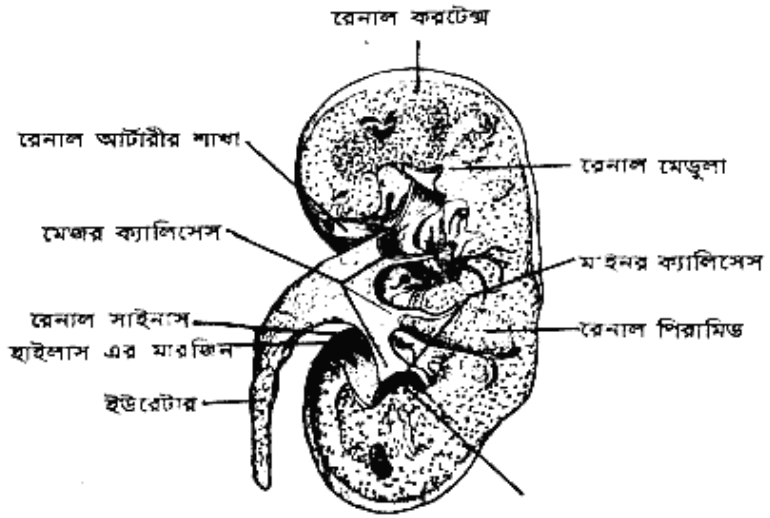

ছবি ১ লম্বালম্বিভাবে কাটলে বা লংগীটুডিনাল সেকশনে কিডনীর গঠন প্রণালী।

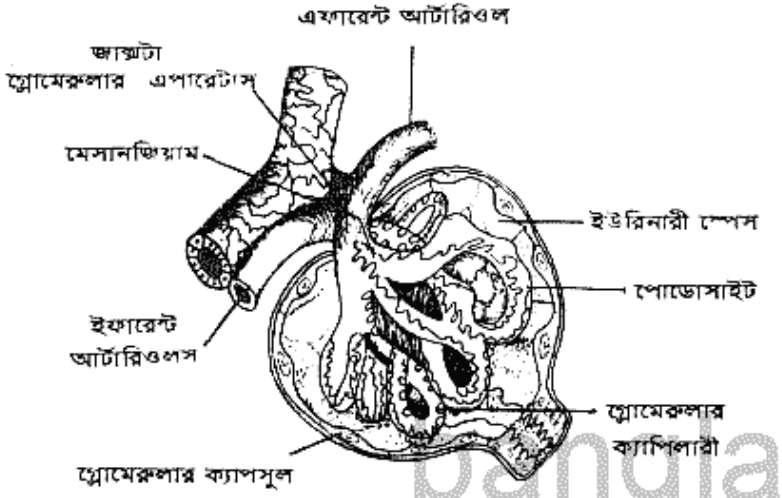

ছবি ২ নেফ্রোনের গঠন প্রণালী ও এর বিভিন্ন অংশ।

অংশ কে বলা হয় করটেক্স এবং বাকী ভিতরের অংশকে বলা হয় মেডালা। মেডালার মধ্যে থেকে রেণাল পিরামিড যাদের টিপসকে বলা হয় প্যাপিলা। প্রত্যেক প্যাপিলা ক্যালিক্স এর সংগে সম্পৃক্ত।

রোগের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী কিডনীর প্রধান পাঁচটি অংশ হচ্ছে ঃ

(ক) রক্ত নালী বা ব্লাড ভেসেল (খ) গ্লোমেরুলাই বা কৈশিকাগুচ্ছ (গ) টিবিউলস (ঘ) জাকসটাগ্লোমেরুলার এপারেটাস এবং (ঙ) ইন্টারষ্টিশিয়াম।

রক্তনালী বা ব্লাডভেসেলস্ ঃ

যদিও দুটো কিডনীর ওজন শরীরের মোট ওজনের মাত্র ০.৫% তথাপি প্রতিটি কিডনীই রক্ত চলাচলের জন্য খুব উপযোগী, কার্ডিয়াক আউটপুট এর প্রায় ২৫ % তারা গ্রহণ করে। এর মধ্যে আবার কিডণীর কর্টেক্স এর ভিতর প্রায় ৯০% রক্ত চলাচল করে এবং বাকী ১০% মেডালা গ্রহণ করে। মানুষের বেলায় কিডনীর প্রধান ধমনী বা রেণাল আর্টারী হাইলাসে প্রধান দুটি শাখায় (এন্টেরিয়ার ও পোষ্টেরিয়ার) বিভক্ত হয়। এই প্রধান শাখা থেকে ইন্টারলোবার আর্টারী বের হয় এবং লোবের মাঝে খান দিয়ে যায়। এর পর যখন করটেক্স ও মেডালার সন্ধিক্ষণ বা জাংশন আসে তখন এগুলো আর্কুয়েট ধমনী হিসাবে এবং পরবর্তীতে ইন্টারলোবুলার আর্টারিওলস হিসাবে করটেক্স এ প্রবাহিত হয়। এই ইন্টারলোবুলার আর্টারিওলস করটেক্স এর পার্পেনডিকুলার ভাবে থাকে। ইন্টারলোবুলার আর্টারী থেকে এফারেন্ট আর্টারিওলস বের হয় এবং গ্লোমেরুলার টাফ্ট বা কৈশিকাগুচ্ছে প্রবেশ করে ২০ থেকে ৪০ টি ভাগে ভাগ হয়ে অনেক একক বা লোবিউলস তৈরী করে। এইগুলিই পুণরায় একত্রিত হয়ে ইফারেন্ট আর্টারিওলস হিসেবে গ্লোমেরুলাই থেকে বের হয়ে যায় ভাসারেকটা হিসেবে।

রেণাল ভেসেল বা কিডনীর রক্তনালীর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। যেমন এগুলো যেহেতু এণ্ড আর্টারিজ এর অত সেজন্য এর যে কোন শাখা বন্ধ হয়ে গেলে বা অক্লুডেড হয়ে কিডনীর যে জায়গায় এরা রক্ত সঞ্চালন করে সেখানে ইনফারশন বা কলা বিনষ্টি করে। যেহেতু মেডালায় রক্ত সঞ্চালন একটু অল্প এবং সেখানে রক্ত সংবহন কম হয় সেজন্য মেডালায় ইসকিমিয়া হওয়ার প্রবণতা খুব বেশী। আবার করটেক্স যেহেতু খুব ভাসকুলার সেজন্য হাইপারটেনসিভ বা উচ্চরক্তচাপজনিত ইসকিমিয়া বা প্রতিক্রিয়া করটেক্স এ বেশী পরিলক্ষিত হয়। গ্লোমেরুলাস এ কোন রোগ হলে টিবিউলস এর উপরও

banglainternet.com

এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় কারণ টিবিউলস এর ক্যাপিলারীগুলো সাধারণত ইফারেন্ট আর্টারিওলস থেকে উদ্ভূত।

গ্লোমেরুলাস বা কৈশিকাগুচ্ছ ঃ (ছবি – ২)

গ্লোমেরুলাস বা কৈশিকাগুচ্ছ হচ্ছে প্লাজমার আলট্রাফিল্ট্রেশনের জন্য একটি উপঝিল্লি সংবহন নালিকা বা ভাস্কুলার ইপিথেলিয়াল অর্গান। সংবহন - নালীর ভিতর থেকে বাহিরের ইউরিনারি স্পেশ পর্যন্ত এর ৩ টি প্রধান স্তর হচ্ছে (ক) ছিদ্রযুক্ত অন্তঝিল্লিক বা ফিনিস্ট্রেটেড এনডোথেলিয়াম, একটি পাতলা স্তর যার ছিদ্রের ব্যাস ৭০ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার। (খ) একটি গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন যার ব্যাস ৩২০ ন্যানোমিটার, এর মাঝের অংশ হচ্ছে লামিনা ডেন্সা এবং বাইরের ও ভেতরের ইলেক্টোলুসেন্স এরিয়া হচ্ছে ল্যামিনা রেয়ারা এক্সটার্না এবং ইন্টারনা, (গ) ভিসেরাল ইপিথেলিয়াল সেল বা পোডোসাইট। পোডোসাইট একটি জটিল কোষ যা বেসমেন্ট মেমব্রেন এর ল্যামিনা রেয়ারা এক্সটারনার সংগে সংযুক্ত থাকে এবং এদের ফুট প্রসেসগুলো ২০ থেকে ৩০ ন্যানোমিটার ব্যাস সম্পন্ন ফিলটারিং স্লিট দিয়ে আলাদা করা থাকে। গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন-এ অনেক জৈবরাসায়নিক পদার্থ থাকে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল (ক) কোলাজেন টাইপ ৪ যা গ্লোমেরুলার বেসমেন্টমব্রেন এর শুস্ক ওজনের প্রায় ৫০ ভাগ। এর প্রধান কাজ হোল ক্যাপিলারী ওয়াল এর গঠন ধরে রাখা, (খ) ল্যামিনিন যার কাজ হোল এণ্ডোথেলিয়াল এবং ইপিথেলিয়াল কোষ গুলোকে বেসমেন্ট মেমব্রেন এর সংগে সংযুক্ত করে রাখা, (গ) পলিএনায়নিক প্রোটিওগ্লাইকেন বিশেষত হেপারিণ সালফেট যা ৫০ থেকে ৬০ ন্যানোমিটার দূরত্বে থাকে দুই ল্যামিনার মেমব্রেন এর সংগে। এরা ফিল্ট্রেশন ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে। (ঘ) ফাইব্রোনেকটিল এবং সায়ালোগ্লাইকোপ্রোটিন ও (ঙ) এনট্যাকটিন একটি গ্লাইকোপ্রোটিন যার প্রকৃত কাজ অজানা।

গ্লোমেরুলাস এর প্রধান কাজ হচ্ছে প্লাজমা ফিল্ট্রেশন বা পরিস্রাবন। অন্যান্য অর্গানের আন্তঃকৈশিকনালী বিনিময় বা ট্রান্সক্যাপিলারি এক্সচেঞ্জ এর সংগে এর দুটো প্রধান তফাৎ হচ্ছে (ক) গ্লোমেরুলাস ফিলট্রেশনের সময় এলবুমিনের সমান প্লাজমা প্রোটিন বা এর চেয়ে বড় দানাগুলোকে (৭০,০০০ মঃ ওঃ বা ব্যাস ৩.৬ ন্যানোমিটার) বাদ দিয়ে পরিস্রাবন করে (২) পানি এবং ছোট দানার সল্যুট এর পরিস্রাবন এর জন্য এর বিশেষ দুর্বলতা আছে। গ্লোমেরুলাস এর আর একটি অংশ হচ্ছে মেসানজিয়াম যার আরেক নাম হচ্ছে সেন্টিলোবিউলার বা এক্সিয়াল রিজিওন। মেসানজিয়াম একটি শাখা সমৃদ্ধ সমর্থন তৈরী করে এনাস্টোমজিং ক্যাপিলারির চারদিকে। এই মেসানজিয়ামের

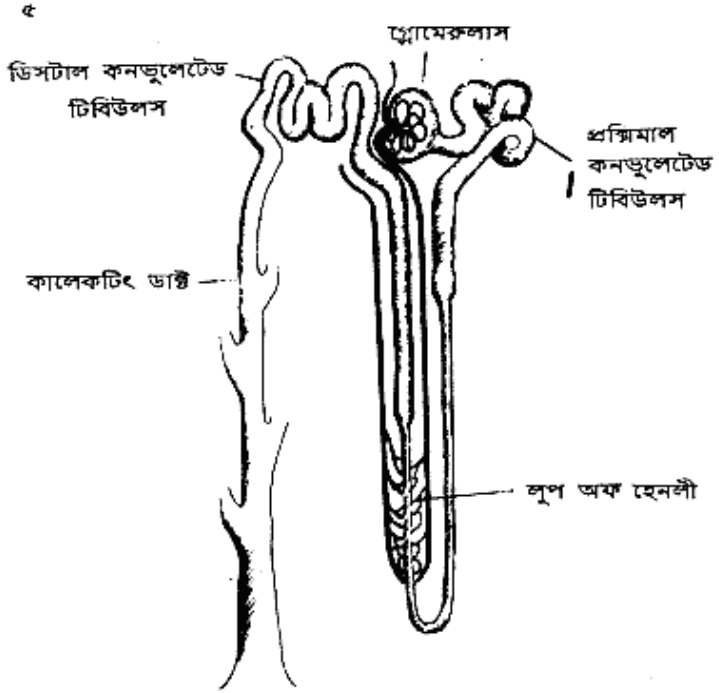

ছবি ৩ নেফ্রোন এবং কালেকটিং ডাক্ট এর বিভিন্ন অংশের রেখাংকন।

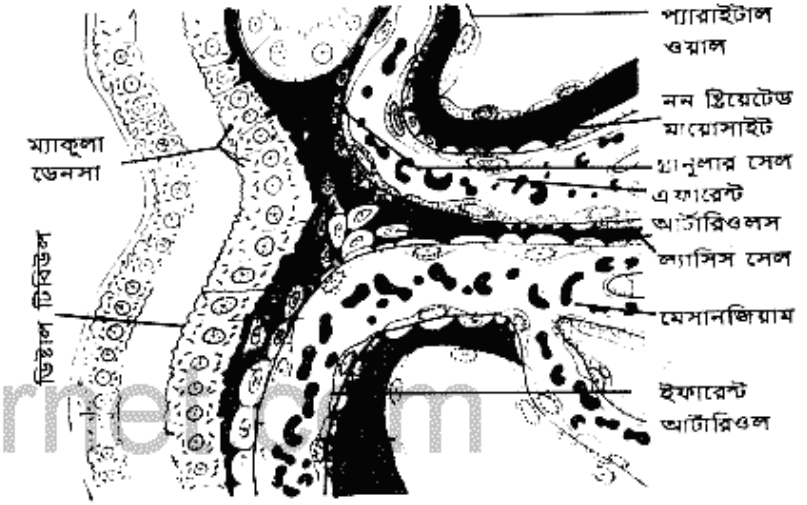

ছবি ৪ জাক্সটা গ্লোমেরুলাস এ্যাপারেটাস এর গঠন প্রণালী।

banglainternet.com

মধ্যে থাকে ষ্টিলেট মেসানজিয়াল সেল বেসমেন্ট মেমব্রেন এর সংগে সম্পৃক্ত অবস্থায় যা আসলে পজিটিভ গ্লাইকোপ্রোটিন এবং যার নাম মেসানজিয়াল ম্যাট্রিক্স। মেসানজিয়াল ম্যাট্রিক্স বেসমেন্ট মেসব্রেন এর মত জৈব রাসায়নিক দ্রব্যাদির তৈরী। মেসানজিয়াল কোষগুলো নিউরোহরমানাল উত্তেজক এর প্রভাবে সঙ্কুচিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং ধারণা করা হয় স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় অবস্থায় এরা গ্লোমেরুলাস এর ভিতরের রক্ত প্রবাহ পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়াও এদের গ্রাসন করার বা ফাগোসাইটিক কার্যক্ষমতাও আছে। একটি স্বাভাবিক গ্লোমেরুলাস এ মেসানজিয়াল কোষ এর সংখ্যা (২ - ৩) এবং এর ম্যাট্রিক্স খুব কম পরিমানে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গ্লোমেরুলার রোগে মেসানজিয়াল কোষের সংখ্যা, মেসানজিয়াল ম্যাট্রিক্স এবং মেসানজিয়াম এ লিউকোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

টিবিউলস ঃ (ছবি - ৩)

কিডনীর টিবিউল এর উপঝিল্লি বা ইপিথেলিয়াম বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন প্রক্সিজম্যাল টিবিউলার কোষগুলো খুব উচ্চ গঠনের হয়ে থাকে এবং এর অনেক লম্বা মাইক্রোভিলাই থাকে, যেহেতু এদের সোডিয়াম $\frac{২}{৩}$ অংশ, পানি, গ্লুকোজ, এমাইনোএসিড এবং প্রোটিন পুনঃশোষনের কাজ করতে হয়। আবার যেহেতু বিষাক্ত পদার্থও পুনঃশোষিত হয় প্রক্সিজমাল টিবিউলের কোষ দিয়ে সেজন্য রাসায়নিক ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনাও এদের বেশী থাকে।

জাক্সটাগ্লোমারুলার এপারেটাস ঃ (ছবি - ৪)

একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্গান জাক্সটাগ্লোমারুলার এপারেটাস, গ্লোমেরুলাস এর সাথে লাগানো থাকে যেখানে এফারেন্ট আর্টারিওল গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে। এর মধ্যে যে কোষগুলো থাকে তা হলো (ক) জাক্সটাগ্লোমেরুলার কোষ-পরিবর্তীত দানাদার, মসৃন পেশী বা মডিফাইড গ্রানুলার স্মুথ মাসল কোষ যা এফারেন্ট আর্টারিওল এর মধ্যমায় থাকে এবং যার মধ্যে রেণিন নামক হরমোন থাকে (খ) ম্যাকুলাডেন্সা-ডিষ্টাল টিবিউলের একটি বিশেষ জায়গা যেখানে টিবিউলার কোষগুলো বেশী সংখ্যায় থাকে এবং এগুলো একটু ছোট আকৃতির হয় এবং পরস্পরের সংগে বিশেষ ভাবে একটার সংগে আরেকটা ইন্টারডিজিটেটিং ভাবে লাগানো থাকে, (গ) ল্যাসিসকোষ বা অদানাদার কোষ, যেগুলো থাকে এফারেন্ট আর্টারিওল, ম্যাকুলাডেন্সা, গ্লোমেরুলাস এর বেষ্টনীর ভিতর। জাক্সটাগ্লোমেরুলার এপারেটাস একটি ছোট

নলী বিহীন গন্থী বা এণ্ডোক্রাইন গ্লাণ্ড যা রেণিন নামক হরমোনের প্রধান উৎস এবং অনেক ক্ষেত্রে উচ্চচাপ জনিত রোগের কারণ।

ইন্টারষ্টিশিয়াম ঃ

রেণাল ইন্টারষ্টিশিয়াম কিডনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিক্রিয়ার প্রথম জায়গা। স্বাভাবিক কিডনীর করটেক্সে এ ইন্টারষ্টিশিয়াল স্পেশ কমপ্যাক্ট থাকে এবং এর মধ্যে থাকে ছিদ্রযুক্ত বা ফিনিষ্ট্রেটেড পেরিটিবিউলার ক্যাপিলারি এবং কিছু ফাইব্রোব্লাষ্ট সম কোষ। যে কোন ধরনের ইন্টারষ্টিশিয়াম এর সম্প্রসারণ (তা ইডিমার জন্যই হোক বা প্রদাহের কারণে ইনফ্লামেটরী কোষ এর উপস্থিতির জন্যই হোক) হলেই ধরে নিতে হবে কিডনীর কোন রোগ হয়েছে।

কিডনীর নার্ভ সাপ্লাই ঃ

কিডনীর স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো কোলিনার্জিক এবং এড্রেনার্জিক ফাইবার যা অটোনোমিক নার্ভাস সিষ্টেম থেকে সরবরাহ হয়। কিডনীর স্নায়ুর উৎস রেনাল প্লেক্সাস যা সিলিয়াক প্লেক্সাস থেকে উদ্ভুত। এর মধ্যে সিমপ্যাথেটিক ফাইবার থাকে (টি১০-এল ১) যা প্রধানত ভাসোমটর এবং করটেক্স ও মেডুলার রক্ত সঞ্চালণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিডনীর এফারেন্ট নার্ভ, টি ১০-১২ সেগমেন্টে থাকে।

লিমফেটিকস ঃ

কিডনীর লিমফেটিক্স সমূহ লেটারাল এওর্টিক নোডে ড্রেইন করে, যা থাকে রেনাল আর্টারির লেভেলে। (এল - ২)

ভেনাস ড্রেইনেজ ঃ

ইন্টারলোবিউলার ভেইন দিয়ে আর্কুয়েট ভেইন যা পরবর্তীতে ইন্টার লোবার ভেইনে ওপেন করে। এগুলো রেনাল সাইনাস হিসাবে ইমার্জ করে রেনাল ভেইন হয় যা পরে ইনফেরিওর ভেনাক্যাভায় ড্রেইন করে।

banglainternet.com

১ম অধ্যায়

২য় পরিচ্ছেদ

কিডনীর ফিজিওলজী

(PHYSIOLOGY OF KIDNEY)

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
হোসনে আরা বেগম (চারু)

কিডনীর প্রধান কাজ দু'টি। প্রথমতঃ শরীরের বিপাকের প্রান্তদ্রব্য শরীর থেকে নির্গত করে এবং দ্বিতীয়তঃ বডি ফ্লুয়িড এর প্রত্যেকটি উপাদানের ঘনত্বের সমতা রক্ষা করে। প্রত্যেকটি কিডনীতে প্রায় ১০ লক্ষ করে নেফ্রন আছে এবং এদের প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে প্রস্রাব তৈরী করতে পারে। নেফ্রন এর প্রধান দু'টো অংশ হচ্ছে (ক) গ্লোমেরুলাস যেখানে বডি ফ্লুয়িড পরিস্রাবিত বা ফিলটার্ড হয় (খ) টিবিউলস যেখানে পরিস্রাবিত ফ্লুয়িড প্রস্রাবে রূপান্তরিত হয়ে কিডনীর পেলভিসে প্রবেশ করে। রক্ত এফারেন্ট আর্টারিওলস দিয়ে গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে এবং পরিস্রাবিত হওয়ার পর ইফারেন্ট আর্টারিওলস দিয়ে বের হয়ে চলে যায়। গ্লোমেরুলাস হচ্ছে ৪০ থেকে ৫০ টা সমান্তরাল কৈশিকাগুচ্ছ যা ঢাকা থাকে উপঝিল্লী বা ইপিথেলিয়াম দিয়ে এবং যা থাকে বোম্যানস ক্যাপসুল এর মধ্যে। গ্লোমেরুলাস এর রক্তের চাপ ফ্লুয়িড কে পরিস্রাবিত করে বোম্যানস ক্যাপসুলে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ফ্লুয়িড প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিবিউলস দিয়ে লুপ অফ হেনলী দিয়ে ডিষ্টাল টিবিউলে প্রবেশ করে। এরপর আটটা ডিষ্টাল টিবিউল একত্রিত হয়ে কালেকটিং টিবিউল তৈরী করে নীচের দিকে মেডুলায় প্রবেশ করে কালেকটিং ডাকট্ হয়। অনেকগুলো কালেকটিং ডাকট্ একত্রিত হবার পর সবচেয়ে বড় কালেকটিং ডাকট্গুলো রেণাল পেলভিসে রেণাল প্যাপিলা দিয়ে ফ্লুয়িড নিশেঃষিত করে দেয়। গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট যখন টিবিউল দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এর শতকরা ৯৯ ভাগ পানি এবং অন্যান্য সল্যুট পুনঃ শোষিত হয় এবং সংবহন তন্ত্রে প্রবেশ করে। খুব অল্প পরিমাণ টিবিউলে নিঃসরিত হয়। টিবিউলের বাকী পানি এবং ডিসলভড্ বস্তু সমূহ দিয়ে প্রস্রাব এর সৃষ্টি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে একটা কথা প্রতিয়মান হচ্ছে যে নেফ্রন এর মূল

কাজ হচ্ছে যখন এর মধ্যে দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় তখন প্লাজমায় উপস্থিত অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কে পরিস্কার করা যেমন বিপাকের প্রান্তদ্রব্য (ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক এসিড, ইউরেট ইত্যাদি)। কিছু সামগ্রী যেমন সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন আয়ন বেশী পরিমানে শরীরে জমার জন্য তাদের আগ্রহ থাকে। নেফ্রন এর কাজ হোল এ সমস্ত আয়ণ শরীরে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ধরে রেখে বাকীটা পরিস্কার করা। দু'ভাবে এটা করা সম্ভব। প্রথম, গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নিঃসরণ বা সিক্রেশন। অর্থাৎ প্লাজমা থেকে কিছু দ্রব্য টিবিউলার লাইনিং ইপিথেলিয়াম কোষ দিয়ে নিঃসরিত হয় যেগুলো অপ্রয়োজনীয় রক্ত পরিস্কার করতে সহায়তা করে। সেজন্য প্রসাবে শুধু পরিস্রাবিত পদার্থ সমূহই নয় খুব অল্প পরিমান নিঃসরিত দ্রব্য ও পাওয়া যায়।

একজন ৭০ কেজি স্বাভাবিক মানুষের কিডনীতে রক্ত সংবহন প্রতি মিনিটে ১২০০ মিলি লিটার। কিডনীর যে প্রধান কাজ দু'টোর কথা আলোচনা করা হলো তা প্রধানতঃ এই রক্তের চাপের কারণে হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বাভাবিক গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন নির্ভর করে গ্লোমেরুলাস এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত রক্তের চাপের উপর। আবার গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন বাধাগ্রস্থ হতে পারে বোমান্স ক্যাপসুল এর অভ্যন্তরের চাপ এবং রক্তের কলয়ডাল অসমোটিক প্রেসার এর উপর। সুতরাং নেফ্রন এর মধ্যে রক্ত চলাচল বাড়লে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন বেড়ে যাবে আবার বোম্যান্স ক্যাপসুলের ভিতরে চাপ এবং রক্তের কলয়ডাল অসমোটিক প্রেসার বাড়লে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন কমে যাবে। প্রতিদিন প্রায় ১৮০ লিটার ফ্লুয়িড গ্লোমেরুলাস দিয়ে পরিস্রাবিত হচ্ছে। এর মধ্যে ১.০ থেকে ১.৫ লিটার বাদে সবই পুন:শোষিত হচ্ছে টিবিউলস দিয়ে। প্রতি মিনিটে দুই কিডনীর সব নেফ্রন দিয়ে যে পরিমান পরিস্রাবিত ফ্লুয়িড তৈরী হচ্ছে তাকে বলা হয় গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট। একজন স্বাভাবিক লোকের এর গড় হচ্ছে ১২৫ মিলি লিটার প্রতি মিনিটে। গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট এর কম্পোজিশন এবং প্লাজমার কম্পোজিশন প্রায় এক শুধুমাত্র একটু ব্যতিক্রম হল যে এটাতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিমান প্রোটিন থাকে না।

গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট নেফ্রন এর টিবিউলস এ প্রবেশ করার পর প্রথমে প্রক্সিমাল টিবিউল, পরে লুপ অফ হেনলী, এর পর ডিষ্টাল টিবিউল এবং সব শেষে কালেকটিং ডাকট্ দিয়ে কিডনীর পেলভিস-এ প্রবেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় টিবিউলার ইপিথেলিয়াম দ্রব্য সমূহ নির্বাচিত বা সিলেকটিভ ভাবে পুনঃশোষিত অথবা নিঃসরণের কাজ করে এবং বাকী ফ্লুয়িড প্রস্রাব হিসাবে পেলভিসে প্রবেশ করে। পুনঃ শোষন প্রস্রাব তৈরীর ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তবে নিঃসরণ পটাশিয়াম আয়ন, হাইড্রোজেন আয়ন এবং অন্য কিছু

banglainternet.com

দ্রব্যের পরিমান নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শতকরা ৯৯% পানি পুনঃশোষিত হয় টিবিউলসে, যার জন্য অন্য ঘনবস্তুর থেকে পানির পরিমান ৯ ভাগ বেশী থাকে। আবার গ্লুকোজ ও এমাইনো এসিড প্রায় সম্পূর্ণটাই পুনঃশোষিত হয় যার জন্য এদের পরিমান প্রসাবে একেবারে শূন্যের কাছাকাছি থাকে। এই যে শোষন এবং নিঃসরণ, অন্যান্য বডি ফ্লুয়িড এর মত টিবিউলসে দুভাবে সম্পন্ন হয়। একটি একটিভ ট্রান্সপোর্ট যেখানে শক্তির প্রয়োজন হয় এবং অন্যটি প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট যেখানে শক্তির প্রয়োজন হয় না। যে সামগ্রীগুলো একটিভ ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে শোষিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল সোডিয়াম, গ্লুকোজ, এমাইনো এসিড, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড এবং বাইকার্বনেট আয়ন, ফসফেট আয়ন এবং ইউরেট আয়ন। একটিভ সিক্রেশন হয় যে সমস্ত বস্তুর সেগুলো হলো হাইড্রোজেন আয়ন, পটাশিয়াম আয়ন এবং ইউরেট আয়ন, ইউরিয়া এবং নন এল্কিভলি ট্রান্সপোর্টেড সল্যুটস প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট হয় ডিফিউসনের মাধ্যমে।

উপরের আলোচনা থেকে কিডনীর কাজ সমূহকে নীচের কয়টি প্রধান ভাগে চিহ্নিত করা যায়।

ক ঃ শরীরের পানির সমতা রক্ষা করা ঃ

গ্লোমেরুলাস কর্তৃক পরিস্রাবিত $\frac{২}{৩}$ পানি পুনঃশোষিত হয় প্রক্সিজমাল টিবিউলস দিয়ে। বাকী $\frac{১}{৩}$ পানি ডিষ্টাল নেফ্রন দিয়ে পুনঃশোষিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া ভাসোপ্রেসিন নামক হরমোন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাসোপ্রেসিনের উপস্থিতিতে ডিষ্টাল কনভ্যুলেটেড টিবিউল এবং কালেকটিং ডাকট্ পানির প্রতি পারমিয়েবল হয়ে যায় যা পরবর্তীতে পুনঃশোষিত হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ইউরিয়ার হাইকনশেনট্রেশন এর জন্য, যা মেডুলার ইন্টারষ্টিশিয়াম এ থাকে। ফলে প্রস্রাব বেশী ঘন বা কনসেনট্রেটেড হয়। আবার ভাসোপ্রেসিন এর অনুপস্থিতিতে এর উল্টাটা হবে। অর্থাৎ প্রসাব খুব পাতলা বা ডাইল্যুটেড হবে।

খ ঃ শরীরের ইলেকট্রোলাইট এর সমতা রক্ষা করা ঃ

রেণাল টিবিউলস এর সিলেকটিভ রিএবসরপশান এবং সিক্রেশন এর জন্য ইলেকট্রোলাইট এর সমতা বজায় থাকে একই ভাবে। প্রক্সিজমাল কনভ্যুলেটেড টিবিউলসে ৬৫% সোডিয়াম পুনঃশোষিত হয় একটিভ এবং প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম এর সাহায্যে। পরিস্রাবিত ক্লোরাইড এর বেশীর

ভাগ পুনঃশোষিত হয় প্যাসিভ মেকানিজম যা সোডিয়াম এর একটিভ ট্রান্সপোর্ট এর সংগে সম্পৃক্ত। বাকী সোডিয়াম ও ক্লোরাইড এর বেশীর ভাগ পানি ছাড়া এসেনডিং লুপ অব হেনলীতে পুনঃশোষিত হয়। বাকী সোডিয়াম যা শোষিত হয় না তা ডিষ্টাল কভ্যুলেটেড টিবিউলস এবং কালেকটিং ডাকট্ এ যায় যেখানে সোডিয়াম ও ক্লোরাইড শোষিত হয় পটাশিয়াম ও হাইড্রোজেন আয়নের বিপরীতে যেখানে এল্ডোসটেরনের হরমোন এলডোসটেরনের ভূমিকা থাকে।

ফিল্টারড্ পটাশিয়াম এর ৯০% প্রক্সিজমাল এবং এসেনডিং লিম্বে পুনঃশোষিত হয় যার প্রকৃত পদ্ধতিটি অজানা। প্রস্রাবে পটাশিয়াম সাধারণত ডিষ্টাল টিবিউলার সেল এর থেকে আসে। একটি ইলেকট্রো কেমিক্যাল গ্রাডিয়েন্ট তৈরী হয় যার ফলে পটাশিয়াম পেরিটিবিউলার ফ্লুয়িড থেকে সেলে একটিভ ট্রান্সপোর্ট এর মাধ্যমে প্রবেশ করে যার উপর এল্ডোসটেরনের ভূমিকা আছে। আবার ইন্ট্রালুমিনাল নেগেটিভ পটেনশিয়েল এর জন্য পেরিটিবিউলার ফ্লুয়িড লুমেনে পটাশিয়াম নির্গত করে। সুতরাং এল্ড্রোনোকর্টিক্যাল হরমোন এবং এন্টিডাইয়ুরেটিক হরমোন টিবিউলস এর উপরে দ্বৈত ক্রিয়াই শরীরের পানি ও ইলেকট্রোলাইটের সমতা রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করে।

গ ঃ বডি ফ্লুয়িড এর এসিডবেস এর সমতা রক্ষা করে ঃ

কিডনীর হাইড্রোজেন আয়ন কনসেনট্রেশন এক্সক্রিয়েশন এর রেট বা তারতম্য করার ক্ষমতা এবং বাইকার্বনেট রেজ পুনঃজনন এর ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। প্রক্সিজম্যাল ও ডিষ্টাল কনভ্যুলেটেড টিবিউলসে যে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরী হয় তার নিঃসরণ সোডিয়াম আয়ন এর এক্সচেঞ্জে লুমেনে নিঃসরণ হয়। একই সংগে বাইকার্বনেট আয়ন যা কোষে তৈরী হয় পেরিটিবিউলার ব্লাডে পুনঃশোষিত হয়। পরিস্রাবিত বাইকার্বনেট আয়ন এভাবে পুনঃশোষিত হয় যার একটি সীমা আছে (২৫ মি. মোল / লিটার) যখন প্লাজমা কনসেনট্রেশন এর উপরে উঠে যায় তখন বেশী বাইকার্বনেট প্রস্রাবের সংগে নির্গত হয়। যখন বেশীরভাগ বাইকার্বনেট পুনঃশোষিত হয়ে যায়, পরে নিঃসারিত হাইড্রোজেন আয়ন টিবিউলার ফ্লুয়িড এর অন্যান্য বেস এর সংগে কনজুগেট হয়ে এসিড তৈরী হয়ে প্রস্রাবে নির্গত হয়। প্রতিটি প্রটোন যা এভাবে নির্গত হয় একটি করে বাইকার্বনেট আয়ন (যা টিবিউলার কোষে তৈরী হয়) নিয়ে পুণরায় রক্তে চলে যায় যাতে বাইকার্বনেট রিজার্ভ ঠিক থাকে।

পরিস্রাবিত বেসের মধ্যে ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট প্রায় $\frac{১}{৩}$ ভাগ

banglainternet.com

হাইড্রোজেন আয়ন গ্রহন করে যা নির্গত হওয়ার জন্য তৈরী ছিল। $\frac{২}{৩}$ ভাগ এ্যামোনিয়া একটি প্রোটন গ্রহন করে খুব উইক এসিড NH_4 হয়। লুমিনাল সেল মেমব্রেন এই চার্জড পার্টিকেল এর প্রতি ইমপারমিয়েবল ফলে এটা প্রস্রাবে নির্গত হয়। একজন স্বাভাবিক লোক যিনি মিক্সড ডায়েট খান প্রত্যহ ৪০ — ৮০ m. mol হাইড্রোজেন আয়ন প্রস্রাবে নির্গত করেন। যখন প্রোটন তৈরীর হার বৃদ্ধি পায় যেমন ডায়াবেটিক কিটো এসিডোসিসে সুস্থ কিডনী প্রায় ৫০০ মিলি মোল/লিটারে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরী করে যা প্রস্রাবে নির্গত হয় NH_4 হিসেবে। আবার যদি কেউ শুধু ফল মূল ও শাক সব্জী খায় তাহলে ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট এবং বাইকার্বনেট প্রস্রাবে নির্গত হবে এবং হাইড্রোজেন এবং এমোনিয়া আয়ন নিঃসরন কম হবে।

ঘ ঃ শরীরের বিভিন্ন কার্য্যকরী উপাদান সংরক্ষণ ঃ

প্রক্সিম্যাল টিবিউলসে গ্লুকোজ সবটাই পুনঃশোষিত হয় ফলে প্রস্রাবে এর কিছুই নির্গত হয় না। রেণাল গ্লাইকোসুরিয়া টিবিউলের একটি বেনাইন অসুবিধা যেখানে স্বাভাবিক রক্ত শর্করা সত্বেও প্রস্রাবে গ্লুকোজ এর উপস্থিতি দেখা যায়। খুব স্বল্প ক্ষেত্রে জন্মগত বা বংশগত টিবিউলার অসুস্থতার কারণে প্রস্রাবে খুব বেশী পরিমান এমাইনো এসিড, ফসফেট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং পানি নির্গত হতে পারে। এই রোগগুলো আলাদা বা যৌথভাবে হতে পারে। উদাহরণ হচ্ছে সিষ্টিনিউরিয়া, বংশগত হাইপোফসফেটিমিয়া, নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এবং ফ্যানকোনিস সিনড্রোম। সুস্থ লোকের খুব সামান্য পরিমান প্রোটিন (০.২ গ্রাম / লিটার) ফ্লুয়িড এর সংগে বোমান্স ক্যাপসুলে প্রবেশ করে। কিন্তু গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট এর পরিমান এত বেশী যে ঐ সামান্য পরিমান প্রোটিন কেন ৩৬ গ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন (স্বাভাবিক ৫০ গ্রাম পর্যন্ত) প্রস্রাবে নির্গত হয়ে যাবে ২৪ ঘন্টায়।

ঙ ঃ বিপাকের প্রান্তদ্রব্য, বিষাক্ত দ্রব্য এবং ঔষধের প্রান্ত দ্রব্য এবং ঔষধের নির্গমন ঃ

বিপাকের বিশেষতঃ প্রোটিন এর বিপাক এর প্রান্ত দ্রব্য যেমন ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটেনিন, ফসফেট, সালফেট ইত্যাদি প্রস্রাবে নির্গত হয়।

চ ঃ কিডনীর হরমোন এবং বিপাকীয় কাজ ঃ

কিডনীর জাক্সটা গ্লোমেরুলার এপ্যারেটাস রেণিন নামক হরমোন নির্গত করে যা এনজিওটেনসিনকে , এনিজওটেনসিন I রূপান্তরিত করে।

এঞ্জিওটেনসিন I থেকে আবার এনজিওটেনসিন II হয় যার ইস্ট্রারেণাল সার্কুলেশন এর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। এনিজওটেনসিন II এলডোসটেরণ নিঃসরণ এর হার বৃদ্ধি করে এবং সিষ্টেমিক ভাসোকন্সট্রিকশন করে। উচ্চ রক্ত চাপের জন্য এই পদ্ধতি একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

এরিথ্রপয়টিন নামক হরমোন এর প্রধান উৎস হচ্ছে কিডনী যা স্বাভাবিক এরিথ্রোপয়সিস এর জন্য অত্যন্ত জরুরী এবং ১, ২৫ ডাইহাইড্রোক্সি কলি ক্যালিসিফেরল তৈরীর জন্য প্রয়োজন। দুটো প্রোষ্টাগ্লাণ্ডিন যেমন পিজিই$_2$ এবং পিজিআই$_2$ ও কিডনীতে তৈরী হয়। এ দুটোই শক্তিশালী ভাসোডাইলেটার। পিজিআই$_2$ রেণিন নিঃসরণের একটি মধ্যস্থতাকারী।

banglainternet.com

১ম অধ্যায়

৩য় পরিচ্ছেদ

কিডনী রোগের লক্ষণ ও রোগ নির্ণয়
(SIGN SYMPTOMS AND DIAGNOSIS OF KIDNEY DISEASES)

মতিউর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

যেহেতু কিডনী রোগের শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত ব্যাপক সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই এদের লক্ষণগুলো ভিন্ন ভিন্ন। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোন উপসর্গ ছাড়াও কিডনী রোগ থাকতে পারে। কিডনী রোগের লক্ষণগুলোকে সাধারণতঃ দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ইউরিনারি ট্রাক্টের উপসর্গ এবং সাধারণ উপসর্গ।

ইউরিনারি ট্রাক্টের উপসর্গ

(ক) ব্যাথা বা পেইন ঃ

ব্যাথা সাধারণতঃ খুব মৃদু বা মাঝারী হয় পেটের পিছনে মেরুদণ্ডের দু'পাশে (Loin Pain) ফ্লাংকে বা পাঁজরের হাড় এবং পেটের মাঝখানে নাভির কাছে। আবার কিডনীর পাথরের বেলায় খুব তীব্র ব্যাথা অনুভব হতে পারে। আবার প্রসাবের নালী বা ইউরেটার এর ব্যাথা খুবই তীব্র এবং ইউরেটার এর নালীর গতি অনুসারে নীচের দিকে নামবে এবং টেষ্টিস ও ভালভা বা উরুর দু'পাশে পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। তবে কিডনীর ক্যাপসুল বড় হতে অনেক সময় লাগে বলে অনেক সময় কিডনীর অসুখ বা পাথর হলেও ব্যাথা অনুভব নাও হতে পারে।

(খ) প্রস্রাবের লক্ষণ সমূহ ঃ

(১) বার বার প্রসাব হওয়া বা ফ্রিকুয়েন্সী (Frequency), তাড়াহুড়া করে প্রস্রাব করার ভাব হওয়া বা আর্জেন্সী (Urgency) এবং রাতে বেশী প্রসাব হওয়া বা নকচুরিয়া (Nocturia), পরিমান কমে যাওয়া বা অলিগুরিয়া

(Oliguria) প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া বা এনুরিয়া (Anuria) ইত্যাদি যা কিডনীর বা জননেন্দ্রের প্রদাহের কারণেও হতে পারে। খুব বেশী প্রদাহ হলে সব সময় প্রস্রাব করার একটা ভাব হবে এবং খুব অল্প (কয়েক মিলি লিটার) প্রস্রাব হবে। প্রস্রাব করার ভাব এবং রাতে প্রস্রাব সাধারণতঃ মুত্রথলীর খালি করার প্রবণতার কোন রোগ বা স্নায়ুবিক দৌর্বল্যের কারণে হয়ে থাকে। ফলে প্রচুর পরিমান প্রস্রাব মুত্রথলীতে জমা থাকে যাকে রিটেনশন (Retention) বলে। রাতে ঘন ঘন এবং বেশী প্রস্রাব হয় সাধারণতঃ হার্টফেইলার, রেণাল ইনকম্পিসটেন্সী, যে কোন কারণে ইডিমার মোবিলাইজেশন হলে, ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এর কারণে, হাইপারএল্ডোষ্টিরিনিজম এর কারণে এবং প্রচুর পানিয় গ্রহণের কারণে।

(২) প্রস্রাব করতে ব্যাথা এবং জ্বালা পোড়া (ডিজইউরিয়া এবং বার্নিং)ঃ মুত্রথলী এবং প্রষ্টেটগ্রন্থির প্রদাহের কারণে।

(৩) রাতে বার বার মূত্র ত্যাগ ঃ ইউরিনারী ট্রাক্ট এর যে কোন রোগ বা স্নায়ুবিক ও মানসিক রোগের কারণে।

(৪) ধারণ অক্ষমতা বা ইনকন্টিনিয়েন্স ঃ এটা মুত্রথলীর এনাটমিক অস্বাভাবিকতা, শারিরীক চাপ, প্রদাহ এবং স্নায়ুবিক রোগ বা ওভারডিসটেনডেট ফ্লাসিড ব্লাডার এর কারণে হয়ে থাকে।

কিডনী রোগে প্রস্রাবের বৈশিষ্ট ঃ

(ক) প্রোটিনিউরিয়া (এলবুমিনিউরিয়া) ঃ এটা রেণাল ডিজিস বা কিডনী রোগের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ, স্বাভাবিক অবস্থায় একজন লোকের প্রসাবে ১৫০ মিঃ গ্রাঃ পর্যন্ত প্রোটিন প্রত্যহ ২৪ ঘন্টায় নির্গত হতে পারে। ব্যায়াম, জ্বর জনিত রোগ, খুব বেশী উদালপতা বা ডিহাইড্রশনের কারণে স্বাভাবিক লোকের কিডনীর রোগ ছাড়াই স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী প্রোটিন নির্গত হতে পারে। খুব অল্প ক্ষেত্রে দাঁড়ানো অবস্থায় একজন স্বাভাবিক লোকের প্রোটিনিউরিয়া হতে পারে তবে আধা শোয়া বা শোয়া অবস্থায় তা চলে যাবে। ২০০ — ৫০০ মিঃ গ্রাঃ / ডি এল এর বেশী প্রোটিনিউরিয়া হলেই তা রেণাল ডিজিস বা বৃক্কের রোগের নির্দেশ করবে।

(খ) হেমাচুরিয়া বা প্রস্রাবে রক্তের উপস্থিতি ঃ যদিও কিডনীর রোগ ছাড়াও হেমাচুরিয়া হতে পারে তথাপি এর গুরুত্ব কিডনী রোগে অসামান্য। কিডনী রোগ ছাড়াও আরও যে কারণে হেমাচুরিয়া হতে পারে সেগুলো নীচে দেওয়া হোল। কিডনী রোগের কারণে হেমাচুরিয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহ হোল গ্লোমেরুলোনেফ্রোইটিস, নিউপ্লাজমস, ভাসকুলার এক্সিডেন্ট, প্রদাহ,

banglainternet.com

অস্বাভাবিকতা, পাথর, কোয়াগুলেশন ডিফেক্ট, ইউরিনারি ট্রাক্টে আঘাত ইত্যাদি। যদি প্রস্রাবের প্রথমে রক্ত আসে তাহলে বুঝতে হবে এটা এন্টিরিওর ইউরেথ্রা বা প্রস্টেট গ্লাণ্ড থেকে আসছে। আবার প্রসাবের শেষে রক্ত আসলে বুঝতে হবে যে এটা পস্টেরিওর ইউরেথ্রা, ব্লাডার নেক, ট্রাইগোনের কোন রোগের কারণে হচ্ছে। আর সমস্ত প্রসাব জুড়েই যদি রক্ত আসে তাহলে বুঝতে হবে যে তা কিডনী, ইউরেটার বা ব্লাডারের কোন রোগের কারণে আসছে। হেমাচুরিয়ার কারণগুলো এবার বর্ণনা করা হোল।

ঃ লোকালাইজড বা স্থানীয় ঃ

(ক) ইউরেথ্রা -- ট্রমা বা আঘাত, ইনফেকশন বা প্রদাহ।

(খ) ব্লাডার -- ইনফেকশান বা প্রদাহ, পাথর, টিউমার, ভেরিসেস, ঔষধের প্রতিক্রিয়া, রেডিয়েশন ইনজুরি, প্যারাসাইটিক ইনফেকশন

(গ) ইউরেটার - ইনফেকশান, পাথর, টিউমার।

(ঘ) কিডনী -- গ্লোমেরুলার ডিজিজ, ইনফেকশন, পাথর, কিডনীর এনাটমিক অস্বাভাবিকতা, রেণাল আর্টারি বা ভেইনে থ্রম্বোসিস, নিওপ্লাজম, ট্রমা।

ঃ সিস্টেমিক বা সামগ্রিক ঃ

(ক) এন্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপী।

(খ) ব্লিডিং ডায়াথেসিস -- হেমোফাইলিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ডি আই সি।

(গ) হেমোলাইটিক ডিজিজ -- হেমোগ্লোবিনিউরিয়া, হেমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম।

(ঘ) সিকেলসেল ক্রাইসিস।

(ঙ) এনাফাইলাকটয়েড পারপুরা কিডনীর সম্পৃক্ততা সহ।

এছাড়াও বিশেষ কতগুলো সাধারণ উপসর্গ লক্ষণ কিডনী রোগের কারণ হিসেবে সন্দেহ করা হয় এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল।

(ক) মুখ, বিশেষতঃ, চোখের নীচে, পা, হাত, অথবা সর্ব শরীর ফুলে যাওয়া (Oedema) ঃ

রেণাল বা কিডনীর রোগ হলে বেশী পরিমানে সোডিয়াম ও পানি কিডনীর

টিবিউলস শোষিত করে ধরে রাখার চেষ্টা করে এবং রেণাল পারফুসন কমে যায়। ধরে রাখা পানি প্লাজমা প্রোটিনকে আরও ডাইলুট করে এবং প্লাজমার অনকোটিক প্রেসার কমিয়ে ফেলে। উপরন্ত এলুবুমিনিউরিয়া হওয়ার জন্যও অনকোটিক প্রেসার আরও কমে যায় ফলে শরীরে ইডিমা হয় বা শরীর-এ পানি জমা হয়ে ফুলে যায়। তবে শরীরের যেখানে লুজ কানেকটিভ টিস্যু আছে যেমন মুখ বিশেষতঃ চোখের পাতার নীচে এসমস্ত জায়গায় বেশী ইডিমা হয় যার জন্য কিডনী রোগে শরীরের সর্বত্রই ইডিমা হতে পারে তবে চোখের নীচে বা মুখে এটা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(খ) উচ্চ রক্তচাপ ও রক্ত শূন্যতা। (Hypertention, Anaemia)

(গ) শরীরে চুলকানি, সোরথ্রোট, খোস-পাঁচড়া। (Pruritis, Pyoderma, Sore Throat)

(ঘ) ঘন ঘন পাতলা পায়খানা বা বমির কারণে উদ্যালপতা। (Diarrhoea, Vomits, Dehydration)

(ঙ) কিডনী রোগের জটিলতার কারণে বিভিন্ন লক্ষণ সমূহ।

(চ) জ্বর (Fever)

(ছ) শিশুদের স্বাভাবিক বাড়ন্ত না হওয়া (Retardation of growth, Failure to thrive)

কিডনী রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ (Assessment of kidney function)

কিডনী রোগের রোগ নির্ণয়কে ৬ টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে

(ক) প্রস্রাবের পরীক্ষা -- (Urine Examination)

(খ) রক্তের জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য পরীক্ষা- (Biochemical tests)

(গ) এক্সরে (X Ray)

(ঘ) আলট্রাসাউণ্ড (Ultrasound)

(ঙ) রেডিওনিউক্লিউটাইডস্ক্যেনিং (Radionucleotide Scanning)

(চ) বায়োপসি -- (Biopsy)

banglainternet.com

(ক) প্রস্রাবের পরীক্ষা ঃ (ছবি – ৫, ৬, ৭ ও ৮)

কোন রোগীর কিডনী রোগ হয়েছে বলে সন্দেহ করলে চিকিৎসকের উচিৎ প্রথমে প্রস্রাব পরীক্ষা করা। যদিও কিডনীর ফাংশন বলতে গ্লোমেরুলার ফাংশন এবং টিবিউলার ফাংশন দুইই বুঝায়। প্রস্রাবের পরীক্ষা গুলো দিয়ে আমরা বুঝতে পারি রোগীর কিডনীর কোন রোগ আছে কিনাঃ কিন্তু তার কিডনীর কার্য্যকরী ক্ষমতা রোগের কারনে কতটুকু কমেছে সেটা প্রকৃতভাবে প্রস্রাবের পরীক্ষায় বুঝা যায় না। প্রস্রাবের পরীক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রোটিনইউরিয়া, হেমাচুরিয়া, প্রস্রাবে শ্বেত কনিকা বা কাষ্ট এর উপস্থিতি, ২৪ ঘন্টার প্রস্রাবের পরিমাণ ও টোটাল প্রোটিন এবং প্রস্রাবের কালচার ও সেনসিটিভিটি পরীক্ষা। খালি চোখে প্রস্রাব এর রং হেমাচুরিয়ার জন্য লাল, কাইলের জন্য দুধের মত সাদা হতে পারে। হিট টেষ্ট বা এলবুষ্ট্রীক দ্বারা প্রস্রাব পরীক্ষা করে এলবোমিন আছে কিনা তা দেখা কিডনীর রোগ থাকলে অত্যন্ত জরুরী। যেহেতু প্রস্রাবের হিট টেষ্ট এবং এলবোষ্ট্রীক ১৫০ মিঃ গ্রাঃ / লিটার প্রোটিন নির্ণয় করতে পারে। ২৪ ঘন্টায় যেখানে ২০০ মিঃ গ্রাঃ প্রোটিন নির্গত হওয়া স্বাভাবিক সেখানে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার জন্য উপরোক্ত টেষ্ট ২টি খুব জরুরী। অনেক সময় প্রস্রাব কনসেনট্রেটেড হলে ট্রেস প্রোটিনইউরিয়াকে স্বাভাবিক হিসেবে ধরা হয়।

(খ) রক্তের জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য পরীক্ষা ঃ

কিডনী রোগের রোগ নির্ণয় এবং এর কার্য্যকরী ক্ষমতার পরিমাণ পর্যালোচনার জন্য এই টেষ্টগুলি প্রয়োজন। যেহেতু কিডনী রোগে কিডনীর স্বাভাবিক কার্য্যকরী ক্ষমতা কমে যায় সেহেতু এই টেষ্টগুলির সাহায্যে নির্গমন, শোষন এবং হেমোষ্টেসিস এর বিপরীতে কিডনীর স্বাভাবিক ক্ষমতা কতটুকু কমেছে তা বুঝা যায়। এইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীচে বর্ণনা করা হবে।

ঃ রক্তে নন্–প্রোটিন নাইট্রোজেনাস পদার্থ ঃ

নন্–প্রোটিন নাইট্রোজেনাস পদার্থ সমুহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ইউরিয়া, এবং ক্রিয়েটিনিন। এগুলো বিপাকের বিশেষতঃ প্রোটিনের প্রান্ত দ্রব্য। এগুলো যকৃতে (লিভার) তৈরী হয় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এ্যামোনিয়া থেকে (জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে) এবং অর্থিনিন সাইকেল এর সাহায্যে।

banglainternet.com

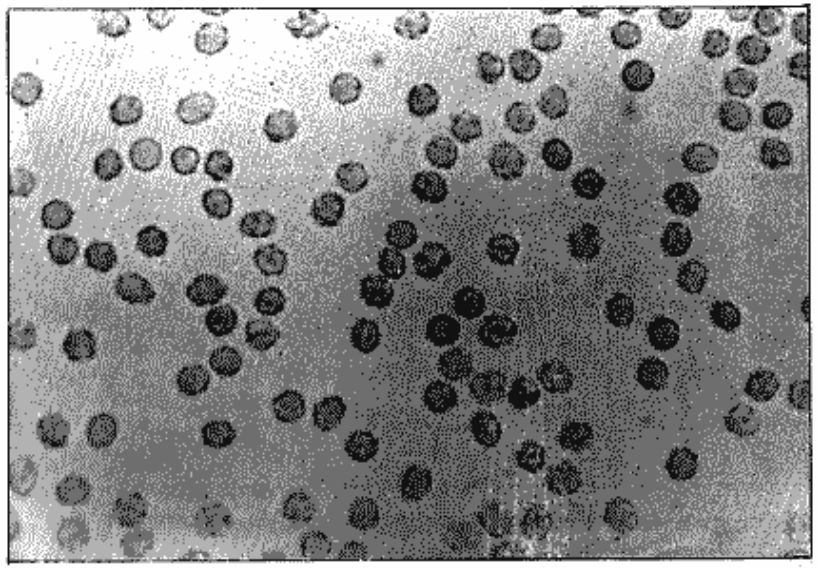

ছবি ৫ প্রস্রাবের রুটীন পরীক্ষায় আরবিসি বা লোহিত কণিকা মাইক্রোসকপের নীচে যেমন দেখায়।

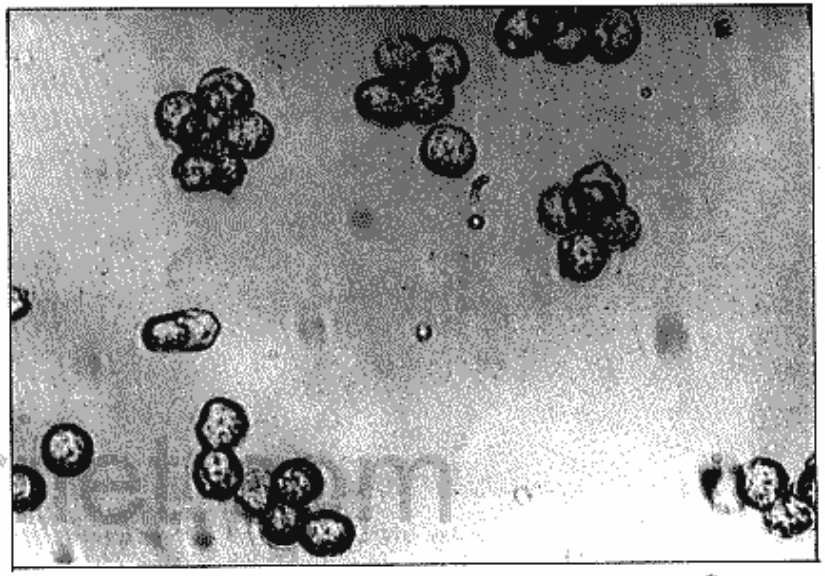

ছবি ৬ প্রস্রাবের রুটীন পরীক্ষায় শ্বেত কণিকা বা পুঁজ সেল মাইক্রোসকপের নীচে যেমন দেখায়।

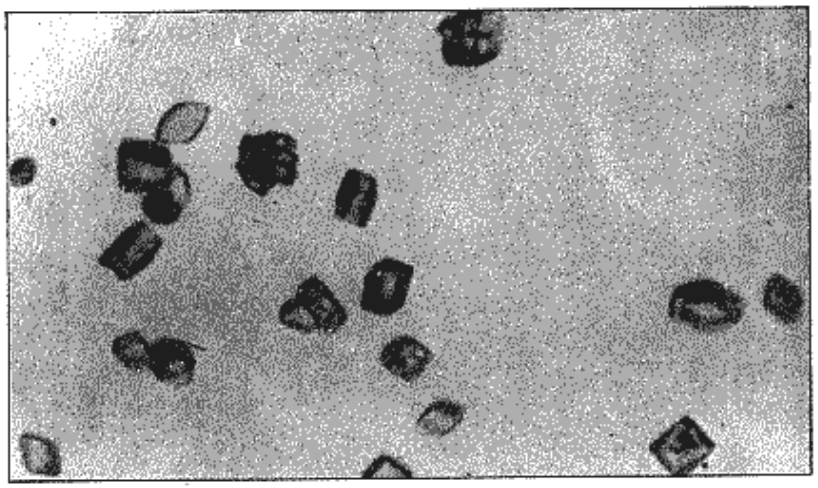

ছবি ৭ প্রস্রাবের রুটীন পরীক্ষায় আনঅর্গানাইজড ডিপোজিট মাইক্রোসকপের নীচে যেমন দেখায়।

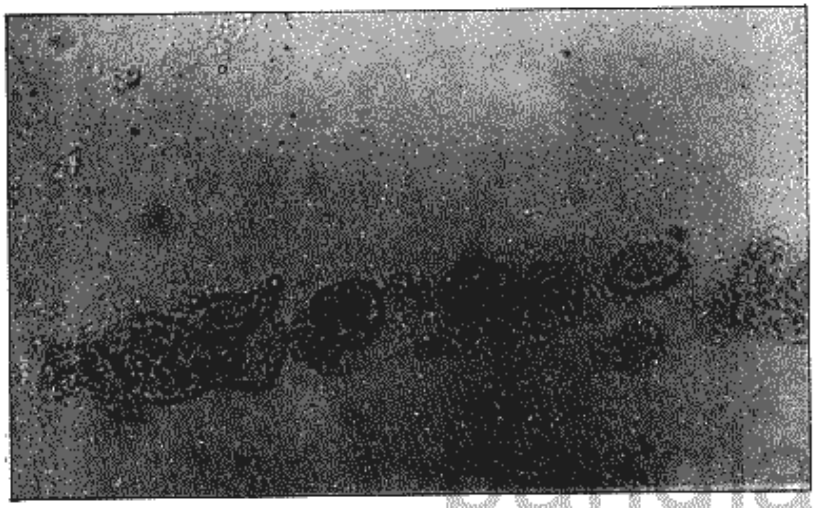

ছবি ৮ প্রসারের রুটীন পরীক্ষায় সেলুলার কাষ্ট মাইক্রোসকপের নীচে যেমন দেখায়।

ইউরিয়া তৈরী হবার পর তা গ্লোমেরুলাস দিয়ে নির্গত হয় কিছু টিবিউলস দিয়ে পুনঃশোষিত হয়।

কিডনীর রোগ ছাড়াও নীচের কারণে ইউরিয়া বা বান (BUN) এর পরিমান বেশী হতে পারে যা স্মরণ রাখা উচিৎ।

প্রিরেণাল -- সার্জিক্যাল শক, এডিশনস ডিজিজ, কঞ্জেষ্টিভ হার্ট ফেইলার, রক্তপাত বিশেষতঃ অন্ত্রের রক্তপাত, বেশী পরিমান প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহন।

পোষ্টরেণাল -- ইউরিনারি ট্রাক্ট এর অবষ্ট্রাকশন বিশেষতঃ প্রোষ্টেটিক গ্লাণ্ডের হাইপারট্রফি।

রক্তে ইউরিয়ার পরিমান বেশী হলে তাকে এজুটেমিয়া বলে।

ক্রিয়েটিনিন -- একটি নাইট্রোজেনাস পদার্থ যার ৯৮% মাংসপেশীতে থাকে। মাংসপেশীর সংকোচনে এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এটা প্রসাব দিয়ে এর এনহাইড্রাইট অর্থাৎ ক্রিয়েটিনিন হিসেবে নির্গত হয়। যেহেতু ক্রিয়েটিনিন আভ্যন্তরিন বিপাকের ফলে উদ্ভুত এবং তা টিবিউলে পুনঃশোষিত হয় না এবং খাবার সংগে এর কোন সম্পৃক্ততা নেই সেহেতু সঠিকভাবে নির্ণিত হলে রক্তে এর মান কিডনী রোগের রোগ নির্ণয়ের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। কিডনীর রোগের ব্যাপকতা যত বাড়বে ক্রিয়েটিনিন এর মানও তত বাড়বে। এর স্বাভাবিক অনুপাত ১০ ঃ১। এটা ১৫ ঃ ১ বেশী হয় প্রি এবং পোষ্ট রেণাল এজুটেমিয়া এবং অন্ত্রের রক্তপাতের কারণে।

ব্লাড ইউরিয়া ও প্লাজমা ক্রিয়াটিনিন কিডনী অর্থাৎ গ্লোমারুলার ফাংশন দেখার জন্য বহুল প্রচলিত দুইটি টেষ্ট।

১. ইউরিয়া এবং ক্রিয়াটিনিন সমপরিমানে বাড়তে থাকে

- ক্রনিক রেনাল ফেয়লিওর।
- এসটাবলিসড এ্যাকুট রেনাল ফেয়লিওর।

২. ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিনের তুলনায় অনেক বেশী বেড়ে যায় নিম্নলিখিত অবস্থাতে।

- প্রোটিন খাদ্য বেশী দিলে।
- জি, আই ট্রাক্টে ব্লিডিং হোলে।

banglainternet.com

* যখন প্রোটিন ক্যাটাবলিজম বাড়ে যেমন ট্রমা, ইনফেকশন, ষ্টেরয়েড থেরাপি

* ডিহাইড্রেশান থাকলে।

৩. ইউরিয়া-ক্রিয়াটিনিনের তুলনায় কম হোয়ে থাকে –

প্রেগন্যান্সি, কম প্রোটিন খেলে, লিভার রোগ থাকলে এবং ওভার হাইড্রেশন থাকলে।

৪. প্লাজমা ক্রিয়াটিনিন তুলনামূলক ভাবে ইউরিয়ার চেয়ে বেশী থাকে র‍্যাবডোমায়োলাইসিস হলে।

গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট ঃ ইনুলিন ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট (GFR) টেষ্টের প্রধান পদ্ধতি। ৫১ Cr Edetate একটা ইনজেকশান দেওয়ার পর প্লাজমা এর পরিমান দেখে এটা মাপা হয়। ক্লিনিক্যালী ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স টেষ্ট করে এটা দেখা যায়। প্লাজমা ক্রিয়েটিনিন ও রক্তে ইউরিয়ার মান দেখেও এটা নির্ণয় করা সম্ভব। কারণ রক্তে এদের পরিমান বাড়লে বুঝতে হবে যে ফিল্টেশন রেট কম। সিরাম ক্রিয়েটিনিন এর মান নির্ণয় করে নীচের সূত্র ধরে এটা নির্ণয় করা সম্ভব।

$$\text{জি এফ আর (GFR/mL/minute)} = \frac{(১৪০-\text{বয়স})\times\text{ওজন(কেজি)}}{৭২\times\text{সিরাম ক্রিয়েটিনিন}}$$

এই ফলাফল পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য ১৪% কম হবে।

ক্লিয়ারেন্স টেষ্ট ঃ

যে সমস্ত পদার্থ প্রসাব দিয়ে নির্গত হয় তার বেশীর ভাগই কিডনী রক্ত থেকে শোধন করে। সুতরাং সেই বস্তু যদি X হয় Umg যদি সেই পদার্থ প্রসাবে ১ মিনিটে কতটুকু নির্গত হল তা বুঝায় এবং এর কনসেনট্রেশন যদি Pmg/dL হয় তাহলে এক মিনিটে $\frac{\text{ইউ} \times ১০০ \text{ এম এল}}{\text{পি}}$ প্লাজমা ক্লিয়ার হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। বিভিন্ন বস্তুর ক্লিয়ারেন্স ভ্যালু বিভিন্ন ধরণের। যেমন গ্লুকোজ এর ক্লিয়ারেন্স ভ্যালু নাই বললেই চলে কারণ প্রায় ১০০% গ্লুকোজ টিবিউলসে পুনঃশোষিত হয়।

ইনুলিন একটি পলিসাকারাইড (মলিকুলার ওয়েট ঃ ৫০০০) সম্পূর্ণ ভাবে গ্লোমেরুলাস দিয়ে পরিস্রাবিত হয় এবং টিবিউলস দিয়ে পুনঃশোষিত হয় না। সুতরাং ইনুলিন ক্লিয়ারেন্স একটা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি গ্লোমেরুলার ফাংশন এবং গ্লোমেরুলার ব্লাডফ্লো দেখায়। তেমনিভাবে PAH_p এমাইনোহিপিপউরিক এসিড গ্লোমেরুলাই এবং টিবিউল দিয়ে নির্গত হয়। সুতরাং এই পদার্থের ক্লিয়ারেন্স দিয়েও গ্লোমেরুলার ফাংশন পরিমাণ করা যায়। তবে সাধারণতঃ ইনুলিন এবং PAH ক্লিয়ারেন্স গবেষণাগারের কাজে সীমাবদ্ধ। ক্লিনিক্যালি ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স টেষ্ট করা হয়ে থাকে। ২৪ ঘন্টার প্রসাব নিয়ে প্রসাবে এবং সিরাম ক্রিয়েটিনিন এর মান নির্ণয় করে এটা করা সম্ভব।

রেনাল প্লাজমা ও ব্লাড ফ্লোর মান নির্ণয়

প্রসাবে নির্গত বস্তুর উপর ভিত্তি করে এবং ফিক সূত্র প্রয়োগ করে রেনাল প্লাজমা ও ব্লাডফ্লো নির্ণয় করা সম্ভব।

$$\text{সূত্র RPF (ml/mint.)} = \frac{\text{UV (প্রতিমিনিটে নির্গমন)}}{\text{RA-RV (আর্টারিওভেনাস পার্থক্য)}}$$

যেখানে RPF = রেনাল প্লাজমা ফ্লো

UV = প্রসাবের ভলিয়ুম ও যে পদার্থ নির্গত হল তার কনসেনট্রেশান

RA = যে পদার্থ দেওয়া হয়েছে তার কনসেনট্রেশান রেনাল আর্টারিতে

RV = যে পদার্থ দেওয়া হয়েছে রেনাল ভেইনে তার কনসেনট্রেশান

এর থেকে আবার রেনাল ব্লাডফ্লো RBF বের করা যাবে।

$$\text{সূত্র RBF} = \frac{\text{RPF}}{\text{I - (I - H CT/100)}}$$

স্বভাবতই যে পদার্থ কিডনী দিয়ে সম্পূর্ণ নির্গত হবে এবং যার RA-RV ডিফারেন্স বেশী হবে, সেটাই ভাল ফল নির্দেশ করবে। এই পদার্থের মধ্যে আদর্শ হল প্যারাএমাইনো হিপ্পিউরিক এসিড (PAH) যাৎ ইন্ট্রাভেনাসলি ইনফিউশান সহযোগে দেওয়া হয় যতক্ষন না একটা ষ্টিডি প্লাজমা কনসেনট্রেশান না হয়। যদি PAH লেভেল ৫ মিলিগ্রাম/১০০ মিলিলিটার হয় তাহলে এর ৯০% কিডনী দিয়ে নির্গত হবে। আর যদি কিডনী রোগ থাকে তাহলে এর থেকে কম নির্গত হবে। উপরন্ত ভেনাস ব্লাড না আটারিয়াল ব্লাড যে কোন স্যাম্পল থেকে এর মান নির্ণয় করা সম্ভব। $RPF = \frac{UV}{RA}$ তবে এই টেষ্ট সাধারণত গবেষনাগারে রিসার্চ কাজে বেশী ব্যবহার হয়ে থাকে।

banglainternet.com

কিডনী টিবিউল ফাংশন টেষ্ট

কিডনী টিবিউলস এর রোগ অনেক কম হয়ে থাকে।

(ক) প্রক্সিম্যাল টিবিউলস এর ফাংশন টেষ্ট করতে হোলে প্রস্রাবে গ্লুকোজ, ফসফেট, এ্যামিনো এসিড ও ইউরিক এসিড বেশী নির্গত হবে।

কোন রুগীর প্রস্রাবে যদি গ্লুকোজ থাকে এবং ব্লাড গ্লুকোজ স্বাভাবিক থাকে এবং তার প্রস্রাবে অ্যামিনো এসিডিউরিয়া পাওয়া যায় তাহলে তার প্রক্সিমাল টিবিউলস এর রোগ আছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

(খ) ডিষ্ট্যাল টিবিউলস এর ফাংশন

ইউরিনারী কনসেনট্রেটিং এণ্ড ডাইলুটিং টেষ্ট যা ১২-২৪ ঘন্টা পানি না দিলে স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাবের অসমোলালিটি বেড়ে যাবে। আর পানি বেশী পরিমানে দিলে অসমোলালিটি কমে যাবে।

(গ) এসিডিফিকেশান টেষ্ট ঃ NH_4CL ১০০ মিলিগ্রাম প্রতিকেজি বডিওয়েট দিলে প্রস্রাবের PH কমে ৫.৩ এ আসা উচিত না এলে বুঝতে হবে ডিষ্ট্যাল টিবিউল খারাপ আছে বা রোগগ্রস্থ হয়েছে।

ইম্পেয়ার্ড কনসেনট্রেটিং পাওয়ার (প্রস্রাবের কনসেনট্রেশন এবং ডাইলিশন টেষ্ট) ঃ স্বাভাবিক ভাবে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট এর শতকরা ৯৯% পুনঃশোষিত হয় টিবিউলস দিয়ে। এর কিছু অংশ (১২.৫%) নির্ভর করে টিবিউলার ইপিথেলিয়াম এর লাইনিং সেল এর অখণ্ডতার উপর। যদি টিবিউলের এই ক্ষমতা না থাকে তাহলে প্রস্রাব যার আইসোঅসমোটিক প্রেসার আছে ১০১০ তা বের হয়ে যাবে শরীরের পানির প্রয়োজন থাক বা না থাক। সাধারণতঃ শরীরের পানির প্রয়োজন বেশী হলে খুব কনসেনট্রেটেড প্রস্রাব (যার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী হবে) নির্গত হয়। আবার বেশী পানি প্রস্রাবের সংগে বের হয়ে গেলে প্রস্রাব ডাইলুটেড হবে (যার আপেক্ষিক গুরুত্ব কম হবে)। প্রথমে পানি কম খেতে বলে পরে রোগীকে বেশী পরিমানে পানি খেতে বলতে হবে। টিবিউলের ফিজিওলজিক রেসপন্স দেখতে হয়। যদি বেশী কিডনী রোগ থাকে তাহলে প্রস্রাব (যার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১০ কন্সট্যান্ট) নির্গত হবে যাকে আইসোথেনিউরিয়া বলে। কিডনীর পানি নির্গমনের ক্ষমতা কমে যায় বলে বেশীর ভাগ রোগীর রাতে প্রস্রাব বেশী হয় (নকচুরিয়া)। এই পরীক্ষাটা

বর্তমানে পরিবর্তিত ভাবেও করা যায় যার নাম মোজেনথাল এবং ফিসবার্গ টেষ্ট যেখানে প্রস্রাবের অসমোলারিটি বা প্রস্রাব/সিরাম এর অসমোলারিটি রেশিও বা অনুপাত দেখা হয়। যদি প্রস্রাবের অসমোলারিটি ৮৫০ m Osm/Kg নীচে হয় তাহলে কিডনী রোগ আছে ধরে নিতে হবে। খুব মারাত্মক কিডনী রোগে এটা ৩০০ m Osm/Kg নীচে নেমে যাবে। আর প্রস্রাব/সিরাম এর অসমোলারিটির স্বাভবিক অনুপাত হতে হবে ৩ ঃ ০ । এর তারতম্য হলে বুঝতে হবে কিডনী রোগ আছে। সাধারণতঃ নীচে উল্লেখিত কারণে এই ইম্পোয়ার্ড কনসেনট্রেটিং পাওয়ার হতে পারে।

১ কিডনীর রোগ বিশেষতঃ যেখানে টিবিউলের ক্ষতি বেশী হয় যেমন পাইলোনেফ্রাইটিস।

২ একুউট রেণাল সাট ডাউন থেকে অস্থায়ীভাবে উন্নতির সময়।

৩ খুব বেশী পটাশিয়াম বের হয়ে গেলে। হাইপার ক্যালসেমিয়া, ভিটামিন ডি ইনটক্সিকেশন এর জন্য।

৫ জন্মগত টিবিউলের রোগ যেমন নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এবং ফ্যানকোনী সিনড্রোম।

৬ অর্গানিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস

৭ ফাংশনাল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বেসী পানীয় গ্রহণের কারণে

গ) এক্সরে

কিডনীর রোগ নির্ণয় ও এভালুয়েশনের জন্য এক্সরে একটা আবশ্যক সম্পদ। কিডনীর সাইজ, শেপ, পজিশন ইত্যাদি এক্সরেতে ভালমত বুঝা যায়। কিডনী রোগে অনেক ধরণের এক্সরে করা যায় যার মধ্যে নীচের গুলো প্রধান।

প্লেন এক্সরে এবডোমেন

ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাফি (আই, ভি, ইউ – IVU)

রেট্রোগ্রেড পাইলোগ্রাফি

মিকচুরেটিং সিসটোউরেথ্রোগ্রাফি

রেনাল আর্টারীওগ্রাফি

banglainternet.com

এর মধ্যে আই.ভি. ইউ (IVU) বেশী প্রচলিত এবং নীচে বর্ণনা করা হলোঃ –

আই.ভি. ইউ টেষ্ট কিডনী ইউরেটার এবং ব্লাডার পরীক্ষার একটি বহুল প্রচলিত এবং কার্যকরী টেষ্ট। সাবধানে করলে এটি একটি নিরাপদ পদ্ধতি। এতে শতকরা ৫ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে সামান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং শতকরা ০.০৫ ক্ষেত্রে খুব মারাত্মক জটিলতা প্রকাশ পেতে পারে যার তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রয়োজন। আই.ভি.ইউ করতে যেহেতু অনেক বড় সিরিঞ্জ দিয়ে বেশী পরিমান ঔষধ আই ভি ইউ রুটে দেয়া হয় তাই অনমনে এর জন্য একটা ভীতি আছে। রোগীদের বুঝিয়ে বলতে হবে এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলা করার জন্য রেডিওলজিষ্টদের তৈরী থাকতে হবে। যাদের এলার্জী আছে তাদের টেষ্ট ডোজ দিয়ে নেয়া উচিৎ। যাদের ব্রঙ্কিয়াল এজমা আছে, বহুমুত্র আছে, মাইলোমাটোসিস এবং সাম্প্রতিক মায়োকর্ডিয়াল ইনফ্রাকশানে আক্রান্ত রোগীদের আই ভি ইউ না করালেই ভাল। কিডনী ফেইলিওর থাকলেও আই ভি ইউ এর প্রয়োজন হলে Late films অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা পর ফিল্ম নেয়া উচিৎ।

আই ভি ইউ এর উপকারীতা ঃ

আই ভি ইউ থেকে কিডনীর সাইজ, ক্যালিসেস পাটার্ন, ইউরেটার, ব্লাডার ইত্যাদি দেখা যায়। পাথর অথবা টিউমার বোঝা যায়। যদি একদিকের ছোট কিডনী হয় তাহলে নীচের সম্ভাবনাগুলো চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।

- একদিকের পাইলোনেফ্রাইটিস
- জন্মগত হাইপোপ্লেসিয়া
- রেনাল আর্টারী ষ্টেনোসিস
- ইনফারকশন ইত্যাদি

দুই দিকের ছোট কিডনী হলে

- ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস
- ক্রনিক বাইলেটারাল পাইলোনেফ্রাইটিস
- বহুমুত্র

- নেফ্রো স্কেলেরোসিস

অনেক সময় আই ভি ইউ তে একটা কিডনী দেখা যায় না বলে অনেকে এই কিডনী ফেলে দিতে চান। এটা মোটেও ঠিক না । যখন IVUতে একটা কিডনী দেখা যায় না তখন দেখতে হবে কিডনীর সাইজ কেমন আছে। যদি কিডনীর স্বাভাবিক সাইজ হয় তা হলে অবষ্ট্রাকশান (পাথর), বহুমুত্র, যক্ষ্মা, রোগ সন্দেহ করা উচিৎ এবং পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ এবং কিছুদিন পর আই ভি ইউ রিপিট করা উচিৎ। যদি আই ভি ইউ করে কি ডনীর সাইজ বড় পাওয়া যায় তাহলে নীচের কারণগুলো চিন্তা করতে হবে।

এক সাইডের কিডনী বড় হলে

- এক সাইডের হাইড্রোনেফ্রোসিস
- একসাইডের সিষ্ট
- এক সাইডের টিউমার

আর দুটো কিডনী বড় হলে চিন্তা করতে হবে

- বহুমুত্র রোগ
- পলিসিসটিক কিডনী
- বাইলেটারাল হাইড্রোনেফ্রোসিস

ঘ) আলট্রাসাউণ্ড (সনোগ্রাফি)

গত কয়েকবছরে আলট্রাসনো গ্রাফি বহুল পরিমাণে কিডনী ও অন্যান্য রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটা একটা নন ইনভ্যাসিভ টেকনিক যেটা বিপদ বা হ্যাজার্ডমুক্ত। রাডার সম ডিজাইন বা উচ্চ শক্তি সম্পন্ন সাউণ্ড ওয়েভ কাজে লাগিয়ে আলট্রাসাউণ্ড সলিড বা ফ্লুয়িড ফিল্ড অর্গানের সীমানা চিহ্নিত করণ করতে পারে। কিডনীর সাইজ, সেপ, সিসটিক কিডনী রোগ, পাথর, ক্যালসিফিকেশান খুব ভালভাবে নির্ণয় করতে পারে অন্যান্য পদ্ধতিথেকে। রেনাল বায়োপসির জন্য ভাল গাইড হিসাবে কাজ করে। ব্লাডার ও প্রষ্টেটিক টিউমার এর জন্যও এটা ভাল। তবে আল্ট্রাসাউণ্ড এর ফাইণ্ডিং অন্য পদ্ধতি দ্বারা কনফর্ম করতে হবে।

banglainternet.com

গামা ক্যামেরা ষ্টাডি ঃ

এতে টেমনিটিয়াম ৯৯ জি টি পি এ ইনজেকশান দিয়ে দুটো কিডনী আলাদা অথবা একটি কিডনীর আংশিক ফাংশান বুঝা যায়। এই পদ্ধতিতে দুটো কিডনীর গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশান রেট মাপা যায়। সিরিয়াল ষ্টাডি করে অবষ্টাকশনের ফল বা অপারেশনের পরে এই টেষ্ট বেশ সাহায্য করে।

সিটি স্কানিং ঃ

যদিও ১৯৭৩ সালে ব্রেনের ইমেজিং এর জন্য প্রথম ব্যবহার হয়, এই পদ্ধতি বেশ অগ্রসর হয়েছে এবং এটাকে এখন শরীরে অন্যান অংগ প্রত্যংগের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কিডনী রোগের বিশেষত ছোট টিউমার রোগ নির্ণয়ে খুব সাহায্য করে থাকে। তবে কিডনী রোগে আই ভি ইউ যদি ও একটু কষ্টকর তবুও বহুল ব্যবহৃত এবং কিডনী রোগের রোগ নির্ণয়ে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

ঙ) রেডিও নিউক্লিডটাইড দিয়ে স্কানিং ঃ

রেডিও আইসোপ ট্যাগ করা কম্পাউণ্ড (যেমন হিপিপউরেট সোডিয়াম I_{131} ফ্লোরমেরেড্রিন Hg_2O_3, টেকনিটিয়াম $^{99}_{m}Tc$) সেনসিটিভ ডিটেকটরস সিনটিলেশন ক্যামেরা দিয়ে রেণাল ব্লাড ফ্লো, সাইজ এবং সেপ, ইউরেটেরাল অবষ্টাকশান, ডাইলেটেড ইউরেটার এবং ব্লাডার ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা যায়।

চ) রেণাল বায়োপসী

রেণাল ডিজিজ জানার জন্য পারকিউটেনিয়াস রেণাল বায়োপসির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। অনেকের ধারণা যে রেণাল বায়োপসী একটা ভয়ের ব্যাপার কারণ কিডনী খুব ভাসকুলার অর্গণ এবং $\frac{১}{৫}$ কার্ডিয়াক আউটপুট এর মধ্যে প্রবাহিত হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো যে এর অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে যা বায়োপসির পক্ষে রায় দেবে। যেমন কিডনী একট্রাপেরিটোনিয়ালী থাকে, এটার সংখ্যা দুটো, এটা চামড়ার নীচে অবস্থিত , এটা একটা টাইট ফেসিয়াল কম্পার্টমেন্ট দিয়ে মোড়ানো থাকে ফলে বায়োপসীর ক্ষত থেকে বেশী রক্তপাত হতে দেয় না এবং সর্বোপরি এর সুক্ষ্ম এনাটমি ভাল নমুনা পেতে সাহায্য করে। ব্রাণ ও

রাসকুর মতে জাংগমান ১৯২৪ সালে প্রথম সার্জিকাল রেণাল বায়োপসি সম্পন্ন করেন। এরপর অলওয়াল ১৯৪৪ সনে রেণাল বায়োপসি করেন কিন্তু একজন রোগীর কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৫৪ সনে পেরেজ আয়া বায়োপসি করেন। তবে আধুনিক বায়োপসির প্রচলন করেন ইভারসেন এবং ব্রান ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সনের মধ্যে।

টেকনিক্যাল কনসিডারেশন ঃ

কিডনীর বায়োপসি করার আগে নীচে বর্ণিত ফ্যাক্টর গুলো ভালমত বিবেচনা করতে হবে।

ক এক্সরে এনাটমি ঃ কিডনীর উচ্চতা এবং প্রস্থের স্বাভাবিক অনুপাত লাম্বার ভার্টিব্রার লেভেল ৩.৭ ± ০.৩৭ সেন্টিমিটার। যেহেতু কিডনী ডেন্স ফ্যাটে মোড়া থাকে সেহেতু এক্সরতে এর একটা রেডিওগ্রাফিক অপাসিটি দেখা যায়। কিডনী প্যারেনকাইমার মত কিডনীর হাইলাস সাধারনত ২য় লাম্বার ভার্টিব্রার বিপরীতে থাকে। শ্বাস নেওয়ার সময় ডানদিকের কিডনী প্রথম লাম্বার ভার্টিব্রার নীচে যাবে। খুব জোরে শ্বাস নিলে কিডনী খুব বেশী হলে ৩ সেন্টিমিটার মুভ করতে পারে। কিডনীর লোয়ার পোলে বা নীচের প্রান্ত এই বায়োপসী করার জন্য আদর্শ, কারণ হোল লোয়ার পোলে সবচেয়ে কম সংখ্যক বড় ভেসেল থাকে এবং এটা খুব কম ভাসকুলার। উপরন্তু এই পজিশনে কিডনী খুবই সাবকিউটিনিয়াসলী থাকে।

খ কিডনীর লোকালাইজেশনও এক্সরেতে দেখা হয়ে থাকে। সবচেয়ে বড় সহজ হোল একটা প্লেন এক্সরে এবডোমেন করা, জি আই ট্রাক্ট পরিস্কার করার পর। অনেকে অবশ্য ইনট্রাভেনাস পাইলোগ্রাম পছন্দ করেণ। তবে ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাফি করার আগে দেখে নিতে হবে যেন বান (BUN) স্বাভাবিক থাকে বা ৬০ মিঃ গ্রাম এর উপরে না যায়। এজুটেমিক রোগী যাদের ৬০ মিঃ গ্রাম এর উপরে বান (BUN) থাকে তাদের অনেক সময় আলট্রাসাউণ্ড করে কিডনী লোকালাইজেশান করা হয়।

গ আলট্রাসাউণ্ড মেশিন দ্বারা কিডনীর সারফেসের এনাটমি মার্কিং করে আজকাল কিডনী বায়োপসি করা হয়।

ঘ পজিশনের তারতম্য এবং কোন ধরণের নিডল ব্যবহার করতে হবে ঃ বিভিন্ন সার্জন বিভিন্ন অবস্থায় কিডনী বায়োপসি করেছেন। পেরেজ

banglainternet.com

আয়া প্রথম লেটারাল এবং পরে প্রণ অবস্থায় সাধারণ ক্যানুলা এবং সিরিঞ্জ দিয়ে কিডনী বায়োপসি করেছেন। এর পর ইভারসন এবং ব্রাণ বসে এবং লেটারাল অবস্থায় বায়োপসী করছেন। পারেট প্রোন অবস্থায় পেটের নীচে একটি বালুর ব্যাগ দিয়ে বায়োপসী করেছেন। তবে বর্তমানে খ্রোন অবস্থায় পেটের নীচে বালিশ দিয়ে এই কিডনী বায়োপসী করা বেশী প্রচলিত।

বিভিন্ন ধরণের নিডল বায়োপসীতে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন ইভারশন নিডল, টার্ফল নিডল, ফ্রাঙ্কলিন মডিফিকেশন, ভিম সিলভার ম্যান নিডল এবং মডিফিকেশন অফ ভিম সিলভার ম্যান নিডল। তবে ভিম সিলভারম্যান নিডলই বর্তমানে বেশী প্রচলিত কিডনীর নিডল বায়োপসীর জন্য।

পারকিউটেনিয়াস রেণাল বায়োপসীর জন্য কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে ঃ

যখনই পারকিউটেনিয়াস রেণাল বায়োপসীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তখন নীচের জিনিষগুলো ভালভাবে খেয়াল করতে হবে।

১ রোগীর লিখিত অনুমতি, রোগীকে অপারেটিভপদ্ধতি ও এর জটিলতা বুঝানোর পর।

২ এক্সরে এবং ইনট্রাভেনাস পাইলোগ্রাফী, আলট্রা সাউণ্ড।

৩ রক্তের পরীক্ষা হেমাটোক্রিট, বিটি সিটি, প্লাটিলেট কাউন্ট, প্রথোম্বিন টাইম, বান, গ্রুপআর এইচ।

৪ একটি ট্রেতে সংযুক্ত জিনিষগুলো রাখতে হবে। একটি সার্জিক্যাল ড্রাগ, তিনটি ষ্টেরাইল টাউয়েল, ১০মিঃ লিঃ একটি সিরিঞ্জ, তিনটি সুচ (১৯,২৬ , ২৩ গেজি) ১টা ১১ নং ব্লেড, স্কালপেল, ভিম সিলভারম্যান নিডল, বিভিন্ন ফিকেক্সটিভ এর বোতল, চামড়া ষ্টেরিলাইজেশনের সলুশন, লিউকোপ্লাষ্ট, তুলা, ব্যাণ্ডেজ, এট্রোপিন, প্রোকেইন। (ছবি–৯)

৫ কিডনীর বায়োপসী সাধারণত রোগীর বিছানায় করাটাই শ্রেয় (যাতে রোগী মানসিক বিপর্যস্ত না বোধ করতে পারে) কারণ অপারেশন টেবিলে বা অন্য কোন স্থানে নেওয়ার জন্য বায়োপসীর পরে রোগীকে যেন বেশী নাড়া–চাড়া করতে না হয়। রোগীকে প্রোন অবস্থায় একটা নরম বালুশ পেটের নীচে দিয়ে শোয়ান হয়। খেয়াল রাখতে হবে যেন রোগীর শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে, কাঁধ নীচের দিকে থাকে এবং

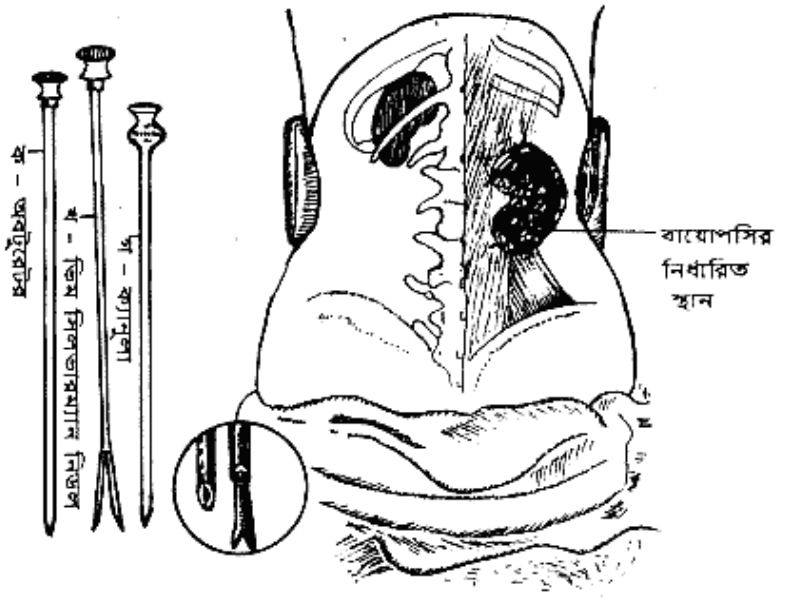

ছবি ৯ কিডনী বায়োপসির স্থান ও যন্ত্রপাতি।

মাথা যে বায়োপসী করছে তার থেকে আড়াল থাকে। কাঁধ এবং বিছানা সমান্তরাল থাকে এবং শিরদাঁড়া সটান থাকে। এর পর রোগীকে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার নিয়ম বলে এক্সরে দেখে বায়োপসীর স্থান ঠিক করতে হবে। সাধারণত পছন্দ মত বায়োপসীর স্থান একটা ট্রাইঙ্গেল এর মধ্যে অবস্থিত হবে যার লেটারাল বর্ডার হবে সাক্রোস্পাইনালিস দিয়ে, ইনফেরিওর বর্ডার হবে শেষ রিব দিয়ে এবং উপরের বর্ডার হবে কোয়োড্রোটাস লাম্বোরাম দিয়ে। এই অবস্থায় বায়োপসী করার জন্য শুধুমাত্র ল্যাটিসিমাস ডরছি এবং সিরেটাস পষ্টেরিওর মাংশ ফুটা করার দরকার। একটা প্রেসার কাফ বেধে ব্লাড প্রেসার এবং পালস দেখতে হবে এবং লিখে রাখতে হবে। এরপর বায়োপসী করার স্থানের চারপার্শ্বে লোকাল দিয়ে নিতে হবে প্রকেইনইনজেকট করে। একটা ছোট লিনিয়ার ইনসিশন দিয়ে নিডল ঢুকাতে হবে এবং যতক্ষন না পর্যন্ত রেনাল ক্যাপসুল অনুভব করা যায়। রেনাল ক্যাপসুলে নিডল ঢোকার সময় শক্ত বাধা মনে হবে। তারপর রোগীকে শ্বাস ধরতে বলে আরও কিছু প্রকেন রেণাল ক্যাপসুলে ঢুকাতে হবে। এর নিডল বের করে

banglainternet.com

বায়োপসী নিডল ঢুকাতে হবে রোগীর শ্বাস বন্ধ থাকা অবস্থায়। এর পর রোগীকে ২/৩বার শ্বাস নিতে বলে আবার শ্বাস রুদ্ধ রাখতে বলতে হবে এবং রোগীকে বলতে হবে এবার কিছুটা ব্যাথা অনুভব করতে পারে।এর পর ক্যানুলা ৩৬০° রোটেশনে ঘুরাতে ঘুরাতে নিডলকে উপরের দিকে এবং খুব তাড়াতাড়ি পুরা যন্ত্রটা রোগীর থেকে বের করে ফেলতে হবে। স্বাভাবিক রেনাল বায়োপসী দেখতে গেরুয়া থেকে লাল টিসু হবে যেহেতুকর্টিক্যাল বা কর্টিক্যাল মেডুলারী জাংশন এর বেশী ভাসকুলালিরিটির কারনে। খালি চোখে বা হ্যাণ্ড লেন্স দিয়ে এটা দেখা সম্ভব। অনেকের বেলায় পেরিরেণাল ফ্যাটসহ ক্যাপসুলও সনাক্তকরা যায়। এরপর বায়োপসী স্পেসিমেন কোন উপযুক্ত ফিকজেটিভ এর মধ্যে চুবাতে হবে। এবং এরপর প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বায়োপসী স্থানটুকু ঢেকে ফেলে রোগীকে চিৎহয়ে শুয়ে রাখা যাবে একটা বালিশের উপরমাথা রেখে । রোগীকে কাশি দিতে, সিগারেট না খেতে বা হাঁচি ফেলতে না করতে হবে যাতে অন্ততঃ পরবর্তী ৪ ঘন্টা পেটের মাসল টাইট হয়ে ইনপ্রেসার বেড়ে না যায় এবং আরও ২৪ ঘন্টা বিছানায় বিশ্রাম নিতে বলতে হবে। রোগীকে ভারী কোন কাজকরতে না বলতে হবে পরের ১০ দিন। তারপর রোগী স্বাভাবিক কাজ করতে পারে।

রেণাল বায়োপসীর গুরুত্ব

নেফ্রোলজীতে রেনাল বায়োপসীর গুরুত্ব অপরিসীম যার কিছু নীচে বর্ণনা করা হলো।

১ কিডনীর বিভিন্ন রোগের সঠিক হিষ্টোলজীক ডায়াগনসিস এর জন্য যেমন নেফ্রোটিক সিনড্রোম , ইত্যাদি। মাল্টিপল রেণাল রোগ থাকলে কোনটা কতটুকু প্রপোরশন তা দেখার জন্য যেমন ঃ কিমেনষ্টীল উইলসন ডিজিজ ইত্যাদি।

২ ক্রম অনুসারে রোগের প্রগনোসিস দেখার জন্য।

৩ রিভারসেল কিডনী রোগের সময় এবং ডিগ্রী দেখার জন্য।

৪ সঠিক ঔষধের থেরাপী যেমন পাইলোনেফ্রাইটিস এর কারণে হাইপারটেনশন , নেফ্রোটিক সিনড্রোম, কোলাজেন ডিজিজ ইত্যাদি।

৫ খুব তাড়াতাড়ি সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য যখন অন্য ভাবে রোগ নির্ণয় সম্ভব নয় যেমন সারকয়ডোসিস ইত্যাদি।

৬ প্রগনোসিস দেখা।

৭ গবেষনা কাজের সুবিধার জন্য ই এম, ইমিনোফ্লোরোসেন্স সাইটোলজী ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য।

কন্ট্রাইণ্ডিকেশান ঃ

যদি

১। একটি কিডনী থাকে।

২। ব্লিডিং বা কোয়াগুলেশন কোন ডিফেক্ট থাকে।

৩। খুব তাড়াতাড়ি যে ইউরেমিয়া প্রগ্রেস করছে।

৪। মারাত্মক ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন।

৫। জানা ম্যালীগন্যান্সী।

৬। যে রোগীদের অপারেশন করা যাবে না যেমন ৬ বৎসরের নীচে রোগীর নিউরোলজীক ডিজঅর্ডার, সাইকোসিস, সিভিয়ার রোগ, অসহযোগীতা, মারাত্মক স্কেলেটাল ডিফেক্ট।

৭। যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং যেখানে বায়োপসী রোগীর জন্য উপকারী হবে না।

৮। রিলেটিভ কনট্রাইণ্ডিকেশন ঃ

ক) বেশী স্থূল বা বেশী মোটা হলে

খ) ছোট কিডনী

গ) অস্বাভাবিক অবস্থান

ঘ) গর্ভাবিস্থা

কমপ্লিকেশন ঃ

ক) গ্রস হেমাচুরিয়া (৫.২৫)

খ) ফ্লাঙ্ক বা লোইন ব্যাথা (২.২৫)

গ) রক্তপাত যেখানে রক্তভরণ প্রয়োজন (০.৮৫)

banglainternet.com

ঘ) পেরিরেণাল হেমাটোমা (০.৪২)

ঙ) রক্তপাতের কারণে নেফ্রেকটমি (০.১২)

চ) অন্যান্য অর্গাণ যেমন লিভার বা ইসপ্লীন, ইন্টেসটাইন, গলব্লাডার ফুটা হওয়া বা ফিসচুলা।

সঠিক ভাবে, দক্ষ অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দিয়ে তার তত্বাবধানে বায়োপসী করতে হবে। ঠিকমত রেনাল বায়োপসী করলে ০.০৭২ রোগীর মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং কিডনীর রোগ নির্ণয়ে এটা একটা অত্যন্ত সফল বা কম হ্যাজারডার্স পন্থা।

১ম অধ্যায়

৪র্থ পরিচ্ছেদ

কিডনী রোগ সম্পৃক্ত ফ্লুয়িড এবং ইলেকট্রেলাইট এর অস্বাভাবিকতা।

(FLUID AND ELECTROLYTE IMBALANCE IN KINDEY DISEASE)

মতিউর রহমান

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

কিডনী রোগ সম্পৃক্ত ফ্লুয়িড এবং ইলেকট্রোলাইট এর অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে বলার আগে স্বাভাবিক ফ্লুয়িড এবং ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে পানির ভলুম এর গ্রহণ (খাদ্য, পানি খাওয়া এবং জ্বালানী পুড়ে পানি তৈরী হওয়া) এবং নিস্কাষন (শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নির্গত হওয়া, ঘাম, প্রস্রাব এবং পায়খানার সঙ্গে নির্গমন) এর সমতার উপর নির্ভর শীল। মেদস্থুলতা হলে শরীরে পানির ভলুম কম থাকে কারণ ফ্যাট সেলে স্বাভাবিক কোষের তুলনায় খুব কম পানি থাকে। ফলে মেদস্থুল লোকের পানি শরীরের ওজন অনুপাতে কম হয় একজন লীন লোকের থেকে। একজন স্বাভাভিক প্রাপ্তবয়স্ক এবং লীন লোকের শরীরে পানির শতকরা হার নীচে প্রদান করা হল।

বয়স ও লিংগ ভেদে শরীরে পানির পরিমাণ

বয়স	পুরুষ	মহিলা
১০–১৮ বৎসর	৫৯২	৫৭২
১৮–৪০ বৎসর	৬১২	৫১২
৪০–৬০ বৎসর	৫৫২	৪৭২
৬০ বৎসর এর উর্ধ্বে	৫২২	৪৬২

শরীরের বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে পানির বিতরণ নির্ভর করে সল্যুট এর পরিমাণ এবং বিতরণের উপর। কোষ এবং কোষ মেমব্রন ক্যাপীলারি থেকে,

banglainternet.com

ইন্টারষ্টিশিয়াল ফ্লুয়িডএবং কোষ থেকে সল্যুট এর গতি নিয়ন্ত্রিত করে। এর ফলে সল্যুট এর বিতরণ কম্পার্টমেন্টালাইজড হয় এবং অসমোসিসের কারণে পানির বিতরণ হয় বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে।

সাধারণতঃ সল্যুট এর ঘনত্ব প্রকাশ করা হয় অসমোল দিয়ে। অসমোল বলতে কোন পদার্থের দ্রবণে উপস্থিত মোলার কনসেনট্রেশান এবং অসমোটিক একটিভিটির সম্পর্ক বুঝায়। কোন পদার্থের অসমোলারিটি বের করতে হলে সেই পদার্থের মোলার কনসেনট্রেশনকে প্রতি মোলে আয়োনাইজড করার পর পার্টিকেল এর সংখ্যা দিয়ে গুন করতে হয়। যেমন গ্লুকোজ দ্রবণে প্রতিমলিকুলে ১ পারটিকলস কাজে লাগায়। আবার Nacl ভাগ হয়ে Na^+ এবং cl হয় ফলে ২ পার্টিকেল প্রতি মলিকুলে ভাগ হয়ে যায়। ফলে কোন দ্রবণে এক মোল গ্লুকোজ থাকলে ১ অসমোল তৈরী করে এবং এক মোল Nacl থাকলে ২ অসমোল তৈরী করে। শরীরে ফ্লুয়িডের স্বাভাবিক অসমোলারিটি হচ্ছে ২৮৫-২৯৫ মিলিঅসমোল/লিটার।

হাইপোন্যাট্রেমিয়াঃ–

সিরামে সোডিয়ামের পরিমাণ স্বাভাবিকের (১৩৫ – ১৪৫ মিলি ইকুভ্যালেন্ট পার লিটার) তুলনায় কম হলে তাকে হাইপোন্যাট্রেমিয়া বলে। শরীরে পানির পরিমাণ বেড়ে বা টোটাল সোডিয়ামের পরিমাণ কমে যে হাইপোন্যাট্রেমিয়া হয় তাকে ট্রু হাইপোন্যাট্রেমিয়া বলে। আবার হাইপারলাইপিডিমিয়া, হাইপারপ্রোটিনিমিয়া এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়ার কারণে প্লাজমার পানি লিপিড বা প্রোটিন দিয়ে রিপ্লেস হওয়ার কারণে বা হাইপারগ্লাইসিমিয়ার কারণে ইন্ট্রাসেলুলার বা একষ্ট্রাসেলুলার স্পেশ পানি নির্গত হয়ে সিরাম ডাইলুট করার কারণে যে হাইপোন্যাট্রেমিয়া হয় তাকে ফলস হাইপোন্যাট্রেমিয়া বলে।

আবার পানিও লবনের প্রাপ্যতার উপরে ভিত্তি করে হাইপোনেট্রিমিয়াকে তিনভাগে বর্ণনা করা যায় –

১। হাইপোনেট্রিমিয়া যেখানে বডিসোডিয়াম কম থাকে এবং পানি ও ECF কম থাকে এর কারণ সমূহ হচ্ছে –

- গ্যাষ্ট্রোইন্টেস্টীনাল লস। যেমন বমি, পাতলা পায়খানা বা ফিসচুলা।
- বেশি মাত্রায় ডায়াফোরেসিস

- সল্ট লুজিং নেফ্রাইটিস
- ডায়ুরেটিকস

এই সমস্ত অবস্থায় শুধুমাত্র পানি খেয়ে রোগীদের ফ্লুয়িড রিপ্লেস করার চেষ্টা করা হয় বলে হাইপোনেট্রিমিয়া খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই ধরণের হাইপোনেট্রিমিয়া আমাদের দেশে বেশী দেখা যায়।

২। হাইপোনেট্রিমিয়া যেখানে বডি সোডিয়াম মোটামুটি স্বাভাবিক থাকে কিন্তু পানি (ECF) বেশি থাকে। একে ডাইলুসনাল হাইপোনেট্রিমিয়াও বলা হয়ে থাকে। এর উল্লেখ্যযোগ্য কারণ গুলো হচ্ছে

- একিউট ওয়াটার ইনটকসিকেশন
- SIADH (কারণ সমূহ অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে)

৩। হাইপোনেট্রিমিয়া যেখানে বডি সোডিয়াম বেশী থাকে এবং পানিও (ECF) বেশি থাকে এর উল্লেখ্যযোগ্য কারণ সমূহ হচ্ছে --

- সিরোসিস অব লিভার
- নেফ্রোটিক সিনড্রোম
- কনজেসটিভ কার্ডিয়াক ফেইলার
- ইনসাফিয়েনসি বিশেষতঃ এ্যাডিশনস ডিজিজ

আবার ক্লিনিক্যাল উপসর্গের উপর ভিত্তিকরে হাইপোনেট্রিমিয়াকে তিন ভাগে বর্ণনা করা যায়। বিভিন্ন রকমের হাইপোনেট্রিমিয়ার উপসর্গ নিম্নে বর্ণনা করা হল --

১। মৃদু বা Mild: এই সমস্ত রোগী খুব অস্থির থাকে, মাথা ব্যথা, বমি ভাব, বমি এবং সঙ্গে দুর্বলতাও থাকে। এদের সিরাম সোডিয়াম এর মান ১২০–১৪০ মিঃ লিঃ ইকুভ্যালেন্ট /লিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

২। মাঝারী বা Moderate: এই সমস্ত রোগীর মানসিক অস্থিরতা বেশী হয়, রোগী খুব উত্তেজিত হতে পারে ও সঙ্গে ডায়োফোরেসিস থাকে। সিরাম সোডিয়ামের মান ১১০–১২০ মিলি ইকুভ্যালেন্ট /লিটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৩। মারাত্মক বা Severe : এই সমস্ত রোগীরা অজ্ঞান অবস্থা বা অসচেতনতা এবং এর সঙ্গে খিচুনি বা কনভালশান নিয়ে প্রকাশ পায়। এদের সিরাম সোডিয়ামের মান ১১০ মিলিইকুভ্যালেন্ট /লিটার এর নীচে থাকে।

banglainternet.com

ল্যাবরেটারী ফাইন্ডিং ঃ-

ক) সিরাম সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড স্বাভাবিকের তুলনায় কম।

খ) প্রস্রাবে সোডিয়াম ৫ মিলিইকুভ্যালেন্ট এর কম বা বেশী।

গ) সিরাম ইউরিয়া বা ক্রিয়েটিনন এর মান বাড়তেও পারে বা স্বাভাবিক থাকবে।

ঘ) সিরাম পটাশিয়ামের মান কারণ এর উপর নির্ভর করে বাড়বে বা কমবে।

ঙ) SIADH এর বেলায় আরজিনিন, ভাসোপ্রেসিন (AVP) স্বাভাবিক বা বেশী হবে।

চিকিৎসা

১। এবসলিউট হাইপোনেট্রিমিয়ার চিকিৎসা

ডাইল্যুশনাল হাইপোনেট্রিমিয়া এক্সক্লুড করার পর এবসলুট হাইপোনেট্রিমিয়া ডায়াগনসিস করা সম্ভব হলে রোগীর উন্নতির জন্য সঙ্গে সঙ্গে সোডিয়াম ক্লোরাইড সলুশান দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। সোডিয়াম ও ক্লোরাইড খুব অল্প পরিমানে পানির সঙ্গে মিশিয়ে রোগীকে দিতে হবে যাতে রোগীর ওভারহাইড্রেশান না হয়, বিশেষতঃ যে সমস্ত রোগীর রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সী আছে। প্রচুর সোডিয়াম রোগীকে দিতে হবে যাতে টোটাল ভল্যুম বডি ওয়াটার এর অসমোলালিটি এফেকটেড হয়। যত বেশী সোডিয়াম ও ক্লোরাইড একটিভ পার্টিকেল একষ্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড স্পেসে যাবে, ততবেশী পানি ইন্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে একষ্ট্রাসেলুলার কম্পার্টমেন্ট মুভ করবে এবং শেষ পর্যন্ত একষ্ট্রাসেলুলার ফ্লুয়িড ভলুম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। কিন্তু যদি পানিবেশী দেওয়া হয় তা হলে পালমোনারী ইডিমা ডেভেলপকরার সম্ভাবণা থাকে। এছাড়াও সিরাম পটাশিয়াম এর মান দেখা খুব জরুরী। যদি হাইপোক্যালেমিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইন্টাভেনাস ফ্লুয়িডের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং মাঝে মধ্যে সিরাম পটাশিয়ামের মান মনিটর করে দেখতে হবে যে এর মান স্বাভাবিক রয়েছে কিনা। এবসলুট হাইপোনেট্রিমিয়ার রোগীকে কতটুকু সোডিয়াম ক্লোরাইড রিপ্লেস করতে হবে তা নীচের টেবিলে উদাহরণসহ বর্ণনা করা হল।

টেবিল -১

৬০ কেজি অজ্ঞান রোগী

হাইড্রেশান স্বাভাবিক - রক্তচাপ ১৩৫/৮০ মিলি মিটার / মার্কারী

Na^+ ১১০, CL^- ৬৮, K^+ ৩.৭, $HCO3^-$ ৩০ মিলিইকুভ্যালেন্ট / লিটার

সোডিয়াম স্পেশ = টোটাল বডি ওয়াটার

= ৬০ ঃ ৬০ কেজি বডি ওয়েট এর

কতটুকু সোডিয়াম দরকার যাতে সোডিয়াম এর মান ১৩৫ মিঃ ইকুভালেনট /লিটার উঠে।

= টোটাল বডি ওয়াটার × (আকাংখিত Na^+ – একুচয়াল Na^+)

= ৬০ঃ ৬০ কেজি বডি ওয়েট এর × (১৩৫-১১০)

= ৩৬×২৫

প্রয়োজন = ৯০০ মিলি ইকুভ্যালেন্ট

০.৯ঃ Nacl, ৯০০/১৫৫ = ৫.৮ লিটার, ০.৯ঃ Nacl

০.৯ = ৯০০০ মিলি লিটার $\frac{৯০০০}{৫৮}$ = ১৫৫

৩ঃ Nacl, ৯০০/৫২০ = ১.৭ লিটার ৩ঃ Nacl

$$Na^+ ২৩ \frac{৩০০০০}{৫৮} = ৫২০$$

$$Cl^- \frac{৩৫}{৫৮}$$

৫ঃ Nacl, ৯০০/৮৬০ = ১.১ লিটার ৫ঃ Nacl

$$Na^+ ২৩ \frac{৫০০০০}{৫৮} = ৮৬]$$

$$Cl^- \frac{৩৫}{৫৮}$$

banglainternet.com

ডাইলুশনাল হাইপোনেট্রিমিয়ার চিকিৎসা

- ডাইলুশনাল হাইপোনেট্রিমিয়ার সবচেয়ে কার্য্যকরি চিকিৎসা হচ্ছে পানি রেষ্ট্রিকশান। একুইট ওয়াটার ইনটক্সিকেশান হলে ৩x Nacl দিয়ে রিপ্লেসমেন্ট থেরাপী করতে হবে। কিন্তু পানি সম্পূর্ণ রেষ্ট্রিক্ট করতে হবে।

- SIADH হলে শুধু ওয়াটার রেষ্ট্রিক্ট করলেই হবে এবং এর সঙ্গে SIADH এর কারণ বের করে চিকিৎসা করতে হবে।

হাইপোনেট্রিমিয়া যেখানে বডি সোডিয়াম বেশী থাকে।

- ডায়ুরেটিক সহযোগে চিকিৎসা করতে হবে যথা ফ্রুসেমাইড।

SIADH এর কারণ সমুহ

ক) ADH অস্বাভাবিক নিঃসরণ টিউমার এর কারণে

১) ফুসফুসের ক্যান্সার

২) ডুওডেনামের ক্যান্সার

৩) প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার

৪) থাইমোমা

৫) হজকিন্স লিমফোমা

৬) ইউরেটার এর ক্যান্সার

খ) SIADH,এক্টোজেনাস ADH নিঃসরণের কারণে

১) রক্তপাত এবং হাইপোভলিমিয়া (এডিসন্স ডিজিজ, হাইপোপিটুইটারিজম)

২) আঘাত

৩) ফুসফুসের রোগ (নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা , ক্যাভিটেশন)

৪) সেন্ট্রাল নার্ভাস সিষ্টেমের রোগ

(মেনিনজাইটিস, এনকেফালাইটিস, হেড ইনজুরি, ব্রেন এবসেস, ব্রেন টিউমার, গুলেন ব্যারি সিনড্রোম)

৫) এক্টোক্রাইন রোগের কারণে SIADH (এডিসন্স ডিজিজ, মিক্সিডিমা, হাইপোপিটুইটারিজম)

৬) অন্যান্য রোগ

(কার্ডিয়াক ফেইলার, সিরোসিস এসাইটিস সহ)

৭) ইডিওপ্যাথিক SIADH

৮) ঔষধের কারণে SIADH

যে সমস্ত ঔষধ টিবিউলার পানির রিএবসরপশান বাড়িয়ে দেয়- ভাসোপ্রেসিন, অক্সিটোসিন

যে সমস্ত ঔষধ ADH নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয় ঃ-

ভিনক্রিষ্টিন

এট্রোমিড এস

নিকোটিন

টেগ্রোটাল

যে সমস্ত ঔষধ ADH কার্য্যকারিতা বাড়িয়ে দেয় ঃ-

ক্লোরপ্রাইপামাইড

ক্লোরথায়াজাইড

হাইড্রোক্লোরথায়াজাইড

সাইক্লোথায়াজাইড

হাইপারন্যাট্রেমিয়া

সংজ্ঞা ঃ- সিরাম সোডিয়াম এর ঘনত্ব (যে ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করা হচ্ছে) স্বাভাবিকের তুলনায় দুই ষ্টাণ্ডার্ড ডেভিয়েশন বেশী হলে তাকে হাইপারন্যাট্রেমিয়া বলে। সাধারণ ভাবে সিরাম সোডিয়ামের ঘনত্ব ১৪৮ মিলিইকুভ্যালেন্ট প্রতি লিটারের বেশী হলে তাকে হাইপারন্যাট্রেমিয়া বলে। এটা সাধারণত শরীর থেকে পানি বেশী তৎসহ বেশী ফ্লুইড কমে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে।

banglainternet.com

ক্লিনিক্যাল সিম্পটোম ঃ

সিরাম সোডিয়ামের মান ১৫০ মিলিইকুভ্যালেন্ট / প্রতি লিটারের উপরে গেলে ক্লিনিক্যাল লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় এবং ১৬০ মিলি ইকুভ্যালেন্ট / প্রতি লিটার এর উপরে গেলে মৃত্যু হতে পারে। এই লক্ষণ গুলো সাধারণত সেলুলার ডিহাইড্রেশান এর কারণে হয়ে থাকে। কারণ পানি সেল থেকে হাইপারটনিক এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুয়িড চলে আসে। স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিবেশী হওয়ার সম্ভাবণা থাকে এই ডিহাইড্রেশান হওয়ার কারণে।

লক্ষণসমূহ ঃ

অত্যাধিক পিপাসা

মাথা ব্যথা, বমি ভাব এবং বমি

খিঁচুনি, অজ্ঞান অবস্থা এবং মৃত্যু

ওজন কমা, চামড়া টিলে হওয়া,

ট্যাকিকার্ডিয়া, কম রক্তচাপ, অলিগুরিয়া

চোখে ঝাপসা দেখা।

কারণ ও জনন

হাইপারন্যাট্রেমিয়ার সবচেয়ে প্রধান উল্লেখ যোগ্য কারণ হোল বেশী সোডিয়াম সহ পানি শরীর থেকে নির্গত হওয়া। এই ভাগের রোগীদের ডিহাড্রেশনের সকল লক্ষণসমূহ যেমন চামড়া টিলা হওয়া, মিউকাস মেমব্রেণ শুস্ক হওয়া, টাকিকার্ডিয়া এবং অর্থোষ্টাটিক হাইপোটেনশন উপস্থিত থাকে। যে সব কারণে পানি সোডিয়াম সহ বেশী নির্গত হয় সে গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ –

ক) আবহাওয়া সম্পৃক্ত পানির কমতি

আবহাওয়া জনিত পানির ঘাটতি সাধারণত দুই ক্ষেত্রে পাওয়া যায় যেমন মরুভূমি বা সমুদ্রে প্রকাশ পেতে পারে। যেহেতু শ্বাসপ্রশ্বাস এবং ঘামের ফলে অনেক পানি নির্গত হয় সেজন্য মরুভূমি বা সমুদ্রে অতিরিক্ত পানি গ্রহণ না করলে হাইপারন্যাট্রেমিয়া হবে।

খ) হাইপোটনিক গ্যাস্ট্রোইন্টেসটিনাল ফ্লুয়িড এর সোডিয়াম এর ঘনত্ব প্লাজমার থেকে কম হয় (৫০–৭০ মিঃ ইকুইভ্যালেন্ট প্রতিলিটার) যদি নির্গত পানির পরিবর্তে প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ করা না হয় এবং সংগে গ্যাস্ট্রোইন্টেষ্টিনাল ফ্লুয়িড বেশী নির্গত হয় তা হলে হাইপারন্যাট্রেমিয়া হতে পারে। যেমন বমি হওয়ার পর পানি গ্রহণ না করলে, বেশী পাতলা পায়খানা হওয়ার পর পানি গ্রহণ না করলে এবং কোন ফিসচুলা ড্রেইনেজ করার পর প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ না করলে।

গ) প্রস্রাব খুব পাতলা এবং বেশী পরিমানে হলে প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ না করলে হাইপারন্যাট্রেমিয়া হতে পারে। এর উদাহরণ হোল

ক) ক্লাসিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস – এন্টি ডায়ুরেটিক হরমোন এর অভাবের কারণে

খ) নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস – রেনাল টিবিউলস এর কার্য্যক্ষমতা রক্ষার কারণে এবং কালেকটিং ডাক্ট যদি এন্টিডায়ুরেটিক হরমোন এর চিকিৎসায় রেসপণ্ড না করে।

গ) অসমোটিক ডায়ুরেটিক –এণ্ডোজেনাস ডায়াবেটিস মেলাইটাস, পোষ্ট অবষ্ট্রাকটিভ

ঘ) আয়াট্রোজেনিক–ডায়ুরেটিক গ্রহণ করার করণে

চিকিৎসা ঃ

চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য হলো হাইপারন্যাট্রেমিয়ার কারণ বের করা, নির্গত পানির পরিবর্তে পানি গ্রহণ এবং ইলেকট্রোলাইট এর কোন অসমতা থাকলে তা কারেক্ট করে এর সমতা বজায় রাখা। কতটুকু পানি রিপ্লেস করতে হবে তা ক্যালকুলেট করা হয় টোটাল বডি ওয়াটার এর অসমোলারিটি স্বাভাবিক করার উপর (টোটাল বডি ওয়াটার TBW + ০.৫ - ০.৬ একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লীন লোকের বডি ওয়েট)

$$\text{কতটুকু পানি দিতে হবে} = TBW\frac{Na^{+} - ১৪০}{১৪০}$$

প্রাথমিক ভাবে ৫% ডেক্সট্রোজ ইন ওয়াটার শুরু করতে হবে, পরবর্তীতে ০.৪৫% ডেক্সট্রোজ সহযোগে বা Na^{+} নির্গমন খুব বেশী হলে ০.৯% Nacl দিতে হবে। K^{+} এবং Po4 এর মান নির্ণয় করে এগুলো যোগ করতে হবে। রোগী সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

banglainternet.com

হাইপারন্যাট্রেমিয়া চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সিরাম সোডিয়াম কে পানি দিয়ে ডাইলুট করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা। পানি খুব তাড়াতাড়ি কোষে প্রবেশ করে মস্তিস্কের কোষ সহ, ফলে যদি পানি তাড়াতাড়ি দেওয়া হয় তা হলে সেরিব্রাল ইডিমা হয়ে, কনভালশান হয়ে রোগী মারা যাবে। ফলে পানি দেওয়ার সময় বিষক্রিয়ায় রোগী যেননা মারা যায় সেদিক খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য শুধু পানি নয় বরং পানির সঙ্গে সোডিয়াম, ক্লোরাইড দিতে হবে। পানির বিষক্রিয়া যেন না হয় সেজন্য ষ্টেরয়েড যেমন ডেক্সামেথাজোন ৮-১০ মিলিগ্রাম আইভিপ্রাথমিক ভাবে, পরবর্তীতে, ৪-৬ মিলিগ্রাম প্রতি ১২ ঘন্টা পর পর এবং যদি কনভালসন হয় তা হলে ডায়াযেপাম দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

যেহেতু হাইপোটানিক ফ্লুয়িড দিয়ে নির্গত পানির রিপ্লেসমেন্ট করা হয় যার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। এর সঙ্গে পানির রিডিষ্ট্রিবিউশন এবং ইনট্রাসেলুলার কমপার্টমেন্ট থেকে এক্সট্রাসেলুলার কমপার্টমেন্ট সোডিয়াম এর প্রবাহের ফলে ইডিমা বা কনজেসটিভ হার্ট ফেইলার হতে পারে। এজন্যেই মাঝে মধ্যে ভাসকুলার ওভারলোড হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

কারণ বের করে চিকিৎসা ঃ

ক) পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এর কারণে হাইপারন্যাট্রেমিয়া - যে সমস্ত পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস ফ্লুয়িড বাণিজ্যিক ভাবে প্রস্তুত করা হয় তাতে ১.৫% গ্লুকোজ থাকে যা স্বাভাবিক ভাবেই হাইপারটনিক। এই হাইপারটোনিক ফ্লুয়িড পেরিটনিয়াল ক্যাভিটিতে গেলে দুটো জিনিষ হতে পারে। প্রথমত ঃ সিরাম থেকে পানি ডায়ালাইসেটে চলে আসবে বা দ্বিতীয়তঃ রক্তাতিশর্করার কারণে হাইপারঅসমোলালিটি হয়ে পানি কোষ থেকে সিরামে আসবে এবং সিরাম সোডিয়াম লঘু করণ বা ডাইলিউটেড হয়ে যাবে। ফলে হাইপারন্যাট্রেমিয়া হবে। এ জন্য পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসেট ব্যবস্থার করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন খুব বেশী হাইপারটনিক গ্লুকোজ ডায়ালাইসেটে ব্যবহার করা না হয়। রোগীকে পানি বেশী করে খেতে দিতে হবে.। অথবা ডায়ালাইসেটে সোডিয়ামের পরিমান কমিয়ে দিতে হবে।

খ) ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস - ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এর থেরাপীর মধ্যে যে পানি নির্গত হচ্ছে তা পরিপূর্ণ রিপ্লেস করা বিশেষতঃ মুখে খেয়ে তা পুরণ করতে পারলে সেটা উত্তম। এর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী

ভাসোপ্রেসিন প্রিপারেশন যেমন প্রিট্রেসিন ট্যাবলেট, এর পরিবর্তে ন্যাজাল স্প্রে (ডায়াপিড) লাইসিন ভাসোপ্রেসিন ব্যবহার করা যেতে পারে প্রতি ৪ ঘন্টা পর পর। এর ফলে ৫০-৭৫ ২ প্রস্রাব নির্গমন কমে আসবে।

থায়াজ্জায়াইড গ্রুপের ডায়ুরেটিকসও ডায়াবেটীস ইনসিপিডাস ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষতঃ যাদের নেফ্রোজেনিক টাইপের ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হয়। এটা প্রস্রাবের ভল্যুম ৫০২ পর্যন্ত কমাতে পারে সঙ্গে রোগীর অত্যধিক পিপাসার ভাবও চলে যায়।

এ ছাড়াও নন হরমোনাল থেরাপী ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এর রোগী দের উপশম করতে সাহায্যে করে। তবে নেফ্রোজেনিক ডায়াবেয়াটিস ইনসিপিডাস এর ক্ষেত্রে এর কোন কার্যকারীতা নেই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট বিশেষতঃ ক্লোরপ্রোপামাইড।

banglainternet.com

পটাশিয়াম এর অস্বাভাবিকতা
(POTASSIUM ABNORMALITIES)

মতিউর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

পটাশিয়াম হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার ক্যাটায়ন যা একস্ট্রা সেলুলার সোডিয়াম এর সমান্তরাল। পটাশিয়াম মাসকুলার কন্ট্রাকশন, নার্ভ ইমপালস কনডাকশান, এনজাইম এবং মেমব্রেন এর স্বাভাবিক কাজ কর্মের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর উত্তেজনা, গতি এবং কনডাকশন একস্ট্রাসেলুলার পটাশিয়াম এর ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। পটাশিয়ামের ঘনত্ব খুব বেশী বা কম উভয়েই হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীর উত্তেজনা এবং কণ্ডাকশন কমিয়ে দেয়। স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী পটাশিয়ামের ঘনত্ব হলে কনডাকশান খুব কমে যায় এবং কার্ডিয়াক এরেষ্ট হয় ডায়াসটোলে। আবার পটাশিয়াম খুব কম গেলে সিসটোলেকার্ডিয়াক এরেষ্ট হয়। নীচের টেবিলে সোডিয়াম পটাশিয়াম এর স্বাভাবিক পরিবেশন এবং নির্গমন দেখানো হল।

স্বাভাবিক সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ডিষ্ট্রিবিউশন
(মিলিমোল / লিটার)

	প্লাজমা	ইন্টারষ্টিশিয়াল ফ্লিয়িড	ইন্ট্রাসেলুলার ফ্লুয়িড
সোডিয়াম (Na^+)	১৪২	১৪৫	১০ - ১৫
পটাশিয়াম (K^+)	৪	৪	১৬০

banglainternet.com

পটাশিয়ামের নির্গমন ঃ

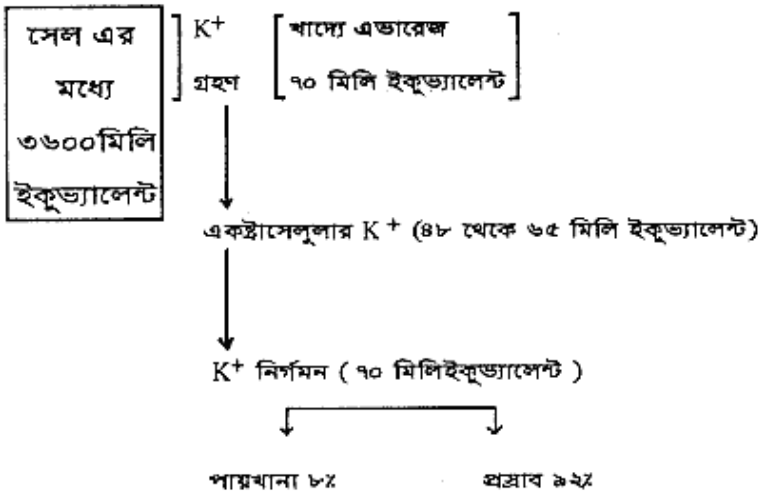

পটাশিয়াম বিতরণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

পটাশিয়াম বিতরণ প্রধানতঃ নির্ভর করে একটিভ ATPase নির্ভর সোডিয়াম পাম্পের উপর। এই পাম্পের কারনে সোডিয়াম ইন্ট্রাসেলুলার এনভায়রনমেন্ট থেকে একস্ট্রাসেলুলার পরিবেশে চলে আসে। এর ফলে পাটাশিয়াম বিপরীত ভাবে প্যাসিভলি চালিত হয় ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রাডিয়েন্ট এর কারনে। এছাড়াও এসিড বেস ব্যালান্স এর প্রভাব আছে পটাশিয়াম এর বিতরনের উপর। হাইড্রোজেন আয়ন শিফটও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এসিডোসিস হলে পটাশিয়াম সেল থেকে বের হয়ে যায় এবং এলকালোসিস হলে পটাশিয়াম সেল এর মধ্যে ঢোকে। বাইকার্বোনেট যোগ করলে পটাশিয়াম শিফট হোয়ে সেলে ঢোকে। হাইপার ভেন্টিলেশন এর কারনে এলাকালোসিস হলে পটাশিয়াম সেল এ ঢোকে যেমন ইনসুলিন দিলে হয়। ইনসুলিন তার কাজের জন্য পটাশিয়ামকে কোফ্যাকটর হিসেবে ব্যবহার করে যাতে গ্লুকোজ সেল মেমব্রেন ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গ্লুকোজ ৬ ফসফেট তৈরী করতে পারে। পটাশিয়াম এর মুভমেনট এর পর গ্লুকোজ সেল এর মধ্যে ঢোকে। সেজন্য যখনই রক্তাতিশর্করা কমানোর জন্য ইনসুলিন দেওয়া হয় তখন হাইপোক্যালেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্রোথ হরমোন, ক্যাটাকোল এমাইনস, এপ্রাজেন সবারই একই প্রভাব, সবই পটাশিয়াম সেল এর মধ্যে ঢুকায়।

পটাশিয়াম নির্গমন ঃ-

পটাশিয়াম এর নির্গমন প্রধানতঃ প্রস্রাব (৯২%) এবং পায়খানা (৮%) দিয়ে হয়ে থাকে। গ্লোমেরুলাস দিয়ে পটাশিয়াম ফিল্টার্ড হয়ে যায়। এর পর প্রক্সিজম্যাল টিবিউলসে সবটুকুই পুনঃশোষিত হয়। এর পর ডিষ্টাল টিবিউলস দিয়ে পটাশিয়াম নিঃসরণ হয় সোডিয়াম পটাশিয়াম এক্সচেঞ্জ পদ্ধতির মাধ্যমে। প্রস্রাবের সব পটাশিয়াম নির্গমন ডিষ্টাল টিবিউলসের কার্য্যকারীতার উপর নির্ভরশীল। ডিষ্টাল টিবিউলসের এই কাজ এলডোষ্টেরণ নির্ভর ও অনির্ভর উভয় পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এলডোষ্টেরণ নিঃসরণ তিন ভাবে হতে পারে। রেনিন রিলিজ, হাইপোফাইসিয়াল ষ্টিমুলেশান, ACTH ব্যবহার করে এবং পটাশিয়াম নিজে। এলডোষ্টেরন নিঃসরনের ফলে ডিষ্টাল টিবিউলসে সোডিয়াম পুনঃশোষিত হয় এবং পটাশিয়াম নির্গত হয়। সিরাম পটাশিয়াম বেশী হলেও এলডোষ্টেরণ নিঃসরন বেশী হবে।

হাইপার ক্যালেমিয়া ঃ

সিরাম পটাশিয়াম এর মান ৫.৫ মিলি ইকুভ্যালেন্ট / প্রতি লিটার এর বেশী হলেই তাকে হাইপার ক্যালেমিয়া বলে। এর প্রধান কারণ কিডনীর কিছু রোগ বিশেষতঃ একুট কিডনী ফেইলিওর। স্বাভাবিক ভাবে কিডনী কাজ করলে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশী পটাশিয়াম কিডনী নির্গত করতে পারে। কিন্তু কিডনী রোগের কারণে অলিগুরিয়া হলে, রেনাল ফেইলার হলে পটাশিয়াম নির্গমন বাধাগ্রস্থ হয় এবং হাইপার ক্যালেমিয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেসএর কারণে বা ক্রাশ ইনজুরী ইত্যাদি এবং মারাত্মক হেমোলাইটিক রিএকশান হলেও ইন্ট্রাসেলুলার পটাশিয়াম বের হয়ে হাইপার ক্যালেমিয়া করতে পারে।

হাইপার ক্যালেমিয়ার কারণ সমূহ ঃ

ক) একুইট এবং ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর

খ) এসিডোসিস

গ) এড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সী— এডিসন্স ডিজিজ

সিলেকটিভ হাইপো এল্ডোষ্টেরিনিজম

ঘ) হাইপার ক্যালেমিক পিরিওডিক প্যারালাইসিস

ঙ) আয়াট্রোজনিক পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ুরেটিকস (ট্রাইয়ামেট্রিন এবং স্পাইরোনোল্যাকটোন)

একজোজেনাস পটাশিয়াম।

ম্যাসিভ ট্রান্সফিউশান (পুরানো রক্তের কারনে)

রিব্রকশন

মারাত্মক পোড়া, আঘাত,আপার মটর নিউরন লেসিওন।

চ) সিউডোহাইপার ক্যালেমিয়া

ছ) মেটাবলিক এসিডোসিস

জ) আর্টিফ্যাক্ট ঃ ক্লট থেকে সিরাম আলাদা করতে দেরী হলে লোহিত কনিকা থেকে পটাশিয়াম বেশী নির্গত হয়।

প্লাটিলেট থেকে K^+ নির্গত হলে যেমন থ্রম্বোসাইটোসিস হয়ে

ঃ ল্যাবরেটরী ফাইণ্ডিং ঃ

ক) সিরাম পটাশিয়াম এর মান বেশী হবে।

খ) কিডনী ফাংশন খারাপের লক্ষন যেমন ইউরিয়া, বান,

ক্রিয়েটিনিন, ফসফেট এবং ইউরেট এর মান বাড়া

এবং HCO_3 মান কমা।

ঃ চিকিৎসা ঃ

ক) প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে,পটাশিয়াম এর মান যে বেড়েছে তা genuine.

খ) এর পর ক্যাটায়ন একসচেঞ্জ রেজিন মুখে বা এনেমার সাহায্যে দিতে হবে। Kayexalate (৪০ - ৮০ গ্রাম / প্রতিদিন) ভাগ করেদেওয়া যায়।

গ) জরুরী ক্ষেত্রে ইনসুলিন এবং ২৫ %

banglainternet.com

- পটাশিয়াম দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে রোগীর কিডনী ফাংশন ভাল থাকে কারণ বেশীর ভাগ পটাশিয়াম কিডনী দিয়ে নির্গত হয়।
- KCl 1 - 3 মিলি মোল / কেজি / প্রত্যহ এই ডোজে ইনজেকট করে গ্লুকোজ বা স্যালাইন সহযোগে দিলে হাইপারক্যালেমিয়া হবেনা। খুব জরুরী না হলে এবং পটাশিয়াম এর মান খুব কম না হলে বা সংগে কার্ডিয়াক এবং রেসপিরেটরী মাসল এর কার্যকরীতা একদম কমে না গেলে ১০ - ২০ মিলি ইকুভ্যালেট প্রতি ঘন্টায় দিতে হবে।
- টিবিউলার এসিডোসিস এর কারনে হাইপোক্যালেমিয়া হলে K^+ এবং HCO_3^- উভয়েরই রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে।

এসিড বেস ব্যালান্স
(ACID BASE BALANCE)

মতিউর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

মেডিসিনে এসিড বেস ব্যালান্সকে সাধারণত কঠিণ বলে ধরা হয়। এসিড বেস সম্পর্কে বর্তমানে অনেক পরিস্কার ধারণা দেয়া সম্ভব হয়েছে। মানুষের শরীরে সাধারণত ২টি অরগ্যান ফুসফুস এবং কিডনী এসিড বেস নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফুসফুস নিয়ন্ত্রণ করে PCo_2 এবং কিডনী নিয়ন্ত্রণ করে H^+ ও HCo_3 / মানুষের রোগের ক্ষেত্রে এসিড বেস ষ্ট্যাডি তে H^+ এর অঙ্ক যেহেতু বড় সে জন্য pH. ব্যবহার করা। স্বাভাবিক মানুষের pH রক্তের pH = 7.4 অথচ এটার $H^+ = 3.9 \times 10^{-8}$ eq/L। এই বড় অঙ্কের কারণেই pH নেহাত সুবিধার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেহেতু $pH = -\log(H^+)$ সেইহেতু কোন অসুবিধা নাই। এসিড বেস ইমবালান্স দেখতে গেলে সাধারণত এই তিনটি পরীক্ষার প্রয়োজন, রক্তের pH, PCo_2 & HCo_3 (TCo_2) level। ক্লিনিক্যাল ব্যাপারে এসিড বেস ব্যালান্স কে ২ ভাগে ভাগ করা হয় সিম্পল এসিড বেস অথবা মিক্সড এসিড বেস ইমব্যালান্স।

আবার এই সিম্পল এসিড বেস ইমব্যালান্সকে কারন হিসাবে নিম্নলিখিত ভাবে করা হয়।

১। মেটাবলিক এসিডোসিস
২। মেটাবলিক এলকালোসিস
৩। রেসপিরেটারি এসিডোসিস
৪। রেসপিরেটরি এলকালোসিস

(স্বাভাবিক level pH = 7.4, PCo_2 40 mmHg, HCo_3 25 meq/L

banglainternet.com

সিম্পল এসিড বেস ইমব্যালান্স ও মেটাবলিক এসিডোসিস এর প্যাথোফিজিওলজী

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ সাধারণত প্রতিদিন ১ মিলিইকুভ্যালেন্ট H^+ শরীরে মেটাবলিজম এর জন্য তৈরী করে। শরীরের বাফারস (Buffers) গুলি দ্রুত কাজ করে যাতে করে শরীরে pH এর খুব একটা পরিবর্তন না হয়। পরিশেষে এই H^+ কিডনী কর্তৃক বাহিরে নির্গত হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে শরীরে যদি বেশি H^+ কোন কারণে তৈরী হয় অথবা Buffers system বা কিডনী কাজ না করে তাহলে H^+ শরীরে জমা হবে, HCo_3 কমবে যাকে মেটাবলিক এসিডোসিস বলা হয়। সুবিধার জন্যে মেটাবলিক এসিডোসিসকে ২ ভাগে ভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ ১। স্বাভাবিক এনায়ন গ্যাপ (Normal anion gap) ও ২। বর্দ্ধিত এনায়ন গ্যাপ (increased aniongap) মেটাবলিক এসিডোসিস। anion gap (AG) এর অর্থ হোল সাধারণত রক্তে Na, Chloride এবং HCo_3 মাপা হয় এবং Normal serum Na^+ =137 ও Chloride 100 এবং HCo_3 25. সুতরাং Normal AG = Na^+ (137 - Chloride 100 + HCo_3 25) = 12 ±2 meq/ L

নিম্নে টেবিলে মেটাবলিক এসিডোসিস এর বিভিন্ন কারণগুলি AG এর উপর ভিত্তি করে দেখানো হয়েছে।

টেবিল = মেটাবলিক এসিডোসিস এর কারণ

এনায়ন গ্যাপ বড়	এনায়ন গ্যাপ স্বাভাবিক
কিডনী ফেয়লিওর	কিডনী টিবিউলার এসিডোসিস
কিটো এসিডোসিস	Type I
ক) বহুমুত্র রোগ	Type II
খ) Starvation	
গ) alcohol	ডাইরিয়া
ল্যাকটিক এসিড এসিডোসিস	Acetazolamide
টক্সিন	Ureteral diversion
ক) Salicylate	Hypoaldosterinism
খ) Methanol	
গ) Ethyline Glycol	

সুতরাং মেটাবলিক এসিডোসিস হোতে পারে উপরোক্ত যে কোন কারণে এবং হোলেই শরীরের HCo_3 কমার ফলে $\frac{PCo_3}{HCo_3}$ রেশিও বেড়ে যায়। অর্থাৎ H^+ বেড়ে রেসপিরেটরি সেন্টারকে ষ্টিমুলেট করে PCo_2 কে কমিয়ে আনে, এটাকেই বলা হয় রেসপিরেটরি কমপেনছেসন ফর মেটাবলিক এসিডোসিস। এই পরিবর্তন পরিমান মত হয় যেমন HCo_3 যদি ১০ হয় তা হলে pH এর Last দুটো ডিজিট হবে ১০+১৫ = ৭.২৫ অর্থাৎ HCo_3 এর সঙ্গে ১৫ যোগ করলে যা হবে সেটা হোল expected pH. এই পরিবর্তন না হলে বুঝতে হবে রেসপিরেটরি Compensation হয়নি অর্থাৎ রোগীর Mixed acidbase imbalance আছে।

এসিডোসিস এর effect ঃ

মেটাবলিক এসিডোসিসের মারাত্মক effect হল শরীরের হেমোডাইনামিক এর পরিবর্তন যেমন হার্ট এর Contraction এর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া। এছাড়া এপিনেফ্রিন নির্গত হওয়া, লিউকোসাইটোসিস, K^+ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

নরম্যাল এনায়ন গ্যাপ এসিডোসিস
(Normal anion gap acidosis)

ডাইরিয়া, কারবোনিক এসিড ইনহিবিটর, রেনাল টিবিউলার এসিডোসিস এবং ইউরিনারী ডাইভারশন অপারেশন রোগীদের এই রকম এসিডোসিস হয়ে থাকে। এতে শরীরে HCO_3 কমে এবং Chloride বাড়ে এবং এ জন্যেই anion gap স্বাভাবিক থাকে।

এলিভেটেড এনায়ন গ্যাপ এসিডোসিস
(Elevated anion gap acidosis)

রেনাল ফেইলিওর, ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস, এসপিরিন ওভারডোজ, মেথানল এবং ইথিলিন গ্লাইকল ইত্যাদি এই রকম এসিডোসিস করে থাকে। এছাড়া ল্যাকটিক এসিড এসিডোসিস এও এ রকম এসিডোসিস হয়।

banglainternet.com

ল্যাকটিক এসিড এসিডোসিস
(Lactic Acid Acidosis)

১ মিলি মোল গ্লুকোজ এনোরোবিক reaction এ ২ মিলি মোলপাইরুভিক এসিড এবং ২ মিলি মোল ATP হয়। এর পর O_2 Requiring reaction এ২ মিলি মোল পাইরুভিক এসিড CO_2 হয় এবং ৩৬ মিলি মোল ATP হয়। যদি O_2 না থাকে তা হলে Pyruvate জমা হয় এবং ল্যাকটিক এসিড বেশি করে রক্তে জমে এসিডোসিস করে। এটা দুপ্রকার Type A Lactic acid acidosis যার প্রধান কারণ গুলো হলো সক (shock), হার্ট ফেয়লিওর, ভলিউম লস, এবং হাইপোক্সিমিয়া তা যে কারণেই হোক।

Type B Lactic acid acidosis সাধারণত ড্রাগস এবং টক্সিন ইত্যাদির কারণে হয়। এখানে টিসু হাইপোক্সিমিয়া আপাত দৃষ্টিতে থাকে না।

চিকিৎসা

মেটাবেলিক এসিডোসিস এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখতে হবে কি কারণে এসিডোসিস হয়েছে এবং সময় হলে তার প্রাইমারী চিকিৎসার জন্য নজর দিতে হবে। এরপর প্রশ্ন আসে বাইকারবোনেট দেবার। সোডিয়াম বাইকারবোনেট সাধারণত ব্যবহার করা হয়। কতটুকু ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে এসিডোসিস এর সিভিয়ারিটির উপর। ধরুন একটি রোগীর HCo_3 অর্থাৎ TCO_2 ১০ এবং আপনি এটা বাড়িয়ে ২০ করাতে চান তা হলে ২০–১০ = 10 × 50% BW যা হোল বাইকারবোনেটের ডিসট্রিবিউশন স্পেস একজন ৬০ কেজি মানুষের। তা হলে ১০×৩০ =৩০০ meq/L $NaHCO_3$ লাগবে। সাধারণত এই পরিমানের অর্দ্ধেকটা ২–৪ঘন্টায় দেয়া হয় এবং বাকীটা নির্ভর করে রোগীর অবস্থা বুঝে এবং রোগীর ব্লাড pH ও TCO_2 কতটা পরিবর্তন হোল তার উপর। তবে Lactic acid acidosis অনেক পরিমান $NaHCO_3$ প্রয়োজন হয়ে থাকে।

মেটাবলিক এলকালোসিস
(Matabolic alkalosis)

মেটাবলিক এলকালোসিস এর প্রাইমারী পরিবর্তন হোল শরীরে HCO_3 বেড়ে যাওয়া। এতে $\frac{PCo_2}{HCo_3}$ রেশিও কমে যায় অর্থাৎ H^+ কমে যায় বা pH বেড়ে যায়। HCO_3 বেশী হওয়া এবং সাথে সাথে কিডনী HCO_3 শরীরে এবজরপশন এর মাধ্যমে হাইপার বাইকারবোনেটিমিয়া মেইনটেয়ন হয়।

রেসপিরেটারি কমপেনছেশন : HCO_3 বেশি হওয়াতে Respiratory Centre depressed হয় ফলে PCO_2 বাড়ে অর্থাৎ $\frac{PCO_2}{HCO_3}$ ratio মোটামুটি, কিন্তু একেবারে স্বাভাবিক স্তরে ফিরে যায় না। সাধারণত ১০ meq/L HCO_3 বাড়ার জন্য ৬ মিলি মিটার মারকারী বাড়ে, এর বেশী বা কম হোলে বুঝতে হবে Mixed acid base imbalance আছে। ক্লিনিক্যাল পারপাছের জন্য মেটাবলিক এলকালোসিস কে ২ ভাগে ভাগ করা হয়

টেবিল – মেটাবলিক এলকালোসিস

স্যালাইন রেসপনসিভ	স্যালাইন আনরেসপনসিভ
কন্ট্রাকশন এলকালোসিস	
ক) ডাইয়ুরেটিক থেরাপি	ক) Serum K^+ অতিরিক্ত কম।
খ) অতিরিক্ত বমন	খ) হাইপার অ্যালডোসটেরনিজম
গ) অতিরিক্ত ঘাম	গ) বার্টারস সিনড্রোম।
ঘ) বাইরের থেকে $NaHCO_3$ দেয়া	

তা হলে দেখা যাচ্ছে মেটাবলিক এলকালোসিস এ রক্তে HCO_3 বাড়বে প্রথম এবং H^+ পরে অর্থাৎ pH বাড়বে এবং PCO_2 বাড়বে।

চিকিৎসা ঃ Contraction allkalsis এ N. Saline দিয়ে চিকিৎসা করা হয় এবং Saline unresponsive alkalosis চিকিৎসা নির্ভর করে কারণের উপর। যেমন Hyperaldosterinism থাকলে Spironolacton এবং K^+ Supplement যদি Serum K^+ কম থাকে।

রেসপিরেটরি এসিড বেস ইমব্যালেন্স

রক্তে PCO_2 Control হয় Respiration দ্বারা এবং Repiration Control হয় C N S দ্বারা সুতরাং CNS এবং Respiratory এর রোগে PCO_2 বাড়ে যাকে respiratiory acidosis বলা হয়। অথবা PCO_3 কমে যাকে respiratory alkalosis বলা হয় এবং এখানে renal Compensation কাজ করে। অবশ্য মনে রাখতে হবে রক্তে PCO_2 production,Transport এবং excretion এর উপর এর রক্তের Level নির্ভর করে।

banglainternet.com

রেসপিরেটরি এসিডোসিস :

কারণ ২ ভাগে ভাগ করা হয়।

১। CNS রোগ বা drug কর্তৃক যখন CNS deprssed হয়

২। Respiraotry disease যেমন ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা রোগ ও নিউমোনিয়া ইত্যাদি।

চিকিৎসা : প্রাইমারী রোগের চিকিৎসা করা হলে Respiratory acidosis কন্ট্রোল হয়।

রেসপিরেটরি এলকালোসিস

কারণ ২ভাগে ভাগ করা হয়।

১। CNS এবং ২। Respiratory system রেসপিরেটরি এলকালোসিস এর প্রধান কারণ হোল হিষ্টেরিক্যাল হাইপারভেনটিলেশন।

মিক্সড এসিড বেস ডিষ্টার্বেন্স
(MIXED ACID BASE DISTURBANCE)

মিক্সড এসিড বেস ডিষ্টার্বেন্স তাকেই বলা হয় যখন দুই বা ততোধিক সিম্পল এসিড বেস এর এ্যবনরমালিটি একই সঙ্গে একটি রোগীর শরীরে পাওয়া যায়।

এখানে "OSIS"এবং "EMIA" এর সম্পর্কে পরিস্কার ধারনা থাকতে হবে। অর্থাৎ "OSIS" বলতে সংযুক্ত মেটাবলিক বা রেসপিরেটরি প্রসেস বুঝতে হবে এবং "EMIA" বললে ব্লাড pH এর উপর এই উল্লেখিত প্রসেসের ১টি বা ২টি নেট ইফেক্ট বুঝায়।একটি রোগের সেজন্য অনেক প্রসেস থাকতে পারে যাকে এসিডোসিস / এলকালিসিস বলা হবে কিন্তু প্রাপ্ত ফল হবে এসিসডামিয়া / এলকালিমিয়া বা উভয়ই।মিক্সড এসিডবেস ডিষ্টার্বেন্স সাধারনতঃ ক্লিনিক্যাল সেটিং এবং ফিজিক্যাল পরীক্ষার উপর নির্ভর করে নির্ণয় করা সম্ভব। তবে ল্যাবরেটরী পরীক্ষা শুধু মাত্র কিনিক্যাল ইমপ্রেশানকেই দৃঢ় করে। নীচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিক্সড এসিডবেস ডিষ্টার্বেন্স এর কারণ বর্ণিত হোল।

১. মেটাবোলিক এসিডোসিস এবং মেটাবোলিক এলকালোসিস

উদাহরণ ঃ রেনাল ফেইলার বমি।

২. রেসপিরেটরি এলকালোসিস এবং মেটাবোলিক এলকালোসিস।

উদাহরণ ঃ হেপাটিক ফেইলার এবং ডায়ুরেটিকস এর কারণ।

৩. রেসপিরেটরি এসিডোসিস এবং মেটাবলিক এসিডোসিস।

উদাহরণ ঃ কার্ডিওপালমুনারী এ্যারেষ্ট,মারাত্মক পালমোনারি ইডিমা। ঔষধের কারণে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিসটেম ডিপ্রেশান এবং কম পটাশিয়াম।

৪. রেসপিরেটরি এলকালোসিস এবং মেটাবোলিক এসিডোসিস

উদাহরণ ঃ সেপটিক শক।
রেনাল ফেইলার সেপসিস সহ।
স্যালিসাইলেট ওভারডোজ।

চিকিৎসা ঃ

মিক্সড এসিডবেস ব্যালান্স এর চিকিৎসার সময় দুটো জিনিষ খেয়াল করতে হবে। প্রথমতঃ চিকিৎসার উদ্দেশ্য হবে ব্লাড pH কে স্বাভাবিক মানের কাছে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং রক্তের pH এর মান বলে দেবে কখন চিকিৎসা শুরু করতে হবে বা চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে। উদাহরণ স্বরুপ বাই-কার্বোনেট দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে ঐ সব রোগীর যাদের সিরাম HCO_3^- এর মান ১১ মিলি ইকুভ্যালেন্ট/লিটার এবং pH 7·20 কিন্তু যে সমস্ত রোগীর সিরাম HCO_3^- মান ১১ মিলি ইকুভ্যালেন্ট/লিটার কিন্তু pH 7·40 তাদের এটা প্রয়োজন নাই। কারণ তাতে প্রাইমারী রেসপিরেটরী এলকালোসিস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ কম্বাইনড ডিসঅর্ডার চিকিৎসা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে একটি ডিষ্টার্বেন্সর এর চিকিৎসার করার প্রতিক্রিয়া যেন দ্বিতীয় ডিষ্টার্বেন্সের মেনিফেসটেশানকে বাড়িয়ে না দেয়। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, যে রোগীর ক্রনিক রেসপিরেটরি এসিডোসিস এবং সংযুক্ত মেটাবলিক এলকালোসিস আছে। তাদের ভেন্টিলেশান ভাল করতে যেয়ে PCO_2 কমানোর চেষ্টা করলে আবার সংগে এলকালোসিস এর চিকিৎসা করতে যেয়ে HCO_3^- কমের ব্যবস্থা করলে রোগীর মারাত্মক এলকালোসিস হবে। সুতরাং মিক্সড ডিসটারবেন্স চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হতে হবে রক্তের pH এর চিকিৎসা করা।

banglainternet.com

২য় অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

জন্ম বা বংশগত কিডনী রোগ সমুহ
(CONGENITAL HERIDITARY DISEASES OF KIDNEY)

মোঃ হাবিবুর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

প্রায় ১০% লোক ইউরিনারী সিষ্টেম এর ম্যালফরমেশন সহ জন্মগ্রহন করে। রেণাল ডিসপ্লেসিয়া এবং হাইপোপ্লাসিয়া ক্রনিক রেণাল ফেইলার রোগের জন্য শতকরা ২০ ভাগ দায়ী। পলিসিসটিক কিডনী রোগ সমুহ (যা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে প্রকাশ পায়) শতকরা ৬ থেকে ১২ ভাগ ক্রনিক রেণাল ফেইলার এর জন্য দায়ী। বেশীর ভাগ কনজেনিটাল রেনাল ডিজিজ গর্ভাবস্থায় ডেভেলপমেন্টাল ডিফেক্ট হিসাবে তৈরী হয় এবং এর বংশগত সম্পৃক্ততা নেই। তবে কিছু ডেভেলপমেন্টাল ডিফেক্ট যেমন পলিসিসটিক কিডনী ডিজিজ, মেডুলারী সিসটিক ডিজিজ পরিস্কার ভাবে বংশগতভাবে আসে। বেশীর ভাগ কনজেনিটাল রোগে ডেভেলপমেন্ট এনোমালির মধ্যে কিডনীর গঠন বা ষ্ট্রাকচার এর এলোম্যালিস বেশী হয়। তবে এর সঙ্গে এনজাইমেটিক বা মেটাবলিক ডিফেকটযেমন সিসটিনইউরিয়া বা রেণাল টিবিউলার ট্রান্সপোর্ট ডিফেক্ট ও হতে পারে। রেণাল ম্যালফারমেশনকে সাধারণতঃ তিনটিভাগে বর্ণনা করা যেতে পারে যেমন (১) কিডনী টিস্যুর পরিমানগত অস্বাভাবিকতা উদাহরণ কিডনী না থাকা (এজেনেসিস) বা ছোট কিডনী হওয়া (হাইপোপ্লাসিয়া)। (২) কিডনীর পজিশন, ফর্ম বা অরিয়েন্টেশন এর অস্বাভাবিকতা, এর উদাহারণ হল হর্স সু কিডনী। (৩) ডিফারেন্সিয়েশন এর অস্বাভাবিকতা এর উদাহরণ হোল বিভিন্ন ধরণের রেণাল সিষ্ট। এ সব রোগ গুলোর মধ্যে যেগুলো প্রধাণ মারাত্মক এবং খুব উল্লেখ যোগ্য সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব।

জন্ম গত নেফ্রাইটিস ঃ

জন্ম গত নেফ্রাইটিসসের মধ্যে 'এলপরস সিনড্রোম' উল্লেখযোগ্য। বাপ

মায়ের এই রোগ থাকলে শতকরা ৫০ ভাগ ছেলে অথবা মেয়ের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবণা রয়েছে।

এই রোগে আক্রান্ত রোগীর ছোট থেকেই প্রস্রাবের সংগে লোহিত কণিকা এবং প্রোটিন শরীর থেকে বের হয়ে যায়। অনেক রোগীদের শরীর থেকে অতিরিক্ত প্রোটিন বের হয়ে যায় বলে তাদের শরীর ফুলে যায়। কারও উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়ও শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাদের দুইটি কিডনীই অকেজো হয়ে যায়। এইসব রোগীদের অনেকেই কানে কম শুনে। কারও কারও দৃষ্টি শক্তি কম থাকে।

এইরোগ সঠিক ভাবে নিরুপণ করার জন্য, রোগীর কিডনীর টিস্যু ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ দ্বারা পরীক্ষা করা দরকার। এই পরীক্ষায় দেখা যায়, যে গ্লোমোরুলাসের বেজমেন্ট মেমব্রেন খুবই পাতলা হয়ে গেছে এবং জায়গায় জায়গায় ভেংগে গেছে ও দুই ভাগ হয়ে গেছে।

এই রোগের তেমন কোন চিকিৎসা নাই। তবে উচ্চ চাপ দেখা দিলে অথবা কিডনী অকেজো হয়ে গেলে তার যথাযথ চিকিৎসা করাতে হবে। যাবা মায়ের এই রোগ থাকলে তাদের বুঝিয়ে বলা উচিৎ সে তাদের শতকরা ৫০ভাগ ছেলেমেয়েদের এই রোগ হওয়ার সম্ভবানা রয়েছে। তাই তারা ছেলে মেয়ে জন্ম দিবে কি না সে ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কিডনীর টিউবিউলের রোগ ঃ

কিডনীর টিউবিউল আমাদের শরীরে অনেক কাজ করে। এগুলোর মধ্যে আমাদের শরীরের পানি ও বিভিন্ন লবণ জাতীয় পদার্থের নিয়ন্ত্রন ও শরীরে অম্ল ও ক্ষারের পরিমান নিয়ন্ত্রন কিডনীর টিউবিউলের দুটি প্রধান কাজ। তাই কিডনীর টিউবিউলের রোগ শরীরে পানি, লবন ও অম্ল ক্ষারের অসামাঞ্জস্য দেখাদেয়। কিডনীর টিউবিউলের অনেক জন্মগত রোগ রয়েছে। তবে আমরা এখানে মাত্র দুটি রোগ নিয়ে আলোচনা করব।

ডিসটাল রেনাল টিউবুলার এসিডোসিস ঃ

ডিসটাল রেনাল টিউবিউলে রক্ত থেকে অম্ল টিউবিউলের মধ্যে ঢোকে ও প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। কোন কারণে ডিসটাল টিউবিউলের রোগ হলে শরীর থেকে অম্ল বের হতে পারে না। ফলে রক্তের মধ্যে অম্ল জাতীয় পদার্থ জমে যায় ও বাইকার্বনেট কমে যায়, এই সব রোগীর রক্তে যদিও অম্ল খুব বেশী তবুও প্রস্রাব পরীক্ষা করলে অম্লের পরিবর্তে ক্ষারের পরিমান বেশী পাওয়া যায়।

banglainternet.com

এই রোগ হলে দেখা যায় যে, ছেলে মেয়েরা ঠিক মত বাড়ছে না এবং কারও কারও প্রস্রাবের সঙ্গে পাথরের কনা বের হচ্ছে। অনেকের শরীরের রীকেটের লক্ষণ দেখাযায়। পেটের এক্স রে (কে, ইউ, বি) করলে দেখা যায় যে দুটি কিডনীর মধ্যেই অনেক গুলো পাথর জমে আছে।এদের প্রস্রাব পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে প্রস্রাবের মধ্যে খুব বেশী ক্ষার জাতীয় পদার্থ ও ক্যালশিয়াম শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। এই রোগে আক্রান্ত রোগীকে অধিক পরিমাণে এমোনিয়াম ক্লোরাইড খাওয়ালে ও দেখা যায় তাদের প্রস্রাবে ক্ষারের পরিমাণ বেশী।রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, রক্ত বাই কার্বনেট ও পটাশিয়াম খুব কম কিন্তু ক্লোরাইড ও ক্যালশিয়াম খুব বেশী।

এই রোগীদের প্রচুর পরিমাণে ক্ষার জাতীয় ঔষধ খাওয়াতে হয়। তাতে তাদের রোগ অনেকটা প্রশমিত হয় ও আর নতুন করে কিডনী পাথর জমা বন্ধ হয়।

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস ঃ-

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এক ধরনের বহুমূত্র রোগ। এই রোগে প্রস্রাবের পরিমাণ অনেক বেশী কিন্তু প্রস্রাবের সঙ্গে কোন "সুগার" বের হয় না। এ রোগে প্রস্রাব খুবই পাতলা থাকে।

কিডনী টিউবিউলের একটি কাজ হচ্ছেপ্রস্রাবকে ঘনীভূত করা। এই ঘনীভূত করণ প্রক্রিয়া কিডনীর টিউবিউলের সমস্ত অংশেই চলে তবে কিডনীর ডিসটাল টিবিউলে, এই ঘনীভূত করণ নির্ভর করে ভেসোপ্রেসিনের উপর যা 'পিটিউটারী গ্রন্থি থেকে নির্গত হয় ডিসটাল টিউবিললে এসে টিউবিউল থেকে পানিকে রক্তের মধ্যে ঢুকতে সাহায্য করে। কোন কারণে যদি 'পিটিউটারী' থেকে ভেসোপ্রেসিন ' নির্গত না হয় অথবা ভেসোপ্রেসিন যদি কিডনীর ডিষ্টাল টিউবিউলের উপর কার্যকর ভাবে কাজ করতে না পারে, তবে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস রোগ দেখ দেয়।

কিডনীর কারনে যে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, তা ছেলেদের বেশী হয়। যাদের এই রোগ হয় তাদের জন্মের পরপরই অনেক বেশী পরিমাণে প্রস্রাব হয়ও অধিক পনির পিপাসা পায়। প্রস্রাবের পরিমান দিনে ১ থেকে ১০ সের হতে পারে। প্রস্রাবের পরিমানের চেয়ে পানি কম খাওয়ালে অল্প দিনেই রোগীর শরীরে পানির পরিমান কমে যায়। এই রোগীরা প্রায়ই কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ভোগে ও তাদের মাঝে মাঝেই জ্বর হয়। এদের রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যায় সে রক্তে সোডিয়ামের পরিমান বেড়েগেছে। যদিও প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হয়

কিন্তু এই প্রস্রাব খুবই পাতলা -- পানির মতো। প্রস্রাবের স্পেসিফিক গ্রাভিটি অথবা 'অসমোলারিটি ' পরীক্ষা করলেল দেখা যায় এটা খুবই কম। এ সব রোগীদেরকে ভেসোপ্রেসিন ' ইনজেকশন দিলেও প্রস্রাবের কোন পরিবর্তন হয় না।

এইসব রোগীদের অধিক পরিমান পানি পান করতে বলতে হবে, যাতে তাদের শরীরে পানির পরিমান কম না হয়। পান করা পানির পরিমান সারা দিনের প্রস্রাবের পরিমানের চেয়ে কম পক্ষে আধা সের বেশী হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া থায়াজাইড ও এমাইলোরাইড জাতীয় 'ডায়ুরিটিক' ব্যবহার করলে এই সব রোগীদের প্রস্রাবের পরিমান কম হয়ও রোগের অনেকটা উপসম হয়।

পলিসিসটিক কিডনী রোগ ঃ -

জন্মগত কিডনী রোগের মধ্যে পলিসিসটিক কিডনী রোগই প্রধান।

এটা কিডনীর জেনেটিক্যালী ডিটারমিণ্ড একটি রোগ এবং অন্যান্য অর্গানের সিসটিক রোগের সংগে একত্রেও এটা হতে পারে। দুই ধরনের ইনহেরিটেন্স হয়। একটা ইনফান্টাইল বা চাইল্ডহুড পলিসিসটিক ডিজিজ যার ইনসিডেন্স খুব কম। এর ইনহেরিটেন্স এর মোড হচ্ছে অটোসোমাল রেসিসিভ। এর মধ্যে আবার চারটি উপ-বিভাগ আছে যেমন ঃ পেরিনাটাল, ন্যাটাল, ইনফ্যান্টাইল এবং জুভেনাইল। দ্বিতীয় পলিসিসটিক কিডনী রোগ সমূহ হচ্ছে এডাল্ট পলিসিসটিক ডিজিজ। এটা খুব বেশী এবং প্রায় প্রতি ৫০০ জনের ১ জনের এ রোগ হয়। এর ইনহেরিন্স এর মোড হচ্ছে অটোসোমাল ডমিনেন্ট। এই রোগ সাধারণত দুই দিকের কিডনীতেই হয়। তবে এক দিকের কিডনীতেও এটা হতে পারে। সিষ্টগুলি প্রাথমিক ভাবে এক পোরশনের নেফ্রন থেকে শুরু হয় যার জন্য ৩ বা ৪ দশক পর্যন্ত কিডনীর স্বাভাবিক কাজ কর্মে কোন ব্যাঘাত হয় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চা বয়সে বা ৭০ বা ৮০ বৎসরের এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তবে সময়ে প্রায় সব রোগীরই উচ্চ রক্তচাপের লক্ষন সমূহ প্রকাশ পায় এবং ক্রনিক রেণাল ফেইলারে রোগী চলে যায়।

পলিসিসটিক কিডনী রোগ দুই ধরনের – যেমন, ছোটদের ও পূর্ন

এই রোগ আমাদের দেশে মাঝে মাঝেই দেখা যায়।

ছোটদের পলিসিসটিক কিডনী রোগ ঃ

এই ধরনের রোগ জন্মের পর পরই প্রকাশ পায়। এমনকি জন্মের আগেই পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। এই রোগ ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই

banglainternet.com

হতে পারে। বাবা ও মায়ের এই রোগ থাকলে শতকরা ২৫ ভাগ ছেলে মেয়ের এই রোগ হওয়ার সমভাবনা থাকে।

এই রোগে সম্পূর্ণ কিডনীই সিষ্ট বা অনেকগুলো সিষ্টে রূপান্তরিত হয়।

এই রোগে আক্রান্ত শিশুরা জন্ম থেকেই খুব ছোট হয়। এদের চামড়া ঢিলে হয় ও এদের মুখ গহ্বর খুব ছোট হয়। অনেকের জন্ম থেকেই কিডনী অকেজো থাকে ও শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। এরা জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই মারা যায়। আর অনেকে জন্মের সময় মোটামুটি স্বাভাবিকথাকে। কিন্তু তাদের পেট খুব বড় থাকে। পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে তাদের যে দুইটি কিডনীই খুব বড় ও অনেক সময় প্লিহ্য ও বড় থাকে। কিডনীর মধ্যে অনেক "সিষ্ট" থাকে ও অনেকের "লিভার সিরোসিস" হয়। অনেকের উচ্চ রক্ত চাপ দেখা যায়। সাধারণত দশ বছর বয়সের মধ্যেই অধিকাংশ রোগী কিডনী অকেজো হয়ে যাওয়ার কারনে অথবা লিভার সিরোসিস এর জন্য মারা যায়।

কিডনীর আল্ট্রাসনোগ্রাফি এবং কিডনীর এক্স-রে (আই, ভি, পি,) করলে সহজেই এই রোগ নির্ণয় করা যায়।

এই রোগের তেমন কোন চিকিৎসা নাই। প্রয়োজনমত উচ্চরক্ত চাপের ও "কিডনী ফেইলিওর" এর সাধারণ চিকিৎসা করলে রোগী কিছুদিন সুস্থ থাকতে পারে। তবে এই রোগ হলে, জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই যদি জন্মের আগেই আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে এই রোগ নির্ণয় করা যায়, তবে জন্মের আগেই বাচ্চা নষ্ট করে ফেলা যায়।

পূর্ণ বয়স্কদের পলিসিসটিক কিডনী রোগ ঃ-

এই রোগ প্রায়ই দেখা যায়। যাদের কিডনী একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে, তাদের শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগের এই রোগ রয়েছে।

বাপ অথবা মায়ের এই রোগ থাকলে শতকরা ৫০ ভাগ ছেলে ও মেয়েদের এই রোগ হওয়ার সমভাবনা থাকে। যদিও এই রোগ জন্মের সময় থেকেই থাকে, তবে এ রোগের লক্ষন প্রকাশ পায় সাধারণত ৩০ বছর বয়সের পর থেকে। এই রোগে রোগীর দুইটি কিডনীতেই অনেকগুলি "সিষ্ট" থাকে। কিডনীর "সিষ্ট" ছাড়া ও এদের লিভার, প্লীহা, অগ্নাশয়, ফুসফুস ও মস্তিস্কের শিরার মধ্যেও "সিষ্ট" থাকতে পারে। অনেক মেয়েদের ডিম্বকোষের মধ্যেও "সিষ্ট" হতে পারে।

এই রোগ হলে রোগীদের সাধারণত তল পেটে চাকা, কোমড়ে ব্যাথা, বারে

বারে প্রস্রাবের সংগে রক্ত যাওয়া, কিডনীর প্রদাহ ও উচ্চ রক্ত চাপ দেখা যায়। কারও কারও কিডনীতে পাথর ও রক্তে লোহিত কনিকার পরিমান বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে রোগীর দুইটি কিডনীই একেবারে অকেজো হয়ে যায় ও রোগীরা ক্রনিক রেনাল ফেইলিওরে ভোগেন।

কিডনীর আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও আই, ভি, পি, করলে সহজেই এই রোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে এই রোগীদের প্রয়োজনমত উচ্চ রক্ত চাপের ঔষধ ও কিডনীর প্রদাহের চিকিৎসা করলে কিডনী দুইটি বেশ কয়েক বছর ভালভাবে কাজ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কিডনী একেবারে অকেজো হয়ে যায় এবং তখন তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হলে ডায়ালিসিস অথবা কিডনী সংযোজনের প্রয়োজন হয়।

যদিও এটা একটি জন্মগত রোগ তবুও এই রোগ আক্রান্ত রোগীরা ৩০ থেকে ৪০ বয়স পর্যন্ত মোটামুটি সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারে।

কিডনীর সিষ্ট সমূহ ঃ

কিডনীর সিসটিক ডিজিজ সমূহ বহুমুখী যেমন বংশগত, জন্মগত, একুয়ার্ড ডিসঅর্ডারের কারণে হয়ে থাকে। এই গ্রুপের রোগের বিশেষ কতগুলি তাৎপর্য্য আছে, যেমন (ক) এগুলো বেশী প্রচলিত বা বেশী দেখা যায় এবং ক্লিনিশিয়ান, রেডিওলজিষ্ট বা প্যাথলজিষ্টদের রোগ নির্ণয়ের অসুবিধা সৃষ্টি করে। (খ) কিছু রোগ যেমন প্রাপ্ত বয়স্কদের পলিসিসটিক কিডনী রোগ ক্রনিক রেণাল এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ। (গ) এদের অনেক সময় ম্যালিগনান্ট টিউমার হিসেবে ভ্রম হতে পারে। এই সিষ্ট রোগ সমূহের একটি কার্যকরী শ্রেণী বিন্যাস নীচে দেওয়া হল।

কিডনীর সিষ্ট সমূহের শ্রেণী বিন্যাস

১. সিসটিক রেণাল ডিসপ্লাশিয়া

২. পলিসিসটিক কিডনী রোগ ঃ প্রাপ্ত বয়স্কদের পলিসিটিক ডিজিজ

বাচ্চাদের পলিসিসটিক ডিজিজ

banglainternet.com

৩. মেডুলারী সিসটিক ডিজিজ ঃ মেডুলারী স্পঞ্জ কিডনী

নেফ্রনপথিসিস - ইউরেমিক মেডুলারী

সিসটিক ডিজিস কমপ্লেক্স

৪. একুয়ার্ড (ডায়ালাইসিস সমপৃক্ত) সিসটিক ডিজিজ।

৫. সিম্পল রেণাল সিষ্ট

৬. অন্যান্য প্যারেণক্যাইমাল রেণাল সিষ্ট

(ক) ইনফেকশন বা প্রদাহের সংগে জড়িত (টিউবারকুলাস, একিনোকাকালসিষ্ট)

(খ) টিউমার এর সংগে সম্পৃক্ত (ক্যানসার এর সিসটিক ডিজেনারেশন)

(গ) আঘাতজনিত ট্রমাটিক ইন্ট্রারেণাল হেমাটোমা।

৭. পেরিহাইলার রেণাল সিষ্ট (পাইলোক্যালিসিয়ালসিষ্ট, হাইলার লিমফান জাইটিকসিষ্ট) ইতিমধ্যে পলিসিসটিক কিডনী রোগ উল্লেখযোগ্য বলে তা আলোচনা করা হয়েছে।

এই পলিসিসটিক কিডনী সিষ্ট জনন এর অনেক থিওরী আছে। বর্তমান প্রাণীর উপর বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োগের মাধ্যমে সিসটিক ডিজিজ তৈরী করে দুটো কারণ সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। (১) পার্টিয়াল ইন্ট্রাটিবিউলার অবষ্ট্রাকশন যার ফলে অবস্ট্রাকটেড স্থানের প্রক্সিম্যাল অংশ ডাইলেটেশন হয়, (২) টিবিউলার বেসমেন্ট মেমব্রেনের একটি ডিফেক্ট যার ফলে টিবিউলার ওয়াল মজবুত হয় না এবং সিষ্ট এর সৃষ্টি হয়।

২য় অধ্যায়

২য় পরিচ্ছেদ

ইউরিনারী ট্র্যাক্ট ইনফেকশন
(URINARY TRACT INFECTION)

মতিউর রহমান

সংজ্ঞা ঃ-

কিডনী এবং মুত্রনালীর রোগজীবানু জনিত সংক্রমনকে ইউরিনারী ট্রাক্ট ইনফেকশান বলে। কিডনী এবং পেলভিসের ইনফেকশন কে উপরের মুত্র নালীর ইনফেকশান বলে। একে একিউট পাইলোনেফ্রাইটিস ও বলা হয়। যখন কিডনীতে স্থায়ী ভাবে দাগ পড়ে তখন তাকে ক্রনিক পাইলোনেফ্রেটিস বলে।

নীচের মুত্রনালীর ইনফেকশান কে সিষ্টাইটিস বলা হয়। এ ধরণের মুত্রনালী ইনফেকশান প্রতিরোধ করা যায়।

মেডিকেল প্র্যাকটিসে যে সব জীবানু ঘটিত, রোগ দেখা যায় ইউরিনারী ট্রাক্ট ইনফেকশান এদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং ঘন ঘন এন্টি বায়োটিক প্রেসকিপশানের ও প্রধান কারণ বটে।

ইপিডেমিওলজী ঃ –

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ চারগুন বেশী। ১৫ থেকে ৬০বছরের মহিলারাই এতে বেশি ভোগে। মহিলাদের মধ্যে এর প্রকোপ শতকরা ২০ ভাগ। শৈশবের প্রথম দিকে এ রোগ বালকদের মধ্যে বেশী দেখা দেয়। তার কারণ হলো মুত্র নালীতে জন্মগত বৈকল্য, ইউরেথ্রোল ভালব এবং ব্লাডার নেক অবষ্ট্রাকশান ইত্যাদি। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মেয়েদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ দেখা দেয় এবং স্কুলের মেয়েদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ।

banglainternet.com

প্যাথজিনেসিস ঃ-

এসকেরেরসিয়া কোলাই - এ রোগের অন্যতম প্রধান রোগ জীবাণু (শতকরা ৮০-৯০ভাগ ক্ষেত্রে)। বাইরের রোগীর তুলনায় হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ষ্ট্রেপটো ফিকালিস, প্রোটিয়াস, ষ্টেফ অরিয়াস, ক্লেবসিলা এরোজেনস এবং সিডোমোনাস জনিত ইউরিনারী ট্র্যাক্ট ইনফেকশানের প্রকোপ বেশী।

ব্যাকটেরিয়াল কলোনাইজেশানের (জীবানুর বৃদ্ধি) এবং এসেনডিং ইনফেকশানে (উর্দ্ধবাহী ইনফেকশান) এটাই ক্রমাগত প্রমানিত হচ্ছে যে ইউরিনারী ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের বিশেষকরে বার বার ইনফেকশানের প্যাথজিনিসিসের বেলায় পেরিনিয়াল এবং ইউরীনারী ব্লাডার রোগ জীবানুর সংযুক্তি (adherence) গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এতে ABO ব্লাড গ্রুপ, সিক্রেটর ষ্টেটাস এবং পি ব্লাড গ্রুপেরও বিশেষ সংযুক্তি আছে বলে জানা যায়। এটা পরিস্কার ভাবে দেখানো হয়েছে যে, P ব্লাড -গ্রুপের লোকেরা যারা বার বার ইউরীনারী ট্রাক্ট ইনফেকশানে ভূগে তাদের মুত্রনালীতে ফ্রিমব্রিয়েটেড ই, কলাই (E. Coli) এর লেগে থাকার স্থান রয়েছে।

রোগ জীবাণু পেরিনিয়াম থেকে মহিলাদের ছোট মুত্রনালী (ইউরেথ্রা) দিয়ে ব্লাডারে প্রবেশ করে এবং সংক্রমন শুরু করে। যৌন সক্রিয় মহিলাদের ইউরেথ্রাল ইনজুরীই হল প্রধান কারণ যা কোন রোগ জীবানু উপর দিকে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। ব্লাডার থেকে ভেসাইকো ইউরেটারিক রিফ্লাক্সের ফলে জীবানুর উপর দিকে প্রবেশের ফলে কিডনীর সংক্রমন হয়। যদিও এ ধরণের সংক্রমনই সাধারণত হয়ে থাকে তবে রক্ত বাহিত জীবানু দ্বারাও কিডনী সংক্রমন হয়। বিশেষ করে যখন কিডনীতে আগের কোন অসুখ বিদ্যমান থাকে এবং মুত্রনালীতে বাধা বা অবষ্ট্রাকশন থাকে।

ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস ঃ-

প্রথমে কিডনী তে ছোট ছোট দাগ হয় পরে ওয়েজের মতো বড় একটা দাগ হয় যার মাথার দিক মেডালার দিকে থাকে। বর্তমানে ক্রনিক এট্রোফিক পায়েলোনেফ্রাইস পুনরায় বর্ণনা করা হচ্ছে। সেটা ভেসিকা-ইউরেটারিক রিফ্লাক্সের ফলে হয়। আগে এটাকে ওভার ডায়োগনিসিস করা হত।

শিশুদের ভেসিকো ইউরেটারিক রিফ্লাক্সের বেলায় ক্রনিক পায়েলোনেফ্রাইটিস ও বারবার ইউরিনারী ট্রেক্ট ইনফেশান (recurrent UTI)

এর সমস্কটা পরিস্কার ভাবে বুঝা যায়। সেটা বয়স্কদের বেলায় ভাল বুঝা যায় না।

ন্যাচারাল হিষ্ট্রি ঃ-

মরবিডিটি ঃ- শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ মহিলা বিশেষ করে যৌন সক্রিয় বয়সে ইউরিনারী ট্যাক্ট ইনফেকশানের উপসর্গে ভুগতে থাকে (যেমন প্রস্রাবে কষ্ট, ঘন ঘন প্রস্রাব,প্রস্রাব করার সময় জ্বালা ইত্যাদি) কিন্তু শিশুরবেলায় উপসর্গগুলি ইউরিনারী ট্যাক্ট সম্বলিত হয় না। নীচে বর্ণিত সাধারণ উপসর্গগুলি শিশুদের বেলায় দেখাদেয়। যদি চিকিৎসকরা সচেতন না থাকেন তবে রোগ নির্ণয়ে ভুল হতে পারে। সাধারণ উপসর্গ গুলো হল

১। দুর্বলতা

২। খাওয়ায় অরুচি

৩। বার বার জ্বর

৪। বিছানায় প্রস্রাব করা

৫। শিশুর বড় না হওয়া

৬। পেটের পীড়া, যেমন অজীর্ণ, ডায়েরিয়া।

রিকারেন্স বা বার বার ইনফেকশান হওয়া ঃ ইউরিনারী ট্যাক্ট ইনফেকশানের সবচেয়ে বিরক্তি জনক দিক হল এটার পুনরাগমন বা recurrence। যে সব মহিলাদের ইউরিনারী ইনফেকশান হয়েছে তাদের শতকরা ৫০ভাগের প্রথম ১ বৎসরের মধ্যে পুনরায় ইনফেকশন হয়। যখন একই জীবানু দ্বারা সংক্রমণ হয় তখন রিকারেন্সকে রিলাপ্স বলা হয় যখন ভিন্ন জীবানু দ্বারা সংক্রমন হয় তখন তাকে (recurrence) রিকারেন্স বলে। উপরের ট্যাক্ট ইনফেকশানে রিলাপ্স এবং নীচের ট্যাক্ট ইনফেকশানে রিকারেন্স ই বেশীর ভাগ হয়ে থাকে।

উপসর্গহীন জীবানু নিঃশ্রাবন (asymptomatic bacteruria)

যখন উপসর্গ ছাড়া কোন ব্যক্তির প্রস্রাবের সাথে নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় জীবানু বের হতে থাকে (১×১০^{৫} প্রতি মিলি লিটারে) এটার ফলাফল কি হতে পারে এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।

banglainternet.com

শৈশব কাল ঃ-

এবয়সে উপসর্গহীন জীবানু নিঃস্রাবণকে অতি গুরুত্ব সহকারে চেনা উচিৎ কারণ কালে এটা ক্রনিক পায়েলোনেফ্রাইটিস রুপ নিতে পারে।

স্কুলের বেলায় মেয়েদেরঃ-

শতকরা প্রায় ১.২ থেকে ২ ভাগ স্কুলের মেয়েরা উপসর্গহীন জীবানু নিঃস্রাবন করতে থাকে। এদের ৩ ভাগের ২ ভাগ বার বার জীবানু নিঃস্রাবন (recurrent bacteruria) করতে থাকে। যদি এসব মেয়েদের চিকিৎসা করা না হয় তবে এরা ভবিষ্যতে বিশেষ করে বিয়ের পরে এবং গর্ভাবস্থায় ক্রনিক পায়েলোনেফ্রাইটিসে ভুগতে পারে। এ সব মেয়েদের ভেসিকা–ইউরেটারিক রিফ্লাক্সে ভোগার প্রবণতাও থাকে।

গর্ভাবস্থায় ঃ

প্রায় শতকরা ৫ ভাগ উপসর্গহীন নিঃসরনে ভুগতে থাকে এবং এদের মধ্যে শতকরা ১৫ভাগ থেকে ৫০ভাগের এ্যাকুট পায়েলোনেফ্রাইটিসে ভুগার ঝুঁকি থেকে যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে গর্ভাবস্থায় ইউরিনারী ট্র্যাক্ট ইনফেকশান মা এবং শিশুর উপর হুমকি হয়ে দেখা দেয়। এতে প্রিমেচিউর ডেলিভারী, নিউনেটাল ডেথ, ষ্টিলবার্থ এবং এবরশান বেশী হয়। আবার যে সব মহিলা গর্ভাবস্থায় ইউরিনারী ট্র্যাক্ট ইনফেশানে ভুগছে তাদের প্রসূত সন্তানরা বুদ্ধিবৃত্তি এবং পেশী শক্তিতে খাটো হয়ে থাকে। মায়েদের উচ্চ চাপ ও প্রি এক্লামটিক টক্সিমিয়া হওয়ার প্রবণতা বেশী থাকে।

মৃত্যুর হার (মর্টালিটিঃ) ঃ-

নিম্নলিখিত শ্রেনীর রোগীরা ইউরনিারী ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে মরতে পারে।

১। যে কোন বয়সের রোগী যাদের মুত্রনালীতে অবষ্টাকশান থাকে।

২। যে সব শিশুদের ভেসিকো-ইউরেটারিক রিফ্লাক্স থাকে।

৩। স্নায়ু বৈকল্য জনিত মুত্রথলির প্যারালাইসিস বিশেষ করে মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত রোগীদের বেলায়।

৪। যাদের কিডনীতে পূর্ব থেকে রোগ রয়েছে এবং কিডনীর function কমে গেছে।

ডায়াগনোসিস বা রোগ নির্ণয় ঃ

উপসর্গ থাকলে এ রোগ নির্ণয় খুব সোজা কিন্তু ভুল ও হতে পারে। কোন কোন রোগীর উপসর্গ ছাড়াই ইনফেকশান থাকতে পারে। সুতরাং এ রোগ সঠিক নির্ণয়ের জন্য ল্যাবেরটরী পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

১. প্রস্রাবে শ্বেত কণিকা ঃ

যদি প্রস্রাব পরীক্ষা করে মাইক্রোস্কোপের নীচে হাই পাওয়ারে ৫ এর অধিক পুঁজ সেল (puscell) পাওয়া যায় তবে তা ইউরিনারী ট্র্যাক ইনফেকশানের (ইউ,টি, আই) এর ইঙ্গিত দেয়। যে সব রোগীর প্রস্রাবের সাথে পুঁজ সেল (Puscell) বের হয় অথচ সাধারণ কালচারে কোন রোগ জীবানু পাওয়া যায় না এদের বেলায় টিউবারকিউলোসিসের (টি,বি) জীবানু এবং ক্লেমাইডিস ট্রেকোমেটিস এর অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন। সুতরাং পাইউরিয়া অন্যান্য কেমিকেল টেষ্টের মত ইউ,টি, আই নির্ণয়ে একক ভাবে সঠিক নয়। এরসঠিক রোগ নির্ণয় জীবানু কালচারের মাধ্যমে হয়।

ইউরিন কালচার ঃ- পঞ্চাশ শতকের সূচিত পদ্ধতি–প্রস্রাবের স্রোতের মধ্য ভাগ থেকে নিয়ে কালচার করা এবং রোগ জীবানু পরিমাণ করা ইউ,টি,আই নির্ণয়ে অনেক খানি সাহায্য করেছিল। অফিসে বসেই স্লাইড বা ফিল্টার পেপারে ইউরিন নিয়ে ডিপ ইনকুলেশান করে কালচার করা যায়।হাসপাতালে সাধারণত আগার প্লেটেই কালচার করা হয়।

সঠিক পদ্ধতিতে মিড ষ্ট্রিম ইউরিন সংগ্রহ করে দ্রুত ল্যাবরেটরিতে ট্রান্সফার করে কালচার করলে ভুল রিপোর্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রতি মিলিলিটার ইউরিনে ১ লক্ষ বা ততোধিক রোগজীবানু পাওয়া গেলে তাকে যোগ্য (Significant) ইউরিন ইনফেকশান বলে। (Localisation) ইউ,টি, আই কে স্থানীভূত করার উদ্দেশ্য হল উপরের ট্র্যাক্ট ইনফেকশান কে পৃথকী করণ করা। যাতে করে উপরে ট্র্যাক্ট ইনফেকশান এর দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসা দ্বারা ক্ষয় রোধ করা যায়। প্রচলিত ক্লিনিক্যাল Criteria যথা জ্বর, কোমরে ব্যথা, এবং রক্তের শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি ইত্যাদি নির্ভর যোগ্য নয় তাই বিভিন্ন প্রকারের ল্যাবরেটারী টেষ্ট করা হয় যেমন -ষ্টেমি টেষ্ট (Stamy test) এই পরীক্ষায় ইউরেটার থেকে প্রস্রাবের সেম্পল (Sample) সংগ্রহ করা হয়। এই পরীক্ষা অত্যন্ত সেনসেটিভ এবং স্পেসেফিক।কিন্তু এতে বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যেইউরিন সংগ্রহ করা হয় এবং এটা শিশুদের ভেসিকো ইউরেটারিক রিফ্লাক্সের বেলায় উপকারী নয়।

banglainternet.com

২। ফেয়ারলী টেষ্ট ঃ

এটা ব্লাডার ওয়াস আউট টেষ্ট, একটা ইনডুয়েলিং ফলিস কেথেটারের সাহায্যে ষ্টেরাইল নরমাল স্যালাইনের দ্বারা ব্লাডার পরিস্কার (ওয়াশ) করা হয়। ব্লাডার পরিস্কার করা স্যালাইনের শেষ অংশটুকু কালচারের জন্য সংগ্রহ করা হয়। তার পর ১০ মিঃ গ্রাম ফ্রুসেমাইড ইনট্রাভেনাস ইনজেকশান দেওয়া হয় এবং ২০, ৩০ এবং ৬০ মিনিট পর ইউরিন সেম্পল সংগ্রহ করে কালচার করা হয়। জিরো সময়ে সেম্পল জীবানু কলোনী কাউন্ট থাকবে শতকরা ১ ভাগেরও কম এবং পরবর্তী সেম্পল গুলোতে শতকরা ১০ভাগের বেশী জীবানু কলোনী কাউন্ট বাড়লে তবে উপরের ট্র্যাক্ট ইনফেকশান নির্ণয় করা হবে।

৩। এন্টি বডি আবৃত জীবানু দিয়ে পরীক্ষা (antibody coated bacteria test)

এই পরীক্ষার যৌক্তিকতা হল যখন রোগ জীবানু কিডনীকে আক্রমন করে এর বিরুদ্ধে শরীরে এন্টিবডি তৈরী হয় সেটা রোগ জীবানুর সাথে লেগে যায়। ফ্লোরেছেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে এটাকে সনাক্ত করা যায়। সাধারণত ১ x ফ্লোরেছেন্ট জীবানু কে কাট অফ পয়েন্ট হিসাবে ধরা হয়। তবে এই টেষ্টে ফলস পজিটিভ এবং নেগেটিভ রেজাল্ট আসে এবং নিয়মিত ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে এটা ব্যবহার হয় না।

উপরের নীচের ট্র্যাক্ট ইনফেকশানকে পৃথকীকরণ করার জন্য আরো বিভিন্ন টেষ্ট ব্যবহার করা হয় যেমন বিটা -২ মাইক্রোগ্লোবুলিন এক্সক্রিসান, ইউরিনারী লেকটিক ডি হাইড্রোজিনেস (LDH) আইসো এনজাইম ৪ এবং ৫ এবং সিংগল ডোজ এন্টি মাইক্রোবিয়াল টেষ্ট ইত্যাদি।

৪. রেডিওলজিক মেথড ঃ- (Radiologic Method)

ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত ইনট্রাভেনাস ইউরোগ্রাম/ (আই, ভি, ইউ) প্রায় কিডনীতে জখম নির্ণয়ে সাহায্য করে। অবষ্ট্রাকটিভ পায়েলোনেফ্রাইটিসের $\frac{১}{৩}$ ভাগ ক্ষেত্র আই, ভি, ইউ, (IVU) তে কোন দোষ ধরা পড়ে না।

চিকিৎসা ঃ

সাধারণ ব্যবস্থা ঃ সব ইউ, টি,আই এর রোগীদের বেশী পরিমান পানীয় পান করতে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করতে বলা হয়। প্রস্রাবের pH পরিবর্তণ করার

সাধারণ দরকার হয় না। তবে এলকালোসিস হোলে ইউরিনের এসিডিটি কমে এবং কিছু উপসর্গ কমেযায়। তা ছাড়া এতে সালফোনোমাইড ও এমাইনোগ্লাইকোসাইডস এর কাজ ও ভাল হয়।

এক্যুইট জটিলতাহীন ইনফেকশান বা acute uncomplicated infection :

সাম্প্রতিক অনেক গবেষনায় দেখা গেছে যে এক ডোজ এন্টি বায়োটিক এ ধরণের ইনফেকশানস সেরে যায়। নীচে কয়েকটির ঔষধের Single ডোজ দেয়া হল :

ট্রাইমিথোপ্রিম -সালফামিথোক্সিম ১৬০/৪০০ মিঃ গ্রাম-৪৮০/২৪০০ মিঃ গ্রাম

কেফালো স্পেরিন - ২ গ্রাম, এমোক্সিসিলিন ৩ গ্রাম

জেন্টোমাইসিন , কেনামাইসিন -৫০০ মিঃ গ্রাঃ ইন্টামাসকুলার।

উপকারীতা ঃ-

সিংগল ডোজ - চিকিৎসায় খরচ কম , ড্রাগ রেজিষ্টান্স হয় না এবং ঔষধের খারাপ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয় না।

অপকারীতা ঃ -

উপরের ট্র্যাক্ট ইনফেকশানের রোগীদের রিলাপ্স হয়।

এ্যাকুট পায়েলোনেফ্রাইটিস ঃ- ইউরিন কালচারের পর ঔষধের কার্য্যকারিতা দেখে ঔষধ প্রেসক্রিপশান করাই হল আদর্শ চিকিৎসা।যে সব ঔষধ প্রস্রাবের যথেষ্ট ঘনত্বে বের হয় সে সব ঔষধই বেশী পছন্দনীয়। বেশী ব্যবহৃত ঔষধ হল ট্রাইমিথোপ্রিম-সালফামিথোক্সাজল, এমপিসিলিন, এমোক্সিসিলন এবং কেফেলোসেপারিন ইউরিনারী ট্রেক্ট ইনফেশান দুর করতে চিকিৎসার সময়কাল ৩ থেকে ১৪দিন পর্যন্ত হয়। যে সব ইউরীনারী ট্রেক্ট ইনফেকশান উল্লেখিত ঔষধের প্রতি জীবানুর রেজিষ্ট্যান্স ডেভলপ করে। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে মুত্রনালীতে অবষ্টাকশান সে সব ক্ষেত্রে এমাইনোগ্লাকোসাইড এন্টিবায়োটিকস এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে যেমন ইনজেকশান জেন্টামাইসিন, কেনামাইসিন এবং টোব্যামাইসিন। এসব এন্টিবায়োটিকের ডোজ পরিমাপ করার জন্য কিডনী ফাংশান পরীক্ষাকরে দেখা প্রয়োজন। **টেবেল (১)**

banglainternet.com

টেবিল -১

সাধারণত নিম্নলিখিত জীবানু ধ্বংসকারী ঔষধ ইউরিনারী ট্র্যাক্ট ইনফেকশানে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধ	শিশুদের ডোজ	প্রাপ্ত বয়স্কদের ডোজ	মন্তব্য
সালফামিথোক্সাজোল ট্রাইমিথোপ্রিম	৮-৪০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজিতে দিনে ২ বারে	১৬০-৮০০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ২ বার	বার বার (রিকারেন্ট) ইনফেকশানের জন্য অল্প মাত্রায় ফলদায়ক।
নাইট্রোফুরানটয়েন	৫-৭ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজিতে দিনে ৪ বারে বিভক্ত করে সেব্য।	১০০ মিঃ গ্রাঃ করে দিনে ৪ বার	ঐ কিডনী ফেইলিউরে নিষেধ
এম্পিসিলিন	১০০মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজিতে দিনে ৪ বারে	২৫০-৫০০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ৩ বার।	মুখে সেবন করালে রক্তে সহজে প্রবেশ করে।
কেফালোস্পোরিন	২৫-৫০ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজিতে দিনে ৪ বারে	ঐ বিভক্তকরে সেব্য।	সেবন করা যায় এবং ইনজেকশান দেয়া যায়।
জেন্টামাইসিন	৬-৭.৫ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজিতে দিনে ২ বার করে ইনজেকশান দেয়া হয়।	৩-৫ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজিতে দিনে ২ বারে ইনজেকশান	কিডনীর ক্ষতিকারক এবং কানে কম শোনে
টোব্রামাইসিন	৩-৫ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজিতে দিন ২ বারে ভাগ করে ইনজেকশান দেয়া হয়।	বয়স্কদের বেলায় ডোজ শিশুদের মত।	
কার্বেনিসিলিন	ডোজ সঠিক ভাবে নির্নয় হয় নি	৮-১২ গ্রাম প্রতিদিন ৪ বারে ভাগে ইনট্রাভেনাস ইনজেকশান দেয়া হয়।	সিডোমোনাস ইনফেকশানে কাজ করে।

banglainternet.com

বার বার ইনফেকশানের চিকিৎসা ঃ

বারবার ইউনারী ট্রেক্ট ইনফেকশানকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় যেমন ১। রিলাপ্স এবং ২। রিইনফেকশান।

১। রিলাপ্স ঃ- রিলাপ্স হল সেটা যাতে ইনফেকশানের জীবানু থেকেই যায়। ঔষধের প্রতি জীবানুর রেজিষ্ট্যান্স অথবা অপ্রতুল চিকিৎসার ফলে কয়েক দিনের মধ্যে একই জাতীয় (Same species) এবং একই সিরোটাইপের (Same serotype) এর জীবানু আবিভবি হয়।

২। রিইনফেকশান - এটা সাধারণত নতুন জীবানু দ্বারা সংগঠিত হয় এবং অনির্দিষ্ট সময় পরে হয়।

রিলাপ্স এবং রিইনফেকশান দু'টাই উপরের এবং নীচের ট্রেক্ট ইনফেকশানে হতে পারে। সিংগল ডোজ চিকিৎসার ফলে রিলাপ্স তা যথার্থ এন্টিবায়োটিক দ্বারা - ২ সপ্তাহ যাবৎ চিকিৎসা করানো দরকার।
রিইনফেকশানের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ ৫০ মিলি গ্রাম নাইট্রোফুরানটয়েন বা ১০০ মিঃ গ্রাঃ ট্রাইমিথোপ্রিম রাত্রে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এ ধরণের সময় কাল ৬মাস থেকে ২ বছর হয়ে থাকে।

২য় অধ্যায়

৩য় পরিচ্ছেদ

গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস
(GLOMERULONEPHRITIS)

-- মতিউর রহমান

গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস বস্তুত পক্ষে একটি রোগ নয়, বরং অনেক কারনে এবং বিভিন্ন ভাবে যখন গ্লোমারুলাস আক্রান্ত হয় -- যার প্রধান প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রস্রাবে আমিষের আর্বিভাব (Proteinuria) দেখা দেয়। প্রোটিনিউরিয়া কম বা বেশী হতে পারে এবং প্রস্রাবে রক্ত কনিকা (R.B.C) বা কাষ্ট (Casts) থাকে। গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস কোন উপসর্গ ছাড়াই শরীরে বিদ্যমান থাকতে পারে আবার বেশীর ভাগ সময় এ থেকে উচ্চ রক্ত চাপ, প্রস্রাবে রক্তক্ষরন, শোথ (Odema) এবং এ্যাকুট অথবা ক্রনিক রেনাল ফেয়লিউর হোতে পারে। আসলে গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিসই দুটো কিডনী একেবারে নষ্ট করার অর্থাৎ ক্রনিক রেণাল ফেয়লিউর (Chronic Renal failure) এর অন্যতম প্রধান কারণ।

কারণ (Etiology)

গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিসের কারন প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় --

১। কারণ বোঝা যায়নি যাকে ইংরেজীতে (Primary) গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস বলা হয়।

২। দ্বিতীয়ত যখন কারণ বোঝা যায় থাকে ইংরেজীতে (Secondary) গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস বলে। কারন জানা থাক বা না থাক গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস সাধারণত ইমিউনোলোজিক্যাল (Immunological) তা সর্বজন স্বীকৃত। যদিও কিছু ক্ষেত্রে যেমন বংশানুক্রমিক (Heriditary glomerulonephritis) যাকে অলপোর্ট সিন্ড্রোম (Alport Syndrome) বলে ব্যতীত অন্যান্য গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিসে ইমিউনোলজিক্যাল কারণ দেখা যায়। জীবজন্তুদের উপর পরীক্ষা

গবেষণা (Animal Experiment) এবং মানুষের মধ্যে (Human disease) রোগ পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস রোগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইমিউন পদ্ধতির (Immune System) যে দুইটি রকম (Two areas) আছে যেমন হিউমোরাল (Humoral) এবং সেলুলার (Cellular) তাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে হিউমোরাল পদ্ধতির জড়িত থাকার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান এবং এই হিউমোরাল পদ্ধতি তিন ভাবে গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস করে।

১) রক্তে সঞ্চালিত ইমিউন কমপ্লেক্স (Circulatiug immune complex)

২) ইমিউন কমপ্লেক্স ইন সিটু (Immune Complex in situ)

৩) এ্যান্টি গ্লোমারুলার বেজমেন্ট মেমব্রেন এ্যান্টি বডি (Anti GBM antibody)

যদিও উপরোক্ত পদ্ধতি গুলোই গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস করে কিন্তু প্রাইমারী গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিসে এ্যান্টি জেনের সূত্র পাওয়া যায়না -- যেমনটি সেকেণ্ডারী গ্লোমারলোনেফ্রাইটিসে যায়।

সেকেণ্ডারী গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর কারণ ঃ-

১) ব্যাকটেরিয়া-স্ট্রেপ্টোকক্কাস বিটা হিমোলিটিকাস (Strepto ß haemolyticus) ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus) ইত্যাদি।

২) প্যারাসাইট - যেমন ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট

৩) ভাইরাস --- যেমন হোপাটাইটিস বি ভাইরাস

৪) এন্টি ডি. এন. এ. এন্টিবডি (Anti DNA antibody)

৫) ড্রাগস (Drugs) : পেনিসিলামিন (Penicillamin) ফেনিনডিওন (Phenindion) ইত্যাদি

৬) টিউমার এ্যান্টিজেনস।

যাই হোক এই এন্টিজেন, শরীরে এ্যান্টিবডি তৈরী করে। তৈরী এ্যান্টিজেন - এন্টিবডি কমপ্লেক্স রক্তের মধ্যে থেকে গ্লোমেরুলাস এর বেজমেন্ট মেমব্রেন (Basement Membrane) আটকে যায়। আর ইন-সিটুতে এ্যান্টিজেন প্রথমেই গ্লোমেরুউলেসে আটকে ওখানেই এন্টি বডি তৈরি করে, রোগের সূত্রপাত করে। আর এন্টি জিবিএম (Anti GBM) এন্টি বডি সরাসরি জি. বি. এম. এ আটকে

banglainternet.com

রোগের সূত্রপাত করে। উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে যখন গ্লোমেরুলার এন্টিজেন – এন্টিবডি বা এ্যান্টি জিবি এম এ্যান্টি বডি জি.বি.এম.এ প্রদাহের জন্ম দেয় (Inflammatory reaction) এবং তখনই শরীরে কমপ্লিমেন্টারী সিসটেম (Complentary system) ও কোয়াগুলেশন সিসটেম (Coagulation System) উসকাপ্রাপ্ত (Stimulation) হয়ে গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস করে।

এই প্রদাহ গ্লোমারুলাস এ কি রকম মারাত্মক পরিবর্তন ঘটায় (Pathology) তার উপর নির্ভর করবে গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস কি মৃদু (মাইলড) হবে যার ভবিষ্যত (Prognosis) ভাল অথবা মারাত্মক যেমন (Rapidly progressive glomerulonephritis হবে) যার ভবিষ্যত (Prognosis) খুব খারাপ ।

গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর ভাগ (Classification)

ক্লিনিক্যাল (Clinical) ক্ল্যাসিফিকেশন –

১) এ্যাকুট নেফ্রাইটিক সিন্ড্রোম (Acute Nephritic Syndrome)

২) নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম (Nephrotic Syndrome)

৩) ক্রনিক গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস (Chronic glomerulonephritis)

হিষ্টোলজিক্যাল ভাগ (Histological Classification)

১) মিনিম্যাল চেঞ্জ ডিসিজ – (Minimal Change disease)

২) ফোকাল গ্লোমারুলোস্কেলোরোসিস (Chronic glomerulonephritis)

৩) মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি (Membranous Nephropathy)

৪) প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস (Proliferative glomerulonephritis)

৫) মেমব্রেনো প্রোলিফরেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস (Membrano Proliferative glomerulonephritis)

৬) আ, জি, এ, নেফ্রোপ্যাথি (IgA Nephropathy)

ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম -- (Clinical Syndrome)

গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এর কারণ যাই হোক সাধারণতঃ যে কোন গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস নীচের যে কোন এক বা ততোধিক উপায়ে আক্রান্ত হোয়ে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হয় --

১) এ্যাকুট নেফ্রাইটিক সিন্ড্রোম -- (Acute Nephritic Syndrome)

২) নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম (Nephrotic Syndrome)

৩) উপসর্গ ছাড়াই প্রোটিনিউরিয়া (Asymptomatic Proteinuria)

৪) র‍্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস (Rapidly progressive glomerulonephritis)

৫) সিমটোমলেস হেমাচুরিয়া (Symptomless Haematuria)

৬) ক্রনিক রেণাল ফেয়লিওর (Chronic Renal failure)

এখন এই সিন্ড্রোমগুলো আলাদা ও একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাক ।

এ্যাকুট নেফ্রাইটিক সিন্ড্রোম
(Acute Nephritic Syndrome)

এ্যাকুট নেফ্রাইটিক সিন্ড্রোম বা এ্যাকুট গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস একই কথা। এ্যাকুট নেফ্রাইটিক সিন্ড্রোমে রোগীর প্রস্রাব একটু লাল হয় (Hematuria) পরিমান কমে যায় (Oliguria) মুখে ও পায়ে পানি (Oedema) দেখা যায় এবং অনেক সময় রক্ত চাপ বাড়ে এবং হার্টের কার্য্যক্রম ব্যহত (Cardiac failure) হয়। প্রস্রাব পরীক্ষা করলে প্রস্রাবে অল্প পরিমানে আমিষ (Proteinuria) থাকে এবং লোহিত কনিকা ও কাষ্ট (Cast) পাওয়া যায়।

এ্যাকুট নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম বা এ্যাকুট গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর কারনগুলি --

১) প্রাইমারী গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস

প্রোলিফারেটিভ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস (Proliferative GN) তা মেসাঞ্জিয়াল (Mesangial) এ্যান্ডোথেলিয়াল (Endothelial) বা ইপিথেলিয়াল (Epithelial) কোষ এর হোক ।

banglainternet.com

বাড়ে। ত্বক বা চামড়ার প্রদাহ থেকে ষ্ট্রেপটোকক্কাস কালচার পাওয়া যেতে পারে।

এ, এস, ও টিটার (ASO Titre) ঃ- ষ্ট্রেপটোকক্কাল ইনফেকশনে এ, এস, ও (ASOT) বাড়ে। তবে এ,এস, ও বাড়ার সংগে রোগের প্রকোপের কোন সম্পর্ক নাই।

কিডনী ফাংশন টেষ্ট ঃ রক্তে মৃদু কেস গুলিতে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন স্বাভাবিক থাকে তবে সাংঘাতিক (Severe) কেস গুলিতে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাবে।

সিরাম কমপ্লিমেন্ট (C) প্রথমের দিকে কমে যায় কিন্তু ৬ - ৮ সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যায়। প্লাজমা এ্যালবুমিন -- বেশির ভাগ কেসে স্বাভাবিক থাকবে তবে যাদের প্রোটিনিউরিয়া বেশী হবে সে ক্ষেত্রে কমতে পারে।

কিডনী বায়োপসি ঃ করলে গ্লোমেরুলাস বড় হয় প্রোলিফারেটিভ গ্লোমোরুনেফ্রাইটিস এবং পলিমরফো নিউক্লিয়ার সেল বেশী পাওয়া যায়।

চিকিৎসা ঃ বিশ্রাম ঃ প্রথমের দিকে বেড রেষ্ট এ থাকা ভাল। কেননা রুগী হঠাৎ বাম হার্ট ফেওলিওর (Left Ventricular failure) এ যেতে পারে। তবে এ্যাকুট ফেজের পর বিছানায় থাকার প্রয়োজন নেই।

এন্টি বাওটিক ঃ ষ্ট্রেপটোকক্কাল ইনফেকশন এর প্রমান পাওয়া গেলে পেনিসিলিন বা অ্যামপিসিলিন এর একটা কোর্স দেয়া যেতে পারে।

পথ্য ঃ প্রথমের দিকে পানির পরিমান কমানো ভাল। আমিষ ও লবন কমানো ভাল।

ডাইউরেটিকস ঃ শরীরে অতিরিক্ত পানির পরিমান থাকলে ফ্রুসেমাইড ব্যবহার করা প্রয়োজন।

রক্তচাপ ঃ- রক্তচাপ বাড়লে কমানোর ঔষধ ব্যবহার করা প্রয়োজন। ডোজ নির্ভর করবে রুগীর বয়স ও রক্ত চাপের পরিমানের উপর।

ডায়ালিসিস ঃ অল্প সংখ্যকরুগী এ্যাকুট রেনাল ফেওলিওর এ যায় তাদের ডায়ালিসিস করা প্রয়োজন।

কোর্স ও প্রোগনোসিস ঃ ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে ৯০% শিশুরা একদম ভালো হয়ে ওঠে এবং বড়দের ক্ষেত্রে ৫০%। তবে এই কেন্দ্রে অনেকদিন ফলো আপ করেও দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ শিশুরাই ভাল থাকে। তবে ভিন্নমতও অনেকে পোষন করেন।

প্রতিরোধ ঃ বাংলাদেশে খোস পাঁচড়ার তড়িৎ চিকিৎসা করলে এ্যাকুট পোষ্ট ষ্ট্রেপটোকক্কাল নেফ্রাইটিস এর প্রকোপ অনেক কমে যাবে।

উপসর্গ ছাড়া প্রোটিনিউরিয়া ও নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম

(Symptomless Proteinuria and Nephrotic Syndrome)

সাধারণত যখন প্রোটিনিউরিয়া প্রস্রাব রুটিন পরীক্ষা করলে পাওয়া যায় কিন্তু রোগীর কোন উপসর্গ নাই তাকে Symptomless proteinuria বলা হয়। এই ক্ষেত্রে সাধারণত প্রোটিনিউরিয়া বেশি থাকে না, রুটিন টেষ্টে ১ + এবং ২৪ ঘন্টার প্রোটিন ২ গ্রামের বেশী হয়না।

এই Symptomless proteinuria যুবকদের দেখা যেতে পারে ব্যায়ামের পরে আবার অনেকের ২৪ ঘন্টার প্রস্রাব দিন ও রাতের আলাদা করে ধরে যদি proteinuria পরীক্ষা করা যায় দেখা যায় যে দিনের Sample এ প্রোটিন যাচ্ছে অথচ রাতে Sample এ কোন প্রোটিন নাই এই অবস্থাকে বলা হয় অর্থোষ্ট্যাটিক প্রোটিনিউরিয়া (Orthostatic বা Postrenal Proteinuria) শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে এটা কোন ক্ষতি করে না। তবে কারন্র ব্যায়াম এর পরে বা Orthostatic proteinuria পেলে নীচের পরীক্ষা গুলো করা দরকার --

১) রক্তচাপ আছে কিনা

২) প্রস্রাবে রক্ত কনিকা আছে কিনা

৩) কিডনী ফাংশন (অর্থাৎ রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়াটিনিন বেশি না স্বাভাবিক)

উপরোক্ত তিনটি টেষ্ট যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আর কোন পরীক্ষার প্রয়োজন হয়না। শুধু রুগীকে Follow up দরকার। তবে যদি রক্ত চাপ বেশী হয়, প্রস্রাবে রক্ত কনিকা পাওয়া যায়, এবং রক্তে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন বেশী হয় তাহলে রুগীর অন্যান্ন পরীক্ষা যেমন IVU এবং কিডনী biopsy করা প্রয়োজন হতে পারে।

banglainternet.com

Symptomless proteinuria পেলে এটা সার্বক্ষনিক নাকি মাঝে মাঝে (Transient) তা দেখা প্রয়োজন।

যেহেতু ক্ষতিকারক নয় সেজন্য Symptomless proteinuria রুগীকে সান্তনা দেয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা Nephritis ইত্যাদি রোগ হলে সাধারণত মানুষ কিডনী একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে এবং ডায়ালিসিস বা সংযোজনের কথা চিন্তা করে। এই রুগীদের ক্ষেত্রে assurance দেয়া এবং মাঝে মাঝে check up করা ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না।

নেফ্রোটিক সিনড্রোম
(Nephrotic Syndrome)

Nephrotic Syndrome এ প্রোটিনিউরিয়া বেশী হয়। রুটিন টেষ্টে ৩ থেকে ৪+ এবং ২৪ ঘন্টায় সাধারণত ২ -- ২০ গ্রাম প্রোটিন ইউরিনে পাওয়া যায়। এই protein এর জন্য রোগীর রক্তে এ্যালবুমিন কমে যায় এবং শরীরে পানি জমে, ফোলা দেখা দেয় -- এই অবস্থাকে নেফ্রোটিক সিনড্রোম বলা হয়।

কারণ ঃ

নেফ্রোটিক সিনড্রোম যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নেফ্রাইটিস রোগের কারনে হয়ে থাকে তবুও অন্যান্য বহু কারনে নেফ্রোটিক সিনড্রোম হতে পারে।

টেবিল -- ২ নেফ্রোটিক সিনড্রোমের কারণ গুলি দেখানো হয়েছে --

টেবিল নং – ২

১) প্রাইমারী গ্লোমারুলো নেফ্রাইটিস ঃ	শিশুদের	বড়দের
(ক) মিনিম্যাল চেঞ্জ ডিজিজ	৬৫%	১৫%
(খ) ফোকাল গ্লোমারুলোস্কেলেরোসিস	১০%	১৫%
(গ) প্রলিফারেটিভ-নেফ্রাইটিস	১০%	২৩%
(ঘ) মেমব্রেনাস-নেফ্রোপ্যাথি	৫%	৪০%
(ঙ) মেমব্রানো প্রলিফারেটিভ	১০%	৭%
(চ) আই, জি, এ নেফ্রোপ্যাথি		

banglainternet.com

২) সেকেণ্ডারী নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, সিষ্টেমেটিক ব্যাধির কারণে

(ক) মেটাবলিক যেমন বহু মূত্র (ডায়াবেটিস মেলিটাস)

(খ) কানেকটিভ টিসু রোগ যেমন -- এস, এল, ই, পলিআর্টিরাইটিস নডোসা

(গ) রক্তরোগ --হেনোক সনলাইন প্যারপুরা, শিকল সেল এনিমিয়া, রেনাল ভেইন থ্রমবোসিস।

(ঘ) ইনফেকশন যেমন -- ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস

(ঙ) অন্যান্য -- ড্রাগস যেমন -- মারকারি, গোল্ড, পেনিসিলামিন, ট্রাইমেথাডিওন

(চ) টিউমার ঃ হজকিন্স রোগ

দেখা যাচ্ছে যে শিশুদের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে প্রাইমারী গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস যেমন মিনিম্যাল চেঞ্জ ডিজিজ, নেফ্রোটিক সিনড্রোম করে থাকে। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে Primary GN এর মধ্যে Proliferative GN এবং Membranons GN ইত্যাদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম করে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে অন্যান্য রোগ যেমন বহুমূত্র নেফ্রোটিক সিনড্রোম রোগ করে যা কিনা শিশুদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়।

উপসর্গ ঃ নেফ্রোটিক সিনড্রোম প্রধান উপসর্গ ফুলে যাওয়া (Odema)। এই Oedma অনেক বেশী হতে পারে এবং Ascitis বা Pleural effusion (ট্র্যান্সডুডেট) করতে পারে।

Pathogenesis

নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের আসল কথা হোল প্রস্রাবে Prtein loss. এই Protein loss এর ফলে লিভার অতিরিক্ত পরিমানে প্রোটিন তৈরী করা সত্বেও রক্তে Protein এর পরিমান বিশেষ করে এ্যালবুমিন কমে যায় যার ফলে শরীরের পানি জমে এবং Odema দেখা যায়।

রোগ নির্ণয় ঃ– নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম diagnosis সোজা কিন্তু কি কারনে হোল সেটা বের করতে হলে পরীক্ষা নীরিক্ষা করা প্রয়োজন ঃ–

১) প্রস্রাবের রুটিন পরীক্ষাতে এলবুমিন

২) ২৪ ঘন্টার ইউরিন Protein

৩) প্লাজমা প্রোটিন এ্যালবুমিন

৪) রক্তে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন

৫) সিরাম কলেষ্টেরোল

৬) ইমিউনোগ্লোবিউলিন

৭) কমপ্লিমেন্ট (C_3, C_4)

৮) ইমেজিং যেমন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা এক্সরে

৯) কিডনী biopsy.

উপরোক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের কারন ধরা সম্ভব।

তবে শিশুদের ক্ষেত্রে ২ -- ১০ বছরের মধ্যে কারুও নেফ্রোটিক সিনড্রোম হলে কিডনী biopsy ছাড়াই চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে কেননা শতকরা ৮৫ ভাগ শিশুই MCD রোগে ভুগে অবশ্য বয়স্কদের বেলাতে কিডনী biopsy করা উচিত।

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের জটীলতা (Complication)

১) ইনফেকশন বা প্রদাহ

২) ম্যালনিউট্রিশন বা অপুষ্টি

৩) Na^+ কমে যাওয়া

৪) *হাইপোভলিমিয়া*

৫) থ্রম্বোটিক জটীলতা

নেফ্রোটিক সিনড্রোম যা উপরে আলোচনা করা হোল তা যে কারনেই হোক না কেন,নীচে নেফ্রাটিক সিনড্রোমের এর কয়েকটি বিশেষ কারন গুলো আলোচনা করা হবে।

চিকিৎসা ঃ

নেফ্রোটিক সিনড্রোমের চিকিৎসা তিন ভাগে ভাগ করা যায় (১) সিমটোম্যাটিক (২) জটীলতার চিকিৎসা এবং (৩) স্পেসিফিক চিকিৎসা।

এর পরের অধ্যায় গুলিতে নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের কারণ প্রাইমারী গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস গুলো যেমন --

(ক) মিনিম্যাল চেঞ্জ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস

(খ) ফোকালে গ্লোমারুলোস্কেলেরোসিস

(গ) প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস

(ঘ) মেমব্রেন নেফ্রোপ্যাথি এবং

(ঙ) আই জি এ নেফ্রোপ্যাথি

আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করা হলো।

মিনিম্যাল চেঞ্জ ডিজিজ
(Minimal Change Lesion MCD)

Nephrotic syndrome রোগীর বয়স যদি ১০ বছরের কম হয় তাহলে শতকরা ৮৫ জন এর এই Minimal change disease হবে। বয়স্কদের ও এই রোগ হয় তবে শতকরা মাত্র ২০ জনের ক্ষেত্রে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগের কারন জানা বা বুঝা যায় না অর্থাৎ এটা এক ধরনের Primary glomerulonephritis কিন্তু অন্যান্য কারনেও MCD হতে পারে যেমন HbsAg, Lymphoma ইত্যাদি।

রোগ নির্নয় :

যখনই কোন শিশু বা বয়স্ক লোকেরা চিকিৎসকের কাছে হাত পা ফোলা নিয়ে আসে এবং প্রস্রাব পরীক্ষা করলে বেশী পরিমানে প্রোটিন পাওয়া যায় এবং এই প্রোটিনিউরিয়া সিলেকটিভ অর্থাৎ শুধুমাত্র লোমলিকুউলার ওয়েট প্রোটিন অর্থাৎ এ্যালবুমিন পাস করে।কিন্তু প্রস্রাবের কোন লোহিত কনিকা থাকেনা। রক্ত চাপ স্বাভাবিক এবং কিডনী ফাংশন অর্থাৎ ইউরিয়া, ক্রিয়াটিনিন স্বাভাবিক তখন এদের বায়োপসি করলে লাইট মাইক্রোসকপিতে তে যদি স্বাভাবিক মনে হয় তখনই MCD হয়েছে বলা হয়। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে বায়োপসি ছাড়াই চিকিৎসা দেয়া হয় কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে বায়োপসি *করা উচিত।*

banglainternet.com

চিকিৎসা ঃ-

সাধারণ চিকিৎসা ঃ-

১) পথ্য ঃ- যেহেতু এই রোগীদের কিডনী ফাংশন স্বাভাবিক থাকে এবং

Protein রক্তে কম থাকে সেজন্য এদের পথ্যে protein বাড়িয়ে দেয়াই ভাল, মনে রাখা দরকার আমাদের দেশের খাদ্যে Protein এর পরিমান এমনিতেই কম তাই এই রোগীদের বয়সের সংগে সংগতি রেখে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ খেতে পরামর্শ দেয়া উচিত।

২) ডায়ুরেটিক্স:- ফোলা যখন খুব বেশী থাকে তখন লুপ ডায়ুরেটিক যেমন ফ্রুসেমাইড (Frusemide) ব্যবহার করা যেতে পারে। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে রোগীরা Hypovolumia, Hyponatremia না develop করে। এজন্য প্রতিদিন ওজন নেয়া প্রয়োজন।

৩) এই রোগীদের ইনফেকশন হোলে -- এ্যান্টিবাওটিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশেষ ঔষধ (Specific treatment)

১) ষ্টেরয়ড (Steroid)

Prednisolone 5 mg tab.

শিশুদের ক্ষেত্রে ৬০ মিঃ গ্রাম প্রতি স্কয়ার মিটারে প্রতিদিন ৪ সপ্তাহ। তারপর আস্তে আস্তে কমিয়ে দেয়া যায় অথবা একদিন পর পর আরও৪ সপ্তাহ দেয়া দরকার। সাধারণত প্রথম ৪ সপ্তাহের মধ্যেই প্রস্রাব Protein free হয়ে যায়। তবে এ রোগের চিকিৎসার প্রধান সমস্যা হোল শতকরা ৫০ ভাগ রোগী নিরাময়ের পরও আবার এই রোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা। যাকে relapse বলা হয়। যখন এই relapse বছরে ২ বার হয় তাকে frequently relapsing nephrotic syndrome বলে। এদের ক্ষেত্রে কিডনী বায়োপসি করা প্রয়োজন। অনেক সময় বায়োপসি তে MCD হোলেও Steroid এ response করে না। এরা MCD হোতে পারে অথবা অনেক ক্ষেত্রে আলাদা রোগ থাকে যাকে Focal glomerulosclerosis (FGS) রোগ বলে তাও হয়। FGS ঠিক MCD র মতই Nephrotic syndrome করে তবে steroid এ কোন কাজ হয় না। আর ৫--১০ বছরের মধ্যে এরা রেনাল ফেওলিওর develop করে।

২) সাইটোটক্সিক ড্রাগ (Cytotoxic drugs)

Biopsy তে যদি MCD ধরা পড়ে আর সেই রোগী যদি

(ক) বার বার relapse করে বা

(খ) Steroid এ respond না করে বা

(গ) Steroid এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অতি মাত্রায় দেখা দেয় তখন এই সমস্ত ক্ষেত্রে Endoxan (২ -- ৩ মিলিগ্রাম প্রতিদিন) দেয়া যেতে পারে। তবে কখনই ৮ সপ্তাহের বেশী নয়।

৩) সাইক্লোস্পোরিন— ইদানিং এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাইক্লোস্পোরিনও ব্যবহার করা হচ্ছে।

এণ্ডোক্সান দিলে প্রতি সপ্তাহে WBC করা প্রয়োজন এবং WBC কাউন্ট চার হাজারে এলে বন্ধ করা উচিত। এছাড়া এন্ডোক্সান এর সুদুর প্রসারী ক্ষতি করতে পারে যেমন মেয়েদের এমিনোরিয়া এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে এজুস্পারমিয়া। এছাড়াও ক্যান্সার হোতে পারে। সুতরাং জেনারেল প্রাকটিসে এ MCD Steroid দ্বারা চিকিৎসা করাই উচিত এবং সাইটোটক্সিক এজেন্ট ব্যবহার করার জন্য বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়া প্রয়োজন।

ফোকাল গ্লোমারুলোস্কেলেরোসিস (Focal Glomerulosclerosis, FGS)

নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের প্রায় ১০-১৫% রোগী ফোকাল গ্লোমারুলোস্কেলেরোসিস রোগে ভুগে থাকে। এই রোগ সাধারণত নেফ্রোটিক সিনড্রোম হিসাবেই প্রেজেনট করে তাই রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে মিনিম্যাল চেঞ্জ ডিজিজ থেকে ক্লিনিক্যালি পার্থক্য করা বেশ কঠিন। তবে এই রোগের প্রোটিনিউরিয়া নন-সিলেকটিভ, প্রস্রাবে লোহিত কনিকা যেতে পারে এবং অনেক সময় রোগীর রক্ত চাপ ও বেশী থাকে।

কারন ঃ এই রোগের কোন কারন জানা যায়নি তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইডিওপ্যাথিক বলা হয়। তবে হিরোইন অ্যাডিকট রোগীদের এই রোগ দেখা যায়।

প্যাথলজি ঃ প্রথমের দিকে সাধারণত ডিপার (deeper) অর্থাৎ Juxtramedullary glomeruli গুলিতে Sclerotic পরিবর্তন দেখা যায় পরে অবশ্য সুপারফিসিয়াল গ্লোমেরুলাস গুলোতে পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রাথমিক অবস্থায় segmental sclerosis হয় পরে সমস্ত গ্লোমরুলাই sclerosis হয়ে যায়। ইমিউনোফ্লোরেসেনস IgM ও C_3 deposit দেখা যায় এবং ইলেকট্রোন মাইক্রোসকোপে কখনও কখনও বেজমেন্ট মেমব্রেন থিকনেছ বেড়ে যায় এবং মেসানিজয়াল এরিয়া বড় হয়।

banglainternet.com

ক্লিনিক্যাল কোর্স, প্রোগনোসিস --

এই রোগে সাধারণত রেমিশন ও রিলাপস হয়ে থাকে। তবে মিনিম্যাল চেঞ্জ ডিজিজ থেকে এর ব্যতিক্রম যে এই রোগে ৫-১০ বছরের মধ্যে ৫০% রোগীর ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর হয়ে মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

চিকিৎসা ঃ সিমটোমাটিক চিকিৎসা ছাড়া এর বিশেষ কোন চিকিৎসা নাই। সুতরাং খাদ্য, ডায়ুরেটিক, রক্তচাপ কন্ট্রোল ইত্যাদি করা হয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের সংযোজনের পর এই রোগ আবার হবার সম্ভাবনা থাকে।

মেমব্রেনাস গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস
(Membranous Glomerulonephritis MGN)

মেমব্রেনাস গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিসকে অনেকে মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি (Membranous Nephropathy MN) বলে থাকে। এই রোগের বিশেষত্ব হোল যে এতে গ্লোমারুলার বেজমেন্ট মেমব্রেন এর চওড়া (ThickNess) বেড়ে যায় এবং প্রস্রাবে আমিষ যায় যা কমও হতে পারে আবার বেশী পরিমানে আমিষ নির্গত হয়ে নেফ্রোটিকসিনড্রোমও করতে পারে। অনেকেরই ভুল ধারনা আছে যে মেমব্রেনাস গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস শুধু মাত্র নেফ্রোটিক সিণ্ড্রোম করে থাকে। প্রস্রাবে লোহিত কণিকা যেতে পারে এবং রক্ত চাপও বাড়তে পারে।

কারণ ঃ যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেমব্রেনাস গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর কারন বোঝা যায়না এবং সেই জন্যই ইডিওপ্যাথিক বা প্রাইমারী মেমব্রেনাস গ্লোমারুলোনেফাইটিস বলা হয়। এই রোগ অন্যান্ন অনেক কারনে হোতে পারে যেমন -ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, SLE, হজকিন্স ডিজিজ এবং ঔষধ দ্বারা যেমন গোল্ড, সল্ট, মারকারি, ডি-পেনিসিলামিন এবং ট্রাইমেথাডিওন ইত্যাদি।

প্যাথলজি ঃ আগেই বলা হয়েছে যে এই রোগে গ্লোমারুলার বেজমেন্ট মেমব্রেন এর থিকনেছ বেড়ে যায় এবং এর কারণ হোল বেজমেন্ট মেমব্রেনের মধ্যে ইলেকট্রন ডেন্স ম্যাটেরিয়াল জমা হওয়া এবং ইলেকট্রন ডেন্স ম্যাটেরিয়ালস এর জমার স্থান ও প্রকৃতি উপর নির্ভর করে মেমব্রেনাস নেফ্রাইটিসকে ৩ গ্রেডে ভাগ করা হোয়ে থাকে

banglainternet

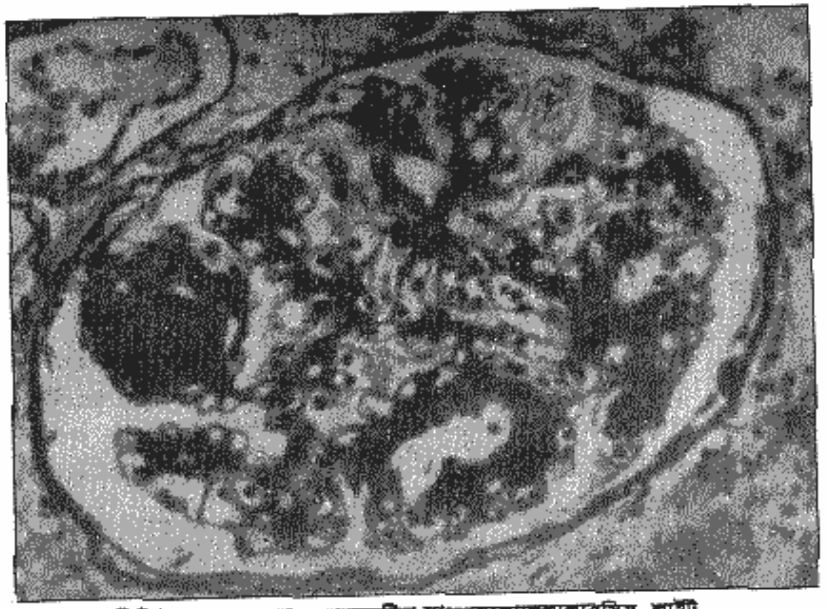

ছবি ১০ ডিফিউজ এবং নডুলার ডায়াবেটিক গ্লোমেরুলোস্কেলেরোসিস, লাইট মাইক্রোসকপিতে।

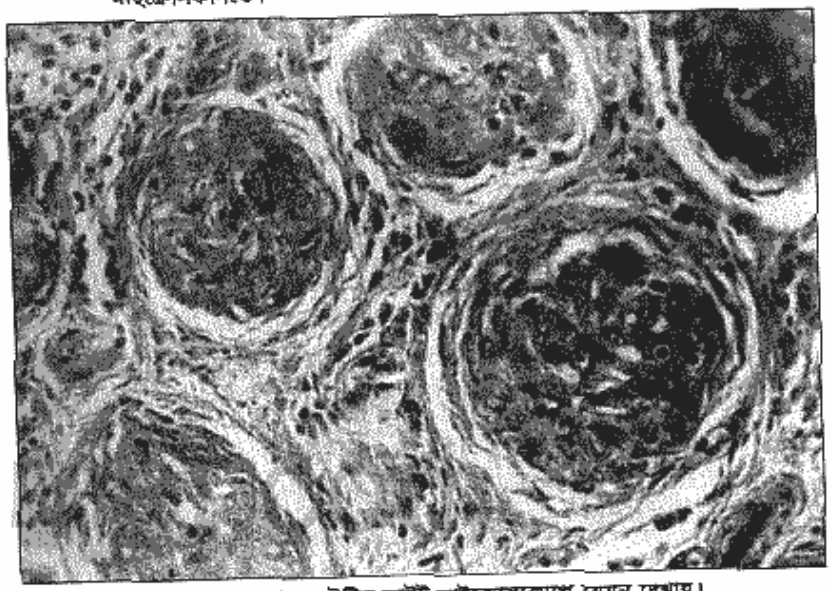

ছবি ১১ ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস লাইট মাইক্রোসকোপে যেমন দেখায়।

গ্রেড –১ ঃ এই ষ্টেজে লাইট মাইক্রোসকোপে গ্লোমারুলাস মোটামুটি স্বাভাবিক দেখালেও ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে সাব ইপিথেলিয়াল (Subepithelial) রিজিওন এ ইলেকট্রন ডেন্স ডিপোজিট দেখা যায়।

গ্রেড –২ ঃ এই গ্রেডে লাইট মাইক্রোসকপে গ্লোমারুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন এর মোট Thickness সমান ভাবে বেড়ে যায়। মেসাঞ্জিয়াল এরিয়া বেড়ে যায় এবং ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে ল্যামিনা ডেনসার আউটার সাইডে ইউনিফরম ভাবে ইলেকট্রন ডেন্স ম্যাটেরিয়ালস দেখা যায় এবং মধ্যে স্পাইক এর মত আকৃতি ও দেখা যায়।

গ্রেড – ৩ ঃ এই ষ্টেজে বেজমেন্ট মেমব্রেন থিকেনিং ইরেগুলার হয়, ইলেকট্রন ডেন্স ম্যাটেরিয়াল একটু লাইট হয় এবং মেমব্রেনের মাঝে বড় বড় ইলেকট্রন ডেন্স ম্যাটেরিয়াল দেখা যায়। এই গ্রেডে বেজমেন্ট মেমব্রেন অনেক সময় ভাগ হোয়ে রেল লাইনের মত double contur এর আকার ধারণ করে।

উপরোক্ত গ্রেডিং এনাক্ক ও চুরগ ১৯৬৮ সণে প্রকাশ করেন। তখন ধারনা ছিল যে মেমব্রেনাস গ্লোমারুলো নেফ্রাইটিস গ্রেড - ১ থেকে ক্রমাগত গ্রেড - ৩ এ চলে যায় তবে যেহেতু এই রোগের ও remission ও relapse আছে তাই বর্তমান এই গ্রেড গুলি ১ম গ্রেড কে relapse এর সময় এবং ২য় গ্রেড remission এর সময় একই রুগীর বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় বলে প্রমানিত হয়েছে। সুতরাং কিডনী বায়োপসি ছাড়া এই রোগের সঠিক ডায়াগনসিস সম্ভব নয়।

ক্লিনিক্যাল কোর্স ঃ

এই রোগ ৩০ – ৪০ বৎসর বয়স্কদের নেফ্রাইটিস রোগের শতকরা ২০ ভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে আর ও কম। এই রোগ শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে নেফ্রোটিক সিণ্ড্রোম হিসেবে প্রেজেন্ট করে এবং বাকী ৩০ % সিমটোমলেস প্রোটিনিউরিয়া, মাইক্রোসকপিক হেমাচুরিয়া হিসাবে Present করে। সাধারণত উচ্চ রক্ত চাপ এই রোগের প্রথমের দিকে দেখা যায় না। এই রোগে রক্তে C_3 এবং C_4 স্বাভাবিক থাকে।

মেমব্রেনাস গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর স্বাভাবিক ইতিহাস নিম্নরুপ হতে পারে ঃ –

১). ভাল হয়ে যাওয়া – শতকরা ২০ ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ এমনি ভাল হয়ে যায়। (Spontaneous Cure)

২). শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে একেবারে ভাল হয় না কমবেশি প্রোটিনিউরিয়া চলতে থাকে – (Symptomatic Proteinuria) র মত।

৩). শতকরা ২০ – ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থার মত নেফ্রোটিক রেঞ্জ প্রোটিনিউরিয়া চলতে থাকে কিন্তু ক্রনিক ফেইলিওর হয়না।

৪) শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর করে থাকে

প্যাথোজেনেসিস ঃ

এই রোগ সাধারণত ইমিউন কমপ্লেক্স (Immune Complex) এর জন্য হয় বলে বর্তমান ধারণা।

চিকিৎসা ঃ

সিমটোম্যাটিক অর্থাৎ ডায়ুরেটিক্স এবং খাবার এই রোগের চিকিৎসায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত রুগীদের বেশী প্রোটিন লস হয়ে থাকে কিন্তু রেনাল ফাংশন স্বাভাবিক আছে তাদের প্রোটিন খেতে দেয়া উচিত অবশ্য যাদের কিডনী ফাংশন কম তাদের খাদ্যে প্রোটিন কম করা উচিত। যেহেতু শতকরা ২০ ভাগ ক্ষেত্রে Spontaneous remission হতে পারে সুতরাং ধৈর্য্য ধরে এই রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে।

এই রোগের উপর যত কনট্রোলড ষ্টাডি হয়েছে তা থেকে স্টেরয়েড ট্রিটমেন্ট এর ব্যাপারে সঠিক কোন মতামতে এখনও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা একমত হোতে পারেন নি।

তবে যখন রোগী খুব বেশী Nephrotic হয় তখন বেশী ডোজে ষ্টেরয়েড যেমন Prednisolo ne 2mg/kg বডি ওয়েট ২ - ৩ মাস দেয়া যেতে পারে।

আর যখন কিডনী ফাংশন কমতে থাকে তখন ক্লোরাম বুসিল দিয়ে দেখা যেতে পারে। এই সমস্ত চিকিৎসার যে খারাপ দিক নাই তা নয়।

banglainternet.com

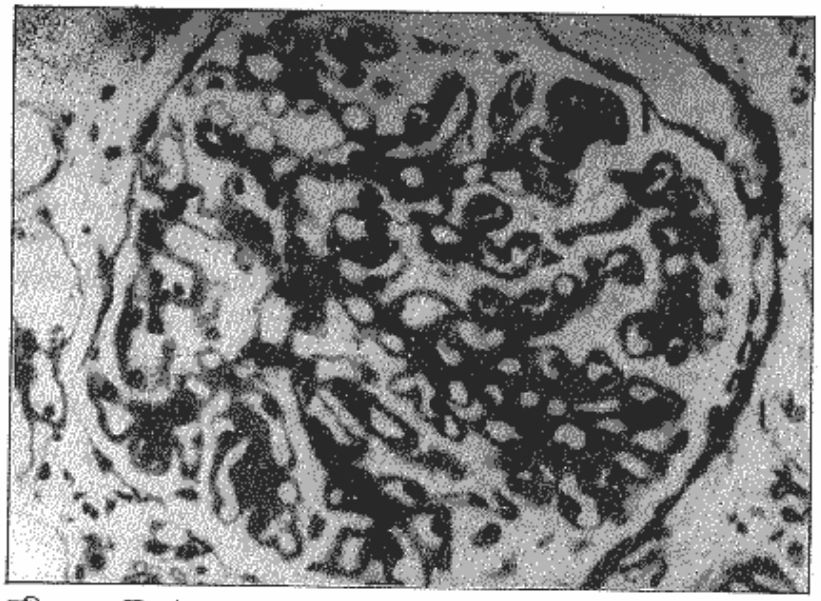

ছবি ১২ লাইট মাইক্রোসকপিতে মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলোনেফ্রাটিস যেমন দেখায়।

ছবি ১৩ প্রলিফারেটিভ গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস, লাইট মাইক্রোসকপিক ছবি।

সম্প্রতি "পন্টি ছেলি" রেজিম অর্থাৎ

Methyl Predinsolone 500 mg	৩দিন
Predinsolone 30 mg daily	২৭দিন
Chorambucil 10 mg daily	৩০দিন

দুইমাস এই Cycle পর পর পর ৩ বার অর্থাৎ ৬ মাস এর একটা Course দিলে মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথিতে অনেক ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে এই চিকিৎসার লংগ টারম ফলাফল জানা নেই।

প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস
(Proliferative Glomerulonephritis)

প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর বিশেষত্ব হোল যে এখানে মেসানজিয়াল কোষ অথবা এনডোথেলিয়াল বা ইপিথেলিয়াল কোষ এর প্রোলিফারেশন থাকে। এই প্রোলিফারেশন যখন কিছু কিছু গ্লোমারিউলাসকে আক্রান্ত করে তাকে ফোকাল প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস বলে আর যখন সমস্ত গ্লোমারুলাই ইনভলভ করে তখন ডিফিউজ প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস বলে । যখন এই সেল প্রলিফারেশান এর সংগে গ্লোমারুলার বেজমেন্ট থিকনেছ বেড়ে যায় তাকে মেমব্রেনো প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলো নেফ্রাইটিস বলে আবার যখন ক্রিসেন্ট তৈরী হয় তাকে ক্রিসেন্ট্রিক বা র‍্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস বলে।

কারণ ঃ প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস

১) ইডিওপ্যাথিক হোতে পারে অথবা

২) অনেক সেকেণ্ডারি কারনে হোতে পারে যেমন –

ক) পোষ্ট ষ্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস

খ) এস, এল, ই.

গ) ইনফেকটিভ এণ্ডোকারডাইটিস

ঘ) সান্ট নেফ্রাইটিস ইত্যাদি।

প্যাথোলজি ঃ প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস খুব কম অর্থাৎ মিনিম্যাল প্রোলিফারেশন, ফোকাল প্রোলিফারেশন বা ডিফিউজ প্রোলিফারেশন হতে পারে। ডিফিউজ প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস

internet.com

এ ক্রিসেন্ট (Cresent) হোতে পারে। প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এ মেসাঞ্জিয়াল কোষ প্রোলিফারেশন হোতে পারে এবং এর সংগে ফাইব্রিন ডিপোজিশন ও নেক্রোসিস থাকতে পারে। প্রোগেসিভ ডিজিজ এর ক্ষেত্রে গ্লোমারুলার স্কেলেরোসিস থাকে। ইমিউনো ফ্লোরেসেন্ট মাইক্রোসকোপে ইমিউনো গ্লোবিউলিন এবং কমপ্লিমেন্ট ডিপোজিশন থাকে।

ক্লিনিক্যাল কোর্স ঃ

প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর প্রেজেন্টেশন ----

(ক) এ্যাকুট নেফ্রোটিক সিণ্ডোম হোতে পারে

(খ) নেফ্রোটিক সিণ্ডোম হোতে পারে।

(গ) ক্রনিক রেনাল ফেয়লিওর হোতে পারে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগ প্রোগ্রেসিভ কোর্স বহন করে এবং ক্রনিক রেনাল ফেয়ালিওর করে। তবে সেকেণ্ডারি প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস যেমন স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমারুলো নেফ্রাইটিস এর প্রোগনোসিস ভাল।

চিকিৎসা ঃ এই রোগে Prednisolone, Cyclophosphamide, Heparin, Indomethacin ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু কোন চিকিৎসাতে এর ভাল ফল হয় বলে মনে হয় না। তাই সিমপ্টোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট যেমন খাবার, ডায়ুরেটিক এবং রক্ত চাপ কন্ট্রোল করা এই রোগের ক্ষেত্রে জরুরী।

মেমব্রেনো প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস
(Membrano Proliferative Glomerulonephritis)

এই রোগের আর একটি নাম মেছানজিও প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস। এই রোগের প্রকাশ সমস্ত গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর ১০ ২, শিশুদের মধ্যে ৭২ এবং বড়দের মধ্যে ১২২। এই রোগ ৫ বৎসর বয়স থেকে ৩০ বছর বয়স পর্য্যন্ত দেখা যায়।

কারণ ঃ প্রধানত ইডিওপ্যাথিক অবশ্য অনেক সময় এস, এল, ই নেফ্রাইটিসও এটা দেখা যায়।

প্যাথোজেনেসিস এবং প্যাথলজি ঃ –

মেমব্রেনো প্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস দুই রকমের দেখা যায়।

(১) টাইপ - ১

(২) টাইপ - ২

টাইপ – ১ (এম, পি, জি, এন)

এই টাইপে C_1q & C_4 কমে এবং খুব সম্ভব ইমিউনকমপ্লেক্স ক্লাসিক্যাল কমপ্লিমেন্ট পাথওয়েকে এ্যাকটিভেট করে। এই রোগে মেসাঞ্জিয়াল কোষ প্রোলিফারেট করে এবং গ্লোমারুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন থিক হয় এবং IgG, IgM, C_3 depositon পাওয়া যায়।

ইলেকট্রন মইক্রোসকোপে সাবএণ্ডোথেলিয়াল ডেনস ডিপোজিট পাওয়া যায়। রক্তে C_3, NEF অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

টাইপ – ২

এখানে C_3 কমে এবং alternate Complement Pathway কার্য্যকর করে এই রোগ হয়। এই রোগে মেসাঞ্জিয়াল এরিয়াতে C_3 জমা হয়ে থাকে এবং রক্তে ও C_3 কমে থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে এ টানা ডেন্স ডিপোজিট থাকে। এই রোগে C_3 NEF বেশী রোগীদের পাওয়া যায় এবং পার্সিয়াল লাইপোডিষ্ট্রোফি থাকতে পারে। ট্রান্সপ্লান্টেশনের পরে এই রোগ recurr করে। যেহেতু C_2 এবং C_4 deficiency দের এই রোগ হোতে দেখা যায় তাই অনেকের মতে প্রধানত Complement এর কমতি বা deficiency র জন্য এই রোগ হয় বলে ধারনা। এই রোগকে হাইপোকমপ্লিমেন্টারিক নেফ্রাইটিসও বলা হয়। ক্লিনিক্যাল কোর্স – নেফ্রোটিক সিণ্ড্রোম হিসেবেই বেশী Present করে কিন্তু অন্য যে কোন ভাবে Present করতে পারে এবং বেশীর ভাগ রোগী আস্তে আস্তে ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর এ যায়। ১০ বছরে শতকরা ৪০ ভাগ রোগী বাঁচে।

চিকিৎসা ঃ সিমপটোম্যাটিক।

গুড পাসটিওরস সিণ্ড্রোম
(Good Pasteurs Syndrome)

এই রোগে এক সংগে ফুসফুস (Lung) ও কিডনী আক্রান্ত করে। এই রোগ সাধারণত কোন ইনফেকশন – যেমন ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাস ইনফেকশন এর পর Present করে। এখানে রুগীর কাশিতে রক্ত আসে এবং খুব ফুলমিনেটিং GN হয়ে এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর হয়।

banglainternet.com

চিকিৎসা ঃ

১) প্রেসার এর চিকিৎসা এবং সাইটোটক্সিক এজেন্ট

২) প্লাজমাফোরেসিস

৩) উভয় পার্শ্বের কিডনী ফেলে দেওয়া, (৯৫ ২)রোগী মারা যায়।

র‍্যাপিডলি প্রগ্রেসিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস
(RPGN)

গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস প্রাইমারী হোক বা সেকেণ্ডারী হোক যখন ক্লিনিক্যাল কোর্স খুব rapid হয় তখন গ্লোমেরলাই গুলো অতিদ্রুত নষ্ট হ'য়ে যায় এবং রোগের শুরু থেকে সপ্তাহ বা মাসের মধ্যেই দুটো কিডনীকে একেবারে নষ্ট করে দেয় তাকেই র‍্যাপিডলি প্রোগ্রোসিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস বলে।

কারণঃ
- প্রাইমারী গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর মধ্যে ডিফিউজ প্রেলিফারেটিভ
- গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস উইথ ক্রিসেন্ট (Crescent) এবং
- মেমব্রেনোপ্রোলিফারেটিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস।

২) সেকেণ্ডারী গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস যেমন এস, এল, ই, পোষ্টস্ট্রেপটোকক্কাল নেফ্রাইটিস ইত্যাদি ।

৩) গুডপাস্তর সিনড্রোম।

প্যাথজেনেসিস ঃ

প্রাইমারী গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর মতই দুই ভাবে যেমন (ক) ইমিউন কমপ্লেক্স এবং (ক) এন্টি গ্লোমেরুলার বেজমেন্টমেমব্রেন এন্টিবডি মেকানিজম এর দ্বারা।

প্যাথলজি ঃ

গ্লোমারুলাই গুলোর এনডোথেলিয়াল ও ইপিথেলিয়াল সেল গুলো প্রলিফারেট করে ক্রিসেন্ট তৈরী করে এবং IgM ও কমপ্লিমেন্ট ডিপোজিশান পাওয়া যায়।

চিকিৎসা ঃ এ রোগকে এ্যাকুট মেডিক্যাল এমারজেন্সী হিসেবে চিকিৎসা করা উচিত।

১) হাসপাতালে ভর্ত্তি করা উচিত।

২) ডায়ুরেটিক ও রক্তচাপের ঔষধ প্রয়োগ ।

৩) কম্বিনেশান থেয়াপী।

(ক) ষ্টেরয়েড প্রেডনিসলোন ৪০ - ৬০ মিলি গ্রাম / প্রত্যহ

(খ) সাইটোটক্সিক ড্রাগ এনডোকসান ২ মিলি গ্রাম/ প্রতিদিন

(গ) হেপারিন ২ মিলি গ্রাম প্রতি কিলো গ্রাম বডি ওয়েট

৪) পালস থেরাপী – IgM প্রতিদিন ৩ দিন।

৫) প্লাজমাফোরেসিস

৬) ডায়ালাইসিস।

প্রোগনোসিস

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই র‍্যাপিডলি প্রোগেসিভ গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস কোন চিকিৎসাতেই respond করতে চায়না এবং রুগীকে অবশেষে ডায়ালাইসিস দ্বারা বাঁচাতে হয়।

আই, জি, এ, নেফ্রোপ্যাথি
(IgA Nephropathy)

১৯৬৮ সনে প্রথমে বারজার এই রোগ সম্বন্ধে প্রকাশ করার পর আজকে অনেক দেশেই এই রোগ পাওয়া যায়। IgA নেফ্রোপ্যাথি এবং আগে বারজার নেফ্রোপ্যাথী যাকে বলা হত তা প্রধান প্রাইমারী গ্লোমারুলো নেফ্রাইটিস বলে স্বীকৃত যেমন সিঙ্গাপুর, জাপান এবং ফ্রান্সে। আমাদের দেশেও এখন এই রোগ দেখা যাচ্ছে।

এই রোগের কোন কারন আজ অবধি বলা যায়নি, তবে অনেক সময় সর্দি কাশির পরই এই রোগ দেখা দেয়।

ক্লিনিকাল প্রেজেন্টেশন ঃ

এই রোগ অধিকাংশ সময়ে সিমটোমলেস হেমাচুরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে যা কিনা মাইক্রোসকপিক অথবা gross হতে পারে এবং এই হেমাচুরিয়া মাঝে মাঝে হয় এবং মধ্যবর্তী সময়ে কোন হেমাচুরিয়া বা দোষ পাওয়া যায়না।

দ্বিতীয় ঃ প্রোটিনিউরিয়া হতে পারে সেটাও মাঝে মাঝে হতে পারে তবে অনেক সময়ই প্রোটিনিয়াউরিয়া বেশী পরিমানে (২ গ্রাম এর বেশী / ২৪ ঘন্টায় হতে পারে) হয়।

banglainternet.com

রক্তচাপও বাড়াতে পারে। যদিও আগে ধারণা করা হত এই রোগ একটি বেনাইন কণ্ডিশন কিন্তু ৫ - ১৫ বছর অর্থাৎ Longterm followup করলে দেখা যায় শতকরা ২০ - ২৫ জন রুগী ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর develop করে।

প্যাথোজেনেসিস ও প্যাথলজি ঃ

অন্যান্য প্রাইমারী গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এর মত এই রোগের ও প্যাথোজেনেসিস ইমিউনোলজিক্যাল। এই রোগে IgA deposition পাওয়া যায় গ্লোমারুলাস এর মেসেঞ্জিয়াল এরিয়াতে এবং মেসাঞ্জিয়াল এরিয়াতে কোষ (Cell) প্রলিফারেট করে। অনেক সময় সেলুলার প্রলিফারেশান খুব বেশী হতে পারে। সুতরাং এই রোগ সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে হলে প্রথমতঃ চিকিৎসকদের এই রোগ সম্বন্ধে সন্দহ করতে হবে এবং কিডনী বায়োপসি করতে হবে। কিডনী বায়োপসি ইমিনোফ্লুরোসেন্স টেকনিকে পরীক্ষা করে যদি মেসাঞ্জিয়াল এরিয়াতে IgA deposition পাওয়া যায় তাহলেই একে IgA nephropathy বলা হয়। অন্যান্য কারন যাতে মেসাঞ্জিয়াল এরিয়াতে IgA deposition পাওয়া যায় তা হোল Henoch SchoNelein পারপুরা এবং সিরোসিস অব লিভার। তবে এই রোগ দুটির সিসটেমিক ম্যানিফেস্টেশান থাকে কিন্তু IgA নেফ্রোপ্যাথিতে কোন সিসটেমিক ম্যানিফেস্টেশান থাকে না।

চিকিৎসা ঃ সিম্পটোম্যাটিক

স্পেশিফিক কোন চিকিৎসা নাই।

২য় অধ্যায়

৪র্থ পরিচ্ছেদ

কিডনী সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য কিছু সিসটেমিক রোগ

(SOME IMPORTANT SYSTEMIC DISEASES ASSOCIATED WITH KIDNEY DISEASE)

ঃ এস, এল, ই (SLE) ঃ

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
মতিউর রহমান

বহু ইমিউনোলজিক্যালী মেডিয়েটেড মেটাবোলিক এবং হেয়ারিডিটারি ডিজঅর্ডারস এর সংগে গ্লোমেরুলার ইনজুরী সম্পৃক্ত থাকে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল এস, এল, ই, ডায়াবেটিস মেলাইটাস এবং হাইপারটেনশান। ডায়াবেটিস মেলাইটাস ও হাইপারটেনশান সম্পর্কে অন্য পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এস, এল, ই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। এস,এল, ই, একটি মাল্টিসিস্টেম রোগ যার উৎপত্তি অটোইমুউন এবং কারণ অজানা। এর প্রধান বৈশিষ্ট হোল অটো এন্টি বডির প্রডাকশন বিশেষত যারা নিউক্লিয়ার, সাইটোপ্লাজমিক এবং সেল মেমব্রেন এন্টিজেনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে। নীচের লক্ষণ সমুহের কয়েকটি নিয়ে সাধারণত রোগীরা চিকিৎসকের শরনাপন্ন হয়। যেমন এনিমিয়া, ফ্যাটিগ, ফিভার, র‍্যাশ, এলোপেশিয়া, আর্থাইটিস, পেরি কাডাইটিস, প্লুরেসি, ভাসকুলাইটিস, নেফ্রাইটিস এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিসটেম ডিজিজ।এটা একুট বা ইনসিডিয়াস ভাবে শুরু হয় এবং রিমিটিং এবং রিলাপসিংকোর্স অনুসরণ করেক্রনিক ডিজিজ হিসেবেও আত্ম প্রকাশ করতে পারে। শরীরের যে কোন অর্গান বা সিসটেম আক্রান্ত হতে পারে। এমন কোন ক্লিনিক্যাল এবনরমালিটি বা একক কোন ল্যাবরেটরী টেষ্ট নেই যা দিয়ে এই রোগ নির্দিষ্ট

banglainternet.com

ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এস,এল, ই, রেশীর ভাগ মেয়েদের রোগ (পুরুষএবং মহিলার অনুপাত ১ঃ৯) এবং ২০ থেকে ৪০ বৎসরের মেয়েদের এটা বেশী হয়ে থাকে। তবে ছোট বেলা থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত যে কোন বয়সেই এটা হতে পারে। এটা আমেরিকান কালোদের মধ্যে ককেশিয়ানদের তুলনায় তিনগুন বেশী হয় এবং ওরিয়েন্টাল লোকদের আমেরিকার কালোদের তুলনায় কম হয়। এর থেকে ধারণা করা হয় যে এই রোগের উৎপত্তির পিছনে জেনেটিক ফ্যাকটর এবং সেক্স হরমোনের প্রভাব আছে। পরিবারের কোন সদস্যের এস,এল, ই, থাকলে অন্য সদস্যদের (৩০% আইডেন্টিক্যাল টুইন এবং ৫ % ফাষ্ট ডিগ্রী রিলেটিভ) এই বর্ণিত হারে এস,এল, ই, হওয়ার সম্ভাবণা থাকে। বহুমুখি উপসর্গ এবং লক্ষনের জন্য এস,এল, ই, রোগ নির্ণয়ের জন্য এস,এল, ই, রোগ নির্ণয়ের ক্রাইটেরিয়া প্রনিত হয়েছে (পরে বর্ণনা করা হয়েছে) যার মধ্যে এস,এল, ই, রোগীদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিন্তু অন্য রোগের রোগীদের পৃথকী করণ করা সম্ভব হবে। এ সমস্ত ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল মোলাররয়্যাশ, ডিসকয়েড র‍্যাশ, ফটোসেনসিটিভিটি, ওরাল আলসার, আর্থাইটিস, সিরোসাইটিস, নিউরোলেজিক ডিসঅর্ডারস, *হেমাটলজিক* ডিসঅর্ডারস, হেমোরেজিক ডিজঅর্ডারস, ইমিউনোলজিক ডিসঅর্ডারস, এবং এন্টি নিউক্লিয়ার এন্টি বডি। এই রোগের নামের উৎপত্তি হয়েছে (Lupus = Wolf) নেকড়ের মুখের র‍্যাশ, যা এর মোলার এমিনেন্স এর উপর দেখা যায় সেখানে থেকে।

কারণ ঃ এস,এল, ই, রোগের প্রকৃত কারণ অজানা। তবে এর লক্ষনগুলো সাধারণতঃ অটো এন্টিবডির তৈরীর কারণে (যা শরীরে অন্য কনস্টিটুয়েন্টস এর সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে ইনফ্লামেটরী রেসপন্স তৈরী করে) হয়ে থাকে। এই ইনিসিয়েশন এর প্রক্রিয়াটা সম্ভবতঃ মাল্টি ফ্যাকটোরিয়াল যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গুলো নীচে বর্ণনা করা হলো।

(ক) জেনেটিক ফ্যাকটর -- নির্দিষ্ট কোন জিনের প্রভাবে রোগীর এন্টিবডি রেসপন্স খুব দ্রুত হয় বিভিন্ন ষ্টিমুলাই এর বিপরীতে অথবা জিন এর প্রভাবে কোন বিশেষ অটো এন্টিবডি তৈরী হয়।

(খ) হরমোন,মেটাবলিক এবং এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাকটর – মনে করা হয় যে, পুরুষদের এণ্ড্রোজেনের প্রভাবে এস,এল, ই, কম হয়। এর ব্যতিক্রম হলো পুরুষের ঐ সাব গ্রুপ যারা তাদের পিতাদের কাছ থেকে Y ক্রোমোজোম একসিলারেটিং ফ্যাকটর নিয়ে আসে। এণ্ড্রোজেন সম্ভবত এস,এল, ই, প্রকাশ করতে সাহায্যে করে। সাধারণ ভাবে যে সমস্ত ফ্যাকটর ইমিউনিটি ত্বরান্বিত করে তাদের এই রোগ দ্রুত প্রকাশ পায়, কিন্তু যাদের এই প্রক্রিয়া শ্লথ তাদের এই রোগ প্রকাশ বিলম্বিত হবে। কোন কোন রোগীর ইমিউন

সিষ্টেম এর প্রাইমারী এবনরমালিটির কারনে স্বাভাবিক সেলফরেগুলেটরী কাজ সুষ্ঠু ভাবে হয় না।

(গ) কিছু কিছু ঔষধ যার তালিকা নীচে দেওয়া হলো এস,এল, ই, এর মত রোগ তৈরী করতে পারে। *কোন কোন খাবারে উপস্থিত কেমিক্যাল* এর কারনেও এস,এল, ই, হতে পারে যেমন আলফা স্প্রাউট যার মধ্যে L-Canavanine আছে এস,এল, ইর মত রোগ তৈরী করতে পারে।

(ঘ) কম্প্লিমেন্ট ডেফিসিয়েন্সি ঃ কমপ্লিমেন্ট ডেফিসিয়েন্সির কারণে এস,এল, ই, হতে পারে বিশেষত C2 এবং C4 স্বল্পতার কারণে।

(ঙ) ভাইরাস ঃ লুপাস ভাইরাস নামক এক ভাইরাসের কারণে এই রোগ জন্ম হতে পারে। এস,এল, ই, রোগীর কিডনীর এপ্তোথেলিয়াল সেল এবং লিমফোসাইটের মধ্যে ভাইরাল নিওক্লিও ক্যাপসিড এর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়াও রেট্রোভাইরাস দিয়ে প্রাণীর মডেলে এস,এল, ইর মত ডিজঅর্ডারস তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

(চ) কোন কোন রোগীর আলট্রাভায়োলেট রশ্মির এক্সপোজার বেশী *হওয়ার কারণে এস,এল, ই, হওয়ায়, এই আলট্রা ভায়োলেট রশ্মিকেও* এই রোগের জন্ম এর জন্য দায়ী করা হয়ে থাকে।

যে সমস্ত ঔষধ এস,এল, ইর ফিচার ইনডিউস করতে পারে

মাত্রা এবং সময় নির্ভর শীল		ইডিওসিনক্রেটিক
হাইড্রোলাজিন	প্রিমিডোন	এমাইনোস্যালিসাইলিক এসিড
প্রোকেইনামাইড	ইথোসাক্সিমাইড	জি পেনিসিলামাইন
আলফা মিথাইল ডোপা		কার্বামাজেপাইন
	গ্রাইসোফুলভিন	
আইসো নিয়াজিড	ফেনাইল ইথানল	পেনিসিলিন
ক্লোরপ্রোমাজাইন	এসিটাইল ইউরিয়া	এমপিসিলিন
ক্লোরথালিডোন		ট্রেপটোমাইসিন
ফেনাইটয়েন		সালফোনামাইড
মেফানাইট্রয়েন		টেট্রোসাইক্লিন
ট্রাইমেথাডিওন		মিথাইল ইউরাশিল
		ফেনাইলবুটাজন

banglainternet.com

ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেষ্টেশান

এস,এল, ই, রোগের উৎপত্তি ও কোর্স খুবই জটীলএবং তারতম্য পূর্ণ। কোন রোগী হয়ত বাটার ফ্লাই র‍্যাশ, সান সেনসিটিভিটি, আর্থাইটিস, ফিভার, ফেটাইগ , সিজারস এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম নিয়ে অর্থাৎ টিপিক্যাল প্রেজেনটেশন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এটা খুব কম সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক লক্ষণ নিয়ে এ রোগ প্রকাশ পায় যেমন আর্থাইটিস এবং ফেটিগ। যার ফলে প্রাথমিক ভাবে বেশীর ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে কোন ডেফিনিটিভ ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হয় না। ফলে কোন রোগীর উপসর্গের সঙ্গে অন্য কোন কোন রোগীর মিল থাকতেও পারে বা নাও থাকতে পারে। অনেক রোগীর কোন অর্গান ইনভলভমেন্ট থাকে না। কারও কিডনী এফেকটেড হয় কিন্তু সেন্ট্রাল নার্ভাস সিসটেম হয় না আবার অনেকের উল্টোটাও হতে পারে। অনেক সময় সিরোলজিক ফাইণ্ডিং এবং ক্লিনিক্যাল মেনিফেষ্টেশান এর যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন যাদের এন্টি DNA প্রচুর পরিমানে তৈরী হয় তাদের রেনাল ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবণা বেশী। যাদের SS-A এবং SS-B এন্টিবডি বেশী তৈরী হয় তাদের সিকাসিনড্রোম, মাসল ডিজিজ, লাংগ ডিজিজ বেশী হয় কিন্তু রেনাল ডিজিজ কম হয় বা হয়ই না।

বেশীর ভাগ রোগীর কনষ্টিটিউশনাল সিমপটোমের মধ্যে ফেটিগ , জ্বর, ওজন কমা বেশী পরিলক্ষিতহয়। একটি নির্দিষ্ট উপসর্গের মধ্যে আর্থালজিয়া উল্লেখযোগ্য। এই লক্ষন রিউমাটয়েড আর্থাইটিস রোগীদের তুলনায় বেশী ট্রাজিটরী কয়েক মিনিট থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় একটি জয়েন্টে। বহুদিন ধরে থাকলে রোগীর ব্যথা সবসময়ই থাকে এবং ক্রাঙ্ক আর্থাইটিস ডেভেলপ করে। এটা সিমেট্রিক এবং হাতের প্রক্সিম্যাল ইন্টারফ্যালানজিয়াল জয়েন্ট, মেটাকারপো ফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, রিষ্ট এবং হাঁটুতে বেশী হয়। মরনিং ষ্টিফনেস কিছু রোগীর হতে পারে যাদের এস,এল, ই,সম্পৃক্ত অন্য জয়েন্ট ডিজিজ থাকে। কোন কোন সময় একিলিস বা কোয়াড্রিসেপস ছিড়ে যেতে পারে।ম্যায়ালজিয়াও ৩০% রোগীর থাকতে পারে।

টিপিক্যাল বাটার ফ্লাই র‍্যাশ হালকা থেকে পরিস্কার ইডিম্যাটাস, নন প্যাপুলার, এরিথিম্যাটাস র‍্যাশ হিসেবে দুই গালের এবং নাকের ব্রিজের উপর প্রকাশ পায়। এটা রৌদ্রবেশী উজ্জ্বলতা পায় এ ছাড়াও ম্যাকুলোপ্যাপুলার র‍্যাশও অনেক রোগীর প্রকাশ পেতে পারে। এটা ঔষধের প্রতিক্রিয়ার কারণে যে র‍্যাশ হয় অনেকটা দেখতে তার মতন তবে সূর্য্য রোদে

এই র‍্যাশ ব্যাপ্তি লাভ করে। এস,এল, ই, রোগী যাদের সংযুক্ত ডিসকয়েড লুপাস থাকেতাদের সংগে শুধু ডিসকয়েড লুপাসের পৃথকীকরণ অনেক সময় সম্ভব হয় না। তবে লুপাস বহুদিন ধরে থাকলে এদের সিস্টেমিক ইনভলবমেন্ট হতে পারে। $\frac{১}{৫}$ রোগীর চামড়ার ভাসকুলাইটিক লেসিওন হতে পারে। এটা সাধারণতঃ আংগুলের ডগায়, হাতে, ঠোটে বা পায়ে হয়ে থাকে। চুল পড়ে টাক হয়ে অনেক রোগীর। বেশীর ভাগ চুল গজায় তবে ডিসকয়েড লেসিওনের জায়গা ছাড়া। রেনাউডস ফেনোমেনা হয়ে ডিজিটাল গ্যাংরিন হয় এবং পরবর্তীতে এমপুটেশন হয়ে যায় বহুরোগীর । ১০% রোগীর থ্রম্বোফ্লেবাইটিস হয়ে যেতে পারে।

কনজাংটিভাইটিস, ইপিস্কেলেরাইটিস বা উভয়েই অনেক অল্প বয়স্ক রোগীর রোগ ছাড়া প্রকাশের সময় প্রকাশ পেতে পারে। সাইটরেট বডি (রেটিনাল ভেসেল একজুডেটসহ) একটিভ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিষ্টেম ইনভলভমেন্ট হিসেবে দেখা দিতে পারে। রেটিনাল ভেসেল এর স্পাজমএর কারণে ট্রাণজিয়েন্ট বা স্থায়ী অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। কিন্তু রোগীর কেরাটোকনজাংটিভাইটিসও হতে পারে।

গ্যাষ্ট্রোইনেটসটিনাল সিমপটোমের মধ্যে এনোরেক্সিয়া, নসিয়া, বমি এবং পেটে ব্যাথা, কম সংখ্যক রোগীর বেলায় প্রকাশ পেতে পারে। ডিফিউজ এবডোমিনাল পেইন সাধারণতঃ সিরোসাইটিস বা মেজেনট্রিক আর্টিরাইটিস হওয়ার কারণে দেখা দিতে পারে। এর ফলে অনেক রোগীর ইন্টেসটিনাল ইনফ্রাকট এর কারণে পারফোরেশান হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। অনেকের ডিসফাজিয়া থাকতে পারে সংগে এসোফেগাসের আলসার ক্যানডিডা ইনফেকশান সহ থাকতে পারে।

অর্গান ইনভলবমেন্ট

লিভার --লিভার এনলার্জমেন্ট খুব কমন কিন্তু তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়। এর সঙ্গে ফ্যাটিইনফিলট্রেশান থাকতে পারে। লিভার এনজাইম এর মান প্রাথমিক ভাবে বাড়তে পারে। এস,এল, ইর কিছু সংখ্যক রোগীর সংযুক্ত ক্রনিক হেপাটাইটিস থাকতে পারে।

হার্ট --পেরিকার্ডাইটিস সাধারণত লক্ষণযুক্ত হয়। ECG করলে নন স্পেশিফিক T ওয়েভ চেঞ্জ থাকতে পারে। প্রলংগড P-R ইন্টারভাল বা ইসকেমিয়া ও ইনফারকশান এর লক্ষনও ধরা পড়তে পারে। খুব মারাত্মক ক্ষেত্রে হার্ট ফেইলিওর ডেভেলপ করে। করোনারি আর্টারির রোগের কারণে

banglainternet.com

মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন হতে পারে।

লাংগ –প্লুরাইটিক পেইন , নিউমোনাইটিস, ডিফিউজ ইন্টারষ্টিশিয়াল নিউমোনাইটিস এবং কনসোলিডেশন, হাইপোক্সিয়া হয়ে এস,এল, ই রোগীদের হতে পারে।

হেমাটলজিক এবং লিমফোরেটিকুলার অসুবিধা ঃ– লিমফাডেনোপ্যাথী এবং স্পিলিনোমেগালী হয়ে লিমফোপ্রলিফারেটিভ ডিসঅর্ডার মনে হতে পারে। নর্মোসাইটিক এনিমিয়া হতে পারে তবে কুম্বস টেষ্ট পজিটিভ হতেও পারে বা নাও পারে। অনেক রোগীর ব্লিডিং ডিসঅর্ডার হতে পারে। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এবং PTT টেষ্ট প্রলংগড হতে পারে।

নার্ভাস সিষ্টেম ঃ– পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথী অন্যান্ন নার্ভাস সিসটেম ইনভলবমেন্ট ছাড়া ১৫% এস,এল, ই রোগীর দেখা দিতে পারে। সেনসরি নিউরোপ্যাথী ছাড়াও ফুটড্রপও থাকতে পারে।

সেন্ট্রাল নার্ভাস সিসটেম ইনভলবমেন্ট এর মধ্যে সাইকোসিস, সিজার, মাইগ্রেন , হেডেকস সংযুক্ত থাকতে পারে। অর্গানিক ব্রেন লেসিওন থাকলে রোগী অচেতনতায় চলে যাবে। ট্রানভার্স মাইলাইটিস এবং প্যারালাইসিস হতে পারে ইন্ট্রাসেরিব্রাল হেমোরেজ বা থ্রম্বোসিস এর কারণে ।

কিডনী ডিজিজ ঃ– বেশীর ভাগ এস,এল, ই রোগীর কিছুনা কিছু রেনাল ইনভলবমেন্ট থাকেই। অনেকের বেলায় এই পরিবর্তন এত স্বল্প যে তা ক্লিনিক্যাল ডিটেকশনে ধরা পড়ে না। অনেকের ক্লিনিক্যালী ডিটেকটেবল কিন্তু ফাংশনাল রেনাল ইমপেয়ারমেন্ট হয় না। খুব স্বল্প সংখ্যক রোগীদের বেলায় হাইপারটেনশান এবং রেনাল ইনভলবমেন্ট রোগীর জীবনের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। লাইট মাইক্রোসকপিতে ৬০ % থেকে ৭০% রোগীর কিডনীতে পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু যদি ইমিউনোফ্লুরেসেন্স মাইক্রোসকপি বা ইলেকট্রন মাইক্রোসকপি করা হয় তাহলে প্রায় সব এস,এল, ইর রোগীর কিডনীতে কোন না কোন পরিবর্তন দেখা যাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মর্ফোলজিক ক্লাসিফিকেশান অনুযায়ী লুপাস নেফ্রাইটিস এর পরিবর্তন সমূহকে ৫ ভাগে বর্ণনা করা যায়।

(ক) লাইট, ইলেকট্রোন এবং ইমিনুফ্লুরোসেন্স মাইক্রোসকপিতে কোন পরিবর্তন নাই (ক্লাশ –১)

(খ) মেসানজিয়াল লুপাস নেফ্রাইটিস (ক্লাশ –২) এ সমস্ত রোগীর ক্লিনিক্যাল হেমাচুরিয়া এবং প্রটিনিউরিয়া থাকে । খুব সামান্য

ইন্টারক্যাপিলারী মেসানজিয়াল মেট্রিক্স এবং মেসনিজিয়াল সেল এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইমিউনোগ্লোবিউলিন এবং কমপ্লিমেন্ট এর গ্রানুলার ডিপোজিট উপস্থিত থাকে।

(গ) ফোকাল প্রলিফারেটিভ গ্লোমেরুলার লেসিওন (ক্লাস–৩) $\frac{১}{৫}$ অংশ এস,এল, ই রোগীর প্রথম বায়োপসিতে এই পরিবর্তন পাওয়া যায়। গ্লোমেরুলাসের ৫০% কম এবং প্রত্যেক গ্লোমেরুলাসের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ইডিমা হয়। এণ্ডোথেলিয়াল ও মেসানজিয়াল সেলের প্রলিফারেশন হয়।

(ঘ) ডিফিউজ প্রলিফারেটিভগ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস (ক্লাশ –৪) -- এস,এল,ইর রেনাল লেসিওনের মধ্যে মারাত্মক এবং খুব কমন। ৪০–৫০% এস,এল, ই রোগীর রেনাল বায়োপসিতে এটা পাওয়া যায়। এণ্ডোথেলিয়াল, মেসানজিয়াল এবং কোন কোন সময় ইপিথেলিয়াল সেল এর প্রলিফারেশন হয় এবং প্রায় সব বেশীর ভাগ গ্লোমেরুলাই হয়ে থাকে। এ সমস্ত রোগীর এস,এল, ইর লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় এবং এদের মাইক্রোসকপিক বা গ্রস হেমাচুরিয়া, প্রোটিনিউরিয়া, নেফ্রোটিকসিনড্রোম, হাইপারটেনশান ইত্যাদি সংযুক্ত থাকে।

(ঙ) মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস -- (ক্লাস – ৫) শতকরা ১০ % রোগীর এই পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। হিষ্টোলজিক্যালী ক্যাপিলারী ওয়াল এর ওয়াইস্প্রেড থিকেনিং হয় । এ সমস্ত রোগীর মারাত্মক প্রোটিনিউরিয়া বা নেফ্রোটিক সিনড্রোম থাকে।

রোগ নির্ণয় ঃ

(ক) ক্লিনিক্যাল ইতিহাস ঃ– যেহেতু SLE বেশীর ভাগ মেয়েদের হয় সে জন্য বিভিন্ন জয়েন্ট ব্যথা , প্রোটিনিউরিয়া নিয়ে রোগীরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়।

খ) ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা ঃ– যা রিউমেটয়েড আর্থাইটিস এর মত লক্ষণ প্রকাশ করে। এর ফলে অনেক রোগী রিউমেটয়েড আর্থাইটিস এর চিকিৎসা গ্রহণ করে এবং কোন উন্নতি হয় না।

গ) ল্যাবরেটারী পরীক্ষা ঃ– এস,এল, ইর কোন স্পেসিফিক রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা নেই। তবে ন্যাটিভ DNA এর বিপরীতে প্রচুর এন্টিবডির উপস্থিতি সাধারণত এ রোগের নির্দেশ করে। এছাড়াও রোগ নির্নয়ের অন্যান্য পরীক্ষা গুলো নীচে বর্ণনা করা হলো।

banglainternet.com

১। রক্ত ঃ– টি,সি,ডি,সি ই,এস,আর, হেমোগ্লোবিন , বিটিসিটি, প্লাটিলেট কাউন্ট, পিটিটি, এল, ই সেল, আর এ টেষ্ট, এন্টি নিউক্লিয়ার এন্টিবডি, এলবুমিনও গ্লোবিউলিন রেশিওসহ, ইউরিয়া , ক্রিয়েটিনিন, কমপ্লিমেন্ট (C_3 & C_4) , Anti DNA Anti body.

২। প্রস্রাব – রুটিন মাইক্রোসকপি, এলবুমিন, ২৪ ঘন্টার টোটাল প্রোটীন

ঘ) এক্সরে––আই,ভি, ইউ, চেষ্ট

ঙ) আল্ট্রাসনোগ্রাম ঃ– রেনাল ট্রাক্ট

চ) বায়োপসি ঃ রেণাল, স্কিন, অন্যান্ন অর্গান

(লাইট মাইক্রোসকপি, ইমিউনোফ্লুরোসেন্স মাইক্রোসকপি, ইলেকট্রন মাইক্রোসকপি)

ছ) ইসিজি

জ) ই ই জি

এছাড়াও নীচের ১১ টি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে কোন রোগীর ৪ বা ততোধিক ক্রাইটেরিয়া উপস্থিত থাকলেও এস,এল, ই বলে ধারণা করা সম্ভব ।

১) মোলার র‍্যাশ

২) ডিসকয়েড র‍্যাশ

৩) ফটোসেনসিটিভিটি

৪) ওরাল আলসার

৫) আর্থাইটিস

৬) সিরোসাইটিস

৭) রেনাল ডিসঅর্ডার

৮) নিউরোলজিক ডিসঅর্ডার

৯) হেমাটলজিক ডিসঅর্ডার

১০) ইমিউনোলজিক ডিসঅর্ডার

১১) এন্টিনিউক্লিয়ার এন্টিবডি

banglainternet.com

চিকিৎসা ঃ

(ক) রোগীর সাইকোলজিক্যাল চিকিৎসা। এস, এল ইর রোগীরা মানসিক ভাবে এবং শারীরিক ভাবে বিপর্যস্ত থাকে বলে মাঝে মাঝে এদের সংগে সাক্ষাৎ করে আশ্বস্ত করতে হবে, প্রয়োজন বোধে ঔষধ সহযোগেও।

(খ) আলট্রাভায়োলেট লাইট, এবং যে সমস্ত ঔষধের কারনে এস, এল,ইর মত রোগ হয় সেগুলো পরিহার করতে হবে।

(গ) রক্তচাপ স্বাভাবিকের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে বিশ্রাম, খাদ্য, ঔষধ সহযোগে।

(ঘ) **কর্টিকোষ্টেরয়েড সহযোগে চিকিৎসা ঃ–** সর্ট একটিং ড্রাগ যেমন প্রেডনিসন বা মিথাইলপ্রেডনিসন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে যাতে হাইপোথ্যালামিক পিটুটারি – এড্রেনাল এক্সিস ডিসরাপ্ট না হয়। স্বল্প মাত্রার মধ্যে ৩০ মিঃ গ্রাম প্রতি ১.৭ স্কয়ার মিটার প্রতিদিন প্রেডনিসন দেওয়া যেতে পারে। মডারেট ডোজেজ হোল ৩০ থেকে ৫০ মিঃ গ্রাম ১.৭ স্কয়ার মিটার প্রতিদিন এবং রোগীর অবস্থাবুঝে বেশী ডোজেও প্রেডনিসন দেওয়া যেতে পারে। সাধারণত প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ০.৮ –১.০ মিলি গ্রাম প্রতি কেজি বডি ওয়েট প্রতিদিন দেখা হয়। এই রকম ২–৩ দিন ব্যবহারের পর কাউকে ১০ – ১৪ মিঃ গ্রাম।

(ঙ) এস, এল ইর চিকিৎসার একটা বড় অসুবিধা হোল লং টাম মেনেজমেন্ট। ক্লিনিক্যাল এভালুয়েশন (ননরেনাল এবং নন হেমটোলজিক) এস, এল, ইর থেরাপীর ভাল গাইড হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও ল্যাবরেটরী ইনভেষ্টিগেশনসও ভাল গাইড হিসাবে কাজ করতে পারে। এনিমিয়া, ফ্যাটিগ, হাইপারগামা গ্লোবিউলিনিমিয়া আরও চিকিৎসার প্রয়োজন নির্দেশ করে, করটিকোষ্টেরয়েড চিকিৎসার প্রয়োজন নির্দেশ করে। কর্টিকোষ্টেরয়েড চিকিৎসার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এর সুদুর প্রসারী বিষক্রিয়া যেমন কেটারাক্ট, নেক্রোসিস অব বোন এবং ইনফেকশান হলে এটা বন্ধ করতে হবে।

(চ) যদি কোন মেজর অর্গান ইনভলবমেন্ট না হয় তাহলে সিমপটোমেটিক চিকিৎসা করতে হবে, যদিও যতকম ঔষধ দেওয়া যায় তত রোগীর জন্য ভাল। উদাহরণ স্বরূপ ঃ স্কীন ইনভলমেন্ট থাকলে হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন ২০০ থেকে ৬০০ মিলি গ্রাম দেওয়া যেতে পারে। আর্থাইটিস,

সিরোসাইটিস, জ্বর থাকলে নন ষ্টেরয়ডাল এন্টি ইনফ্লামেন্টারী ঔষধ যেমন এসপিরিন এবং আইবুপ্রোফেন দেওয়া যেতে পারে। পেরি কার্ডাইটিস থাকলে এণ্ডোমেথাসিন দেওয়া যেতে পারে।

(ছ) যদি মেজর অর্গান ইনভলবমেন্ট থাকে তাহলে যে অর্গান এফেকটেড হয়েছে তার কাজ এবং সেটা যেন ফেইল না করে, সে দিকে দৃষ্টি রেখে চিকিৎসা করতে হবে। যেমন ঃ- থ্রম্বো সাইটোপেনিয়া এবং এনিমিয়া থাকলে প্লাজমা এক্সচেঞ্জ করলে রোগীর উপকার হবে। মায়োকারডাইটিস থাকলে সিমটোমেটিক চিকিৎসা করলে বেশীর ভাগ রোগী ভাল হয় তবে কিছু কিছু রোগীর স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের দরকার হয়। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিষ্টেম ইনভলভমেন্ট থাকলে কর্টিকোষ্টেরয়েড এর সংগে সাইক্লোফসফামাইড (০.৮৫ – ২.০ গ্রাম প্রতি ১.৭ স্কয়ার মিটার) রোগীর জীবন রক্ষা হবে। যদি খিচুনি থাকে তাহলে কর্টিকোষ্টেরডের সংগে এন্টি কনভালসেন্ট দিতে হবে।

(জ) এস, এল, ই রোগীর চিকিৎসার সবচেয়ে জটিল অংশ হল কিডনী রোগ। যদি রোগীর একটিভ কিডনী রোগ থাকে তাহলে বেশী মাত্রায় কর্টিকোষ্টেরয়েড এবং এর সংগে ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ যেমন ঃ- এজাথিউপ্রিন দিতে হবে। খুব বেশী ফাংশন খারাপ হলে ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা করতে হবে। এস, এল, ই যদি র‍্যাপিডলি প্রগেসিভ নেফ্রাইটিস করে তখন Methyl Prednisolone 500 mg (Pulse therapy) পর পর ৩ দিন I. V দেয়া যেতে পারে।

বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির দরুণ এস, এল, ই, রুগীর ১০ বছর সারভাইভাল রেট ৭৫%।

ডায়াবেটিস ও কিডনী রোগ
(DIABETES AND KIDNEY)

মতিউর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

ইনসুলিন নির্ভর (IDDM) বা ইনসুলিন অনির্ভর (NIDDM) উভয় রোগেই কিডনী রোগ গ্রস্থ হতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের ১৫ বৎসরের মধ্যে ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিস রোগীদের $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং ইনসুলিন অনির্ভর ডায়াবেটিস রোগীদের $\frac{১}{৫}$ অংশ ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথীতে ভোগে। পাশ্চাত্যে শতকরা ৮০ভাগ ইনসুলিন অনির্ভর এবং ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিক রোগীর শতকরা ২০ ভাগ ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথীতে ভুগে থাকে। তবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেহেতু ইনসুলিন অনির্ভর রোগীর সংখ্যা বেশী (দারিদ্রতা, অশিক্ষা, দেরীতে রোগ নির্ণয় এবং ডায়াবেটিক অনিয়ন্ত্রনের কারণে) সেহেতু ডায়াবেটিস সম্পৃক্ত কিডনী রোগ এই অংশে আরো বেশী পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথী, এণ্ড ষ্টেজ রেনাল ডিজিজের প্রধান কারণ (ESRD) । এবার ডায়াবেটিস সম্পৃক্ত কিডনী রোগের বিভিন্ন পরিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করব।

প্রাথমিক পরিবর্তন

কিডনীর প্রাথমিক পরিবর্তন সমূহের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল কিছু কার্য্যকরী এবং মরফোলজীক্যাল পরিবর্তন সমূহ যার সংগে যুক্ত থাকে মাইক্রোপ্রোটিনইউরিয়া। কার্য্যকরী পরিবর্তনের মধ্যে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশনরেট (GFR) উল্লেখযোগ্য। নতুন নির্নিত ডায়াবেটিক রোগীদের গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ইনসুলিনের সহযোগে চিকিৎসা শুরু করলে এটা প্রায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি চলে আসে। তবে উন্নত চিকিৎসা সত্বেও দেখাযায় যে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ (GFR) বাড়ে। এই প্রাথমিক অবস্থায় কোন ক্লিনিক্যাল প্রোটিনিউরিয়া থাকে না।

banglainternet.com

রেনাল প্লাজমাফ্লো (RPF) ডায়াবেটিক রোগীদের প্রাথমিক অবস্থায় (বিভিন্ন ইনফিউশান টেকনিকের মধ্যে যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে,) স্বাভাবিক থাকে বা স্বাভাবিক থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এর থেকে প্রতিয়মান হয় যে RPF র ছাড়া অন্য কিছু ফ্যাকটর ও GFR র বাড়ার জন্য দায়ী। এবং এক্সরে করে দেখা গেছে যে ডায়াবেটিক নির্ণিত হওয়ার পর প্রাথমিক অবস্থায় স্বাভাবিকের থেকে কিডনীর আকার একটু বড় হয়। ধারনা করা হয় যে সমস্ত ফ্যাকটর GFR কে বাড়ায় তারাই কিডনীর আকারের এই বাড়ার জন্য দায়ী।উপরে উল্লেখিত কিডনীর এই কার্য্যকরী ও মরফোলজীক্যাল পরিবর্তন সমুহকে হাইপারফ্যাংশান হাইপারট্রফিকসিনড্রোম বলে। এই পরিবর্তন সমুহকে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রন করে পুনরায় স্বাভাবিক বা এর কাছাকাছি আনা সম্ভব।

এলবুমিন নির্গমনের হার (AER)

প্রতি ২৪ ঘন্টায় একজন স্বাভাবিক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের এলবুমিন নির্গমনের হার হচ্ছে ২.৫ থেকে ২৬ মিলিগ্রাম প্রতি ২৪ ঘন্টায় এবং বেশীর ভাগ লোকের (৯২%) ১৮ মিলিগ্রাম /২৪ ঘন্টার নীচে হয়। ডায়াবেটিক রোগীদের যাদের ক্লিনিক্যাল প্রোটিনিউরিয়া থাকে তাদের এই হার ২০০ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম / ২৪ ঘন্টায়। যে সমস্ত ডায়াবেটিক রোগীদের ক্লিনিক্যাল প্রোটিনিউরিয়া থাকে না তাদের AER স্বাভাবিক লোকদের থেকে বেশী হয়। অর্থাৎ তাদের এই হার ২৬ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম প্রতি ২৪ ঘন্টায় থাকে যাকে মাইক্রোপ্রোটিনিউরিয়া বলা হয়। সদ্য নির্ণিত ডায়াবেটিক রোগীদের শতকরা ৪৫ভাগের এই মাইক্রোপ্রোটিনইউরিয়া থাকে। এই মাইক্রোপ্রোটিনইউরিয়া যদি ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকে বা শারিরীক পরিশ্রম কম হলে বাড়তে থাকবে। এই মাইক্রোপ্রোটিনইউরিয়ার উৎপত্তি গ্লোমেরুলাস থেকে কারণ টিবিউলার ড্যামেজ এর যে মার্কার (B_2 মাইক্রোগ্লোবিনিউরিয়া) এই সমস্ত ডায়াবেটিক রোগীদের বেলায় অনুপস্থিত থাকে।

AER এর তাৎপর্য্য

ভিবেরটি ও তার সহযোগীরা ১৯৮২ সনে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিক রোগীদের যাদের AER বেশী (১০০ মিঃ গ্রাম / ২৪ ঘন্টায়) তাদের ক্লিনিক্যাল প্রটিনিউরিয়া বা মাক্রোপ্রটিনিউরিয়া হওয়ার সম্ভাবণা ২০ গুন বেশী থাকে যা পরবর্তীতে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথীর দিকে মোড় নেয়। অথচ যে সমস্ত রোগীর স্বাভাবিক মাত্রায় মধ্যে মাইক্রো-প্রোটিনিউরিয়া থাকে তাদের এই সম্ভাবণা মাত্র ৪ গুণ।

দেরীতে যে সমস্ত পরিবর্তন হয়।

মাক্রোপ্রটিনিউরিয়া বা ক্লিনিক্যাল প্রটিনিউরিয়া যা প্রথম দিকে ট্রানজিয়েন্ট থাকে পরবর্তীতে স্থায়ী হয়ে যায় এবং দেরীতে সে সমস্ত পরিবর্তন সমুহ হয়ে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথী হয় তার সূচনা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যা পরবর্তীতে এণ্ড ষ্টেজ রেনাল ডিজিজ বা ESRD রূপান্তরিত হয়। হিষ্টোজিক্যালী গ্লোমেরুলাসের বেজমেন্ট মেমব্রেন থিকেনিং সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। এর পর আস্তে আস্তে গ্লোমেরুলাসের অন্যান্য পরিবর্তন সমুহ প্রকাশ পেতে শুরু করে।

নেফ্রোপ্যাথী মরফোলজী যা দেরীতে প্রকাশ পায়।

ক) গ্লোমেরুলাস এর বেজমেন্ট মেমব্রেন এর থিকেনিং।

খ) মেসানজিয়ামের প্রলিফারেশন।

গ) ডিফিউজ গ্লোমেরুলো স্ক্লেরোসিস।

ঘ) নডুলার গ্লোমেরুলো স্ক্লেরোসিস।

ঙ) হাইপার টেনশন/ইনফেকশান জনিক পরিবর্তন সমুহ।

চ) প্রাইমারী গ্লোমেরুলার ডিজিজ যেমন প্রলিফারেটিভ, মেমব্রেনাস, আই জি, এ নেফ্রোপ্যাথী।

ছ) এণ্ড ষ্টেজ স্ক্লেরোজিং অবলিটারেশান।

ক) গ্লোমেরুলাস এর বেজমেন্ট মেমব্রেন এর থিকেনিং ঃ

পারসিসটেন্ট ক্লিনিক্যাল প্রটিনিউরিয়ার বহু আগে থেকেই গ্লোমেরুলার বেজমেন্ট মেমব্রেন এর থিকেনিং পরিলক্ষিত হয়। এর সঙ্গে ডায়াবেটিস এর মেয়াদ এর সম্পর্ক আছে। যেমন টাইপ ১ বা ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিস রোগীদের এটা বেশী এবং স্থায়ী হয় কিন্তু টাইপ ২ বা ইনসুলিন অনির্ভর ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিক রোগীদের বেলায় রোগ নির্ণয় ৪ থেকে ৫ বৎসর পরে পরিবর্তন শুরু হয়। এবং ১০ বৎসরের পর সবচেয়ে বেশী থিকেনিং চোখে পড়ে।ইনসুলিন নির্ভর এবং এবং ইনসুলিন অনির্ভর ডায়াবেটিস এর বেলায় এই বেজমেন্ট মেমব্রেন থিকেনিং এর হারের তারতম্য কেন হয় তা পরিস্কার ভাবে জানা যায়নি তবে টাইপ ১ ডায়াবেটিস রোগীদের খুব বেশী ব্লাড গ্লুকোজ

banglainternet.com

এবং বেশী গ্লাইকোসাইলেটেড হেমোগ্লোবিনের কারনে এই থিকেনিং বেশী বলে ধারণা করা হয়।

খ) মেজেনজিয়াল প্রোলিফারেশান এবং গ্লোমেরুলোস্কেলেরোসিস

এই পরিবর্তন টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের বেলায় একই রকম। যদিও এটা দেরীতে প্রকাশ পায় তথাপি ৫ থেকে ২০ বৎসর পর্যন্ত যারা ডায়াবেটিস এ ভুগছেন তাদের যে কারও এই পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। সাধারন মাইক্রোসকপিতে গ্লোমেরুলোস্কেলেরোসিস দুই ধরণের হতে পারে যেমন ডিফিউজ অর্থাৎ পুরো গ্লোমেরুলাস জুড়ে বা নডুলার অর্থাৎ গ্লোমেরুলাসের যে কোন লবিউলস। এই নডুলস গুলো তৈরী হয় মেজেনজিয়ামে বেশি পরিমান মেজেনজিয়াল মেট্রিক্স জমা হওয়ার কারনে। ডিফিউজ গ্লোমেরুলোস্কেলেরোসিস বেশী কমন সাধারণ ভাবে দেখা যায় কিন্তু রোগ বেশী এ্যাডভান্স করলে সাধারণ নডুলার স্কেলেরোসিস দেখা দেয়।

গ) অন্যান্য লেসিওন ঃ

বারডেম হাসপাতালের ডায়াবেটিস রোগীদের কিডনী বায়োপসি করে দেখা গেছে যে শতকরা ১৪ ভাগ রোগীর প্রাইমারী গ্লোমেরুলার লেসিওন আছে। সুতরাং যে সমস্ত ডায়াবেটিস রোগীর মাইপ্রোটিনইউরিয়া আছে বা অন্য কোন কিডনীর রোগ আছে বলে ধারণা হয় তাদের অবশ্যই রেনাল বায়োপসি করতে হবে প্রকৃত রোগের কারণ জানার জন্য।

ঘ) এণ্ডষ্টেজ / গ্লোমেরুলাস এর সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্তি ঃ

রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ বৎসর পর সম্পূর্ণ গ্লোমেরুলাসই ধ্বংস প্রাপ্ত যা হায়ালিনাইজড হয়ে আস্তে আস্তে এণ্ড ষ্টেজ ক্রনিক রেনাল ফেইলার এর দিকে মোড় নেয়।

গ্লোমেরুলোস্কেলেরোসিস এর প্যাথজেনেসিস

গ্লোমেরুলোস্কেলেরোসিস হচ্ছে ডায়াবেটিক রোগীদের জেনারালাইজড মাইক্রোএনজিওপ্যাথীর একটি কিডনী সম্পৃক্ত বহিঃপ্রকাশ যা বহু গবেষনায় প্রমানিত হয়েছে। এটা ধারণা করা হয় যে, যে সমস্ত ডায়াবেটিক রোগীরা জেনেটিক্যালি প্রি ডিসপোজড তাদের মেটাবলিক অর্থাৎ বায়োকেমিক্যাল এবং হরমোনাল পরিবর্তন এর কারণে এই মাইক্রোএনজিওপ্যাথী হয়।

জেনেটিক ফ্যাকটরস ঃ

এটা দেখা গেছে যে কিছু ডায়াবেটিস রোগী রোগ নির্ণয়ের ১০-১৫ বৎসরের মধ্যে নেফ্রোপ্যাথীতে ভুগতে শুরুকরে। আবার অনেক ডায়াবেটিক রোগী ২০ বৎসর বা তারও বেশিদিন ডায়াবেটিসে ভোগার পরও নেফ্রোপ্যাথী ডেভেলপ করে না। এর জন্য ধারণা করা হয় যে এর একটা জেনেটিক কন্ট্রোল থাকতে পারে। বারবারা ও তার সহযোগীরা তখন (১৯৭৬ থেকে ১৯৮০) গবেষনা করে দেখান যে, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথীর ইনসিডেন্স $HLAB_8$ লোকদের বেশী কিন্তু HL_{B15} লোকদের কম। কিন্তু জোওয়েল (১৯৮৯) গবেষণা করে রেটিনোপ্যাথির সঙ্গে HLA এর কোন যোগ সূত্র পেলেন না আবার মার্কাশ ও তার সহযোগীরা ১৯৮০ সনে দেখালেন যে যাদের ডায়াবেটিক রোগীরা এই নেফ্রোপ্যাথী ডেভেলপ করার জন্য বেশী সাসসেপটেবল এবং এদের পিতা মাতারা ডায়াবেটিস না থেকেও তাদের গ্লোমেরুলার বেজমেন্ট মেমব্রেন বেশী থিকেনড।

মেটাবলিক এবং বায়োকেমিক্যাল ফ্যাকটরস ঃ-

টাইপ ১ এবং টাইপ ২ উভয় প্রকার ডায়াবেটিস রোগীদের মারাত্মক মেটাবলিক ডিসটারবেন্স থাকে যার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, লিপিড প্রধান, এনজাইম প্রষ্টাগ্লাণ্ডিন, ভাসকুলার এবং মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট ফ্যাকটর উল্লেখযোগ্য। এই বিপাকীয় কারণে (যা রক্তাভিশর্করার কারনে হয়ে থাকে) একটি জটীল হিষ্টোকেমিক্যাল পরিবর্তন হয় যা গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন এর পার্মিয়াবিলিটি বাড়িয়ে দেয়, পরে থিকেনিং হয় এবং সবশেষে স্কেলেরোসিস হয়।

সুতরাং এটা বলা যায় যে নেফ্রোপ্যাথির জনন এর জন্য বহু ফ্যাকটর কাজ করে এবং যে সমস্ত ব্যক্তি জেনেটিক্যালী সাসসিপটিবল তাদের এটা বেশী এবং মারাত্মক ভাবে প্রকাশ পায়।

ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথীর ক্লিনিক্যাল কোর্স ঃ

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথীর ক্লিনিক্যাল লক্ষণ সমূহ প্রগ্রেসিভ ক্রনিক রেনাল গ্লোমেরুলার ডিজিজ (যা পরবর্তীতে ক্রনিক রেনাল ফেইলর এবং মৃত্যু ঘটায়) থেকে আলাদা করা কঠিন। তবুও ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথীর রোগীদের রেটিনোপ্যাথী, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথী এবং ডায়াবেটিক মাইক্রো ও মাক্রো এনিজওপ্যাথীর (যার সংগে হৃদরোগ থাকে) এভিডেন্স থাকে। টাইপ – ১ ডায়াবেটিক রোগীদের শতকরা ৫০ ভাগ এবং

banglainternet.com

টাইপ – ২ এর শতকরা ২৫ ভাগ রোগীদের মারাত্মক রেনাল ডিজিজ সম্পৃক্ত থাকে। বেশীর ভাগ পরিসিসটেন্ট প্রেটীনিউরিয়া রোগী পরবর্তীতে নেফ্রোটিক সিনড্রোম, সবশেষে হাইপারটেনশান এবং ক্রনিক রেনাল ফেইলিউরে মোড় নেয়। ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথীকে ৪টি ভাগে বর্ণনা করা যায়।

ষ্টেজ ঃ ১

প্রাথমিক হাইপারটেনশান – এর সংগে GFR বেড়ে যায়, কিডনীর সাইজ বড় হয়। ইনসুলিন সহযোগে চিকিৎসা করলে রোগী পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এর সংগে মাইক্রোপ্রটিনিউরিয়া থাকতেও পারে বা নাও পারে।

ষ্টেজ ঃ ২

ডায়াবেটিক মেলিটাস শুরু হওয়ার ২ বৎসর পর সাধারণতঃ এই ষ্টেজ পাওয়া যায়। এই অবস্থায় রেনাল লেসিওন অর্থাৎ গ্লোমেরুলার বেজমেন্ট মেমব্রেন থিকেনিং পাওয়া যায় এবং মেসানজিয়াল এরিয়া সম্প্রসারিত হয়। তবে অনেক রোগীর কোন লক্ষন প্রকাশ পায়না (সাইলেন্ট ষ্টেজ) সারাজীবনেও, যাদের শর্করা খুব অনিয়ন্ত্রিত তাদের ব্যায়ামকরার পর মাইক্রোপ্রটীনিউরিয়া পাওয়া যাবে এবং GFR বেশী হবে।

ষ্টেজ ঃ ৩

(ইনসিপিয়েন্ট ষ্টেজ) এই ষ্টেজে মাইক্রোপ্রটিনিউরিয়া থাকবে এবং আস্তে আস্তে বাড়বে। রোগ নির্ণয়ের ৮ – ১০ বৎসর পর এটা শুরু হয়। এর সংগে রক্তচাপ বাড়বে, GFR বেশী হবে তবুও কিডনী ফংশন স্বাভাবিক থাকবে।

ষ্টেজ ঃ ৪

এটা বহুল অলোচিত ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি যার সংগে ক্লিনিক্যাল প্রটিনিউরিয়া, ইডিমা, উচ্চ রক্তচাপ এবং খুব দ্রুত কিডনী ফংশন খারাপ হতে থাকে। এটা হতে ১০ – ১৫ বৎসর সময় লাগে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রন, রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রন থেকে ভাল ফল দেয়।

ষ্টেজ ঃ ৫

এটা এণ্ড ষ্টেজ রেনাল ডিজিজ যেখানে রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপীর প্রয়োজন আছে।

ব্যবস্থাপত্র ঃ

উপরের অলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে কোন রোগী যদি ষ্টেজ ৪ পৌছে, সত্যিকার অর্থে চিকিৎসকের তখন করার বেশী কিছু থাকেনা কারণ ঐ সমস্ত রোগী শেষ পর্যন্ত ষ্টেজ ৫ পৌছে এণ্ড ষ্টেজ রেনাল ফেইলিউরে চলে যাবে। এসমস্ত রোগীর সিমটোম্যাটিক চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে। এজন্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ধরনের রোগীর অতিদ্রুত রোগ নিরুপনের জন্য বিভিন্ন মার্কার এর উপর জোড় দেওয়া হচ্ছে যায় মধ্যে অন্যতম হোল মাইক্রোপ্রটিনিউরিয়া। এজন্য সব ডায়াবেটিস রোগীদের মাইক্রোপ্রটিনিউরিয়া আছে কিনা তা দেখতে হবে অথবা AER নির্ণয় করতে হবে। যদি এ সবের মান বেশী হয় তাহলে তাদের নীচের পরীক্ষাগুলো করতে হবে।

(ক) অপথালমোস্কপী করে দেখতে হবে কোন রেটিনাল ইনভলবমেন্ট আছে কি না?

(খ) রক্তচাপ প্রত্যহ মেপে দেখতে হবে।

(গ) কোন নিউরোপ্যাথী আছে কিনা তা দেখতে হবে।

(ঘ) এই অবস্থায় রক্ত শর্করা এবং HbA_1C মান নির্ণয় করতে হবে এবং ইনসুলিন, হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট, খাবার ও ব্যায়াম সহযোগে চিকিৎসা করে রক্ত শর্করার মান নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ ঔষধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রনে আনতে হবে (ভাসোডাইলেটর যেমন আলফা মিথাইল ডোপা, কার্ডিওসিনথেটিক বিটাব্লকারস এবং ডায়ুরেটিক সহযোগে)।

ষ্টেজ ৪ রোগী পৌছে গেলে অন্যান্ন ক্রনিক প্রগ্রেসিভ ডিজিজ যেমন চিকিৎসা করা হয় তেমনি করতে হবে। অর্থাৎ লো প্রোটিন ডায়েট, উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা, ইডিমা কমানো (লুপ ডায়ুরেটিক দিয়ে) ইনফেকশান থাকলে তা এনটিবায়োটিক সহযোগে চিকিৎসা এবং রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রন।

ষ্টেজ ৫ এর ব্যবস্থাপনা ঃ

উপরের উল্লেখিত ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার পর যদি রোগীর উন্নতি না হয় এবং রোগীর GFR ১০ মিঃ লি / প্রতিমিনিট এর নীচে চলে যায় তাহলে রিপ্লেসমেন্ট থেরাপী শুরু করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে কোন সিদ্বান্ত নেওয়ার আগের রোগীর হৃদরোগ, সেরিব্রোভাসকুলার রোগ হেমিপ্লেজিয়াসহ, অন্ধত্ব বা

banglainternet.com

এমপুটেশান সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। এর পর সিদ্ধান্ত নিলে তিন ধরনের চিকিৎসা রোগীকে প্রদান করা হয়।

(১) CAPD - Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis.

(২) MHD - Maintenance Haemodialysis.

(৩) কিডনী সংযোজন।

এগুলোর মধ্যে রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশন হচ্ছে সবচেয়ে কার্য্যকর চিকিৎসা যদিও ইনফেকশান, ষ্ট্রোক বা মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফারকশনের মত জটীলতা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যাধিক। ডায়াবেটিক ESRF রোগ শতকরা ৫০ ভাগ বেশী মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে নন ডায়াবেটিক ESRF রোগীর থেকে। তবে সাইক্লোস্পোরিন এবং মনোক্লোনাল এন্টিবডি দেওয়ার পর রোগী এবং গ্রাফ্ট উভয়ের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিরোধ ঃ

যেহেতু ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথী ESRF এর দ্বিতীয় প্রধান কারণ সেজন্য ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথী যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসায় সাবকিউটেনিয়াস ইনফিউশান পাম্প, প্যানক্রিয়াস ট্রান্সপ্লান্টেশান এবংগ্রোথ হরমোন ও গ্লুকাগোন সাপ্রেশন করে ভিন্ন বিষয়ে গবেষনা চলছে।

হাইপারটেনশন ও কিডনী
(HYPERTENSION AND KIDNEY)

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
মতিউর রহমান

প্রাইমারী হাইপারটেনশান কিডনীকে আক্রান্ত করতে পারে আবার কিডনী রোগও হাইপারটেনশান এর কারনে হতে পারে। এই পরিচ্ছদে আমরা কিডনীর সমৃক্ত হাইপারটেনশান সম্পর্কে আলোকপাত করব। তবে এর আগে হাইপারটেনশানের সংজ্ঞা ও জনন সম্পর্কে আলোচনা করবো।

হাইপারটেনশন এর গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হচ্ছে ডায়াষ্টোলিক প্রেসার ৯৫ মিঃ মিঃ মার্কারীর উপরে গেলে সেটাকে হাইপারটেনশন বলে। সিসটোলিক প্রেসার ১৬০ মিঃ মিঃ মার্কারীর উপরে গেলে সেটাকেও হাইপারটেনশন বলে তবে এর থেকে ডায়াষ্টলিক প্রেসার বৃদ্ধি বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ হাইপারটেনশন এর বেলায় কোন সংযুক্ত কারণ থাকেনা যাকে প্রাইমারী বা এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন বলে। বাকী ৫ থেকে ১০ ভাগ ক্ষেত্রে হাইপারটেনশন এর সংগে সংযুক্ত কারণ থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল রেণাল, এণ্ডোক্রাইন, ভাসকুলার ডিজাঅর্ডার্স বাকে সেকেণ্ডারী হাইপারটেনশন বলে।

হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ এর শ্রেণীবিভাগ

ক প্রাইমারী বা এসেনসিয়াল হাইপারটেনশন – কারণ অজানা।

খ সেকেণ্ডারী হাইপারটেনশন – কারণ নীচে বর্ণনা করা হোল।

রেণাল কারণ ঃ একুউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস

ক্রণিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস

রেণাল আর্টারী স্টেনোসিস

রেণাল ভাসকুলাইটিস

রেণিন নিঃসরণকারী টিউমার

banglainternet.com

এণ্ডোক্রাইন ঃ	কুশিং সিনড্রোম
	ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ্ড
	ফেওক্রোমোসাইটোমা
	এক্রোমেগালী
	মিক্সিডিমা
	থাইরোটক্সিকোসিস
ভাসকুলার ঃ	কো আর্কটেশন অফ এওরটা
	পলিআর্টারাইটিস নডোসা
	এওরটিক ইনসাফিসিয়েন্সী
নিউরোজনিক ঃ	সাইকোজেনিক
	ইন্ট্রাক্রানিয়াল প্রেসার বাড়ার জন্য
	পলিনিউরাইটিস, বালবার পলিওমাইলাইটিস

রেণাল হাইপারটেনশান ঃ

ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রনে কিডনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স এবং ব্লাড ভল্যুম উভয়কে রোধ করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে কিডনীর ভূমিকাকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক কিডনী কর্তৃক নিঃসৃত পদার্থ যার প্রেসার ইফেকট আছে।

খ একষ্ট্রাসেলুলার ফ্লুয়িড এবং ব্লাড ভল্যুম সংরক্ষণ করা।

গ কিডনী কর্তৃক নিঃসৃত পদার্থ যার রক্তচাপ কমানোর ক্ষমতা আছে।

ক রেণাল প্রেসার ইফেকট -- রেণিন এঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম -- এটা কিডনীর প্রধান প্রেসার মেকানিজম। স্বাভাবিকভাবে জ্যাকস্ট্রা গ্লোমেরুলার সেল, রেণিন নিঃসরণ করে কতগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে, যেমন (১) এফারেন্ট আর্টারিওলের প্রেসার কম এর কারণে (২) ম্যাকুলো ডেন্সার সোডিয়াম বা ক্লোরাইড ওভারলোড (৩) সিমপ্যাথিটিক নার্ভের প্রত্যক্ষ উত্তেজনা বা বিটা এড্রেনার্জিক এগোনিস্ট যেমন ইপিনেফ্রিন।

রেণিন নিজে প্রেসার ইফেক্ট করে না কিন্তু এটা যকৃত নির্ভর আলাফা ২ গ্লোবিউলিনস যেমন এঞ্জিওটেনসিন এর উপর কাজ করে এনজিওটেনসিন ১ করে যা অন্য একটা কনভার্টিং এজেন্ট দিয়ে একটা পেপটাইড এনজিওটেসিন ২ তৈরী করে। এটাই পটেন্ট ভাসোকনস্ট্রিকটিং এজেন্ট যা রেণাল এবং একট্রারেণাল ভেসেল এর ভাসোকনষ্ট্রিকশান করে। রেনিণ এড্রেনাল করটেক্স থেকে এলডোসস্টেরণ নিঃসরণও করে যা সোডিয়াম রিটেনশান করে। এঞ্জিওটেনসিন ২ আর্টারির ব্লাড প্রেসার বাড়ায় দুভাবে। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ ভাসোকনস্ট্রিকশন এবং দ্বিতীয়তঃ সোডিয়াম রিটেনশান করে।

সোডিয়াম রিটেনশন এবং ব্লাড ভল্যুম এর পরিবর্তন ঃ

একষ্ট্রাসেলুলার ফ্লুয়িড ভলিউম নির্ধারণে টোটাল বডি সোডিয়াম এর একটা ভূমিকা আছে যার পরোক্ষভাবে ব্লাড ভল্যুম এবং কার্ডিয়াক আউটপুটের উপরও প্রভাব আছে। সোডিয়াম হেমোস্টাসিস এর জন্য নীচের রেণাল ফ্যাক্টরগুলো দায়ী। (ক) গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন কমে গেলে ফিল্টার্ড এর সোডিয়াম লস কমে যাবে এবং প্রক্সিমাল টিবিউলার সোডিয়াম রিএবসরপশন বাড়বে এবং শরীরে সোডিয়াম গুদামজাত বাড়াবে। আবার এর বিপরীত হলে সোডিয়াম লস বেশী হবে। (ন্যাট্রিইউরোসিস)।

ক এলডোস্টেরণ – এই হরমোনের প্রভাবে ডিস্টাল টিবিউলের সোডিয়াম এবসরপশন বেড়ে যায়।

খ একটি গ্লোমেরুলার রেট নির্ভর নয়, এলডোসটোরন নির্ভর নয় পদ্ধতি। ভল্যুম এক্সপানসর এর উপস্থিতিতে এই পদ্ধতি ডিস্টাল টিবিউলার সোডিয়াম রিএবসরপশন বাড়িয়ে দেয়। এই সময় হেমোস্টাটিক মেকানিজম এর ফেইলার এর জন্য সোডিয়াম রিটেনশন হাইপারটেনশন এর জন্য দায়ী, বিশেষতঃ যে সমস্ত রোগীর এণ্ড স্টেজ রেণাল ফেইলার আছে।

গ. রেনাল এন্টিহাইপারটেনসিভ এজেন্ট ঃ

অন্তত পক্ষে তিন গ্রুপের এন্টিহাইপারটেনসিভ পদার্থ পৃথকীকরণ সম্ভব হয়েছে। এগুলো হচ্ছে (১) প্রোস্টাগ্লাণ্ডিন -- কিডনীর মধ্যে ইন্টারস্টিশিয়াল সেল, প্যাপিলারী কালেকটিং টিবিউল, গ্লোমেরুলাই এবং এফারেন্ট আর্টারিওলস প্রস্টাগ্লাণ্ডিন সিনথেসাইজ করে। কর্টিক্যাল প্রস্টাগ্লাণ্ডিন ভাসকুলার ইফেক্ট তৈরী করে এবং মেডুলারী প্রস্টাগ্লাণ্ডিন সল্ট এবং পানি

banglainternet.com

নিয়ন্ত্রন করে। প্লোষ্টাগ্লাণ্ডিন এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুয়িড ভল্যুম কমায়। ভাসকুলার টোন এবং রিএকটিভিটির উপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে এবং রেণাল ভাসো কনষ্ট্রিকটর এঞ্জিওটোসিন ২ এর একটি ডায়ুরেটিক হরমোন এর প্রভাব ভোতা করে দেয়। প্রোস্টাগ্লাণ্ডিন রেণাল ব্লাড ফ্লো বাড়িয়ে দেয়, ডায়ুরেসিস বাড়ায়, ন্যাট্রিইউরোসিস করে এবং ভাসোডাইলেটেশন করে। সবই এন্টিহাইপারটেনসিভ ফেনোমেনা। ভাসকুলার রেজিস্টেন্স বাড়ায় এবং এলডোসস্টেরন নিঃসরণ সোডিয়াম রিটেনশান করে ব্লাড ভল্যুম বাড়ায়। স্বাভাবিক অবস্থায় বেশী নিঃসরণ হলে খুব তাড়াতাড়ি তা নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম দ্বারা রেণিন নিঃসরণ কমিয়ে দেয় এবং সার্কুলেটিং রেণিন এর পরিমাণ স্বাভাবিক করে। কাজেই বেশী ব্লাডপ্রেসার হলে এফারেন্ট আর্টারিওলে ষ্ট্রেস রিসিপটার উত্তেজনা কমিয়ে দেয় এবং ফলে রেণিন নিঃসরণ নেমে যায়। একইভাবে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুয়িড ভল্যুম বেশী হলে (এলডোস্টেরণ এর প্রভাবের ফলে) যা গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট বাড়িয়ে দেয় ফলে প্রক্সিমাল সোডিয়াম রিএবসরপশন এবং ম্যাকুলা ডেন্সার এর মাধ্যমে রেণিন নিঃসরণ কমে আসে। আর্টারিওলের প্রেসার বেশী হলে রেণাল সিমপ্যাথেটিক নার্ভ উত্তেজিত হওয়ার কারণে রেণিন এর নিঃসরণও কমে যায়। এর মেকানিজম অজানা। সবশেষে এঞ্জিওটেনসিন। প্রত্যক্ষভাবে জাক্সটাগ্লোমেরুলার সেল এর কোষের নিঃসরণ কম করতে পারে না। কাজেই স্বাভাবিক রেণাল ফাংশন থাকলে প্লাজমা রেণাল ভ্যালুস্বাভাবিক থাকবে। সুতরাং কোন কারণে বেশী রেণিন নিঃসরণ হলে রেণাল হাইপারটেনশান হবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল

(ক) এক দিকের রেণাল আর্টারি স্টেনোসিস।

(খ) ম্যালিগন্যান্ট রেণাল হাইপারটেনশন যেখানে রেণিন ও এলডোসষ্টেরণ উভয়ের মান বেশী থাকে।

(গ) ভাসকুলাইটিস।

(ঘ) একদিকের ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস বা রিফ্লাক্স নেফ্রোপ্যাথী।

(ঙ) রেণিন সিক্রেটিং জাক্সটাগ্লোমেরুলার সেল টিউমার, রেণাল সেল কার্সিনোমা, উইলমস টিউমার।

(চ) কিছু ক্রনিক রেণাল ফেইলার।

২ ক্যালিক্রেনিন কাইনিন -- কাইনিন তৈরী এবং ধ্বংস করার জন্য যে সমস্ত পদার্থ উপস্থিত থাকা দরকার তার সবটা কিডনীতে উপস্থিত থাকে।

এদের মধ্যে কাইনিনোজেন হাইড্রোলাইজ করে ইনএকটিভ পেপটাইড কাইনিন করে। ব্রাডিকাইনিন জেনারালাইজড এবং তৎসহ রেণাল ভাসোডাইলেটেশন করে এবং সোডিয়াম নিঃসরণ বাড়ায়। উভয় কাজই প্রেসার কমানোর জন্য কাজ করে।

৩ নিউট্রাল লিপিড ফ্যাক্টর -- এটা রেণাল মেডুলার ইন্টারষ্টিশিয়াল সেল কর্তৃক নিঃসৃত এবং গবেষনাগার প্রাণীর তৈরী হাইপারটেনশন কমাতে সাহায্য করে। এটা প্রোষ্টাগ্লণ্ডিন থেকে আলাদা।

কিডনীর থেকে নিঃসৃত এই তিনটি হিউমোরাল সিষ্টেম এর গুরুত্বপূর্ণ ইন্টাররিলেশনসিপ এর প্রকৃত কার্যকারীতা সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিন ক্যালিক্রোনিন-কাইনিন এবং রেণিন এঞ্জিওটেনসিন উভয় সিষ্টেমকে উত্তেজিত করে এবং এঞ্জিওটেনসিন ২ এর ভাসোকনষ্ট্রিকটিভ কাজকে বন্ধ করে দেয়। অন্যান্য সেকেণ্ডারী হাইপারটেনশন যেমন প্রাইমারী এল্ডোসষ্টেরিনিজম, সোডিয়াম রিটেনশনের ফলে ব্লাড ভল্যুম বেড়ে যায়, ফেওক্রোমোসাইটোমায় টিউমারটি ইপিনেফ্রিন এবং নর ইপিনেফ্রিন নিঃসরণ করে ফলে ভাসোকনষ্ট্রিকশন এবং কার্ডিয়াক সংকোচন বেশী হয়, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ রেণিন এনজিওটেনসিন মেকানিজমকে বৃদ্ধি করে, পলিআর্টিরাইটিস নডোসায় খুব বেশী রেনিণ তৈরী হয়।

এবার হাইপারটেনশান ও কিডনীর সম্পর্ক, মরফোলজী নীচে বর্ণনা করা হোল।

বেনাইন এসেনশিয়াল হাইপারটেনশান ও কিডনী ঃ-

বেনাইন এসেনসিয়াল হাইরটেনশানে রেনাল প্লাজমা ফ্লো কম হয় কিন্তু গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশান রেট স্বাভাবিক থাকে। হাইরটেনসিভ রোগীদের আউটার কর্টিক্যাল গ্লোমেরুলাই পারফুশান কমে যায় , তবে ক্যালশিয়াম নির্গমনের হার বেড়ে যায়। এসেনশিয়াল হাইপারটেশানে আর্টারিয়াল প্রেসার বাড়ার কারণে রেনাল হেমোডিনামিকস যে অসুবিধা হয় তার ফলে কিডনীর স্বাভাবিক কাজের ব্যঘাত ঘটতে পারে। তবে এই হেমোডিনামিকস পরিবর্তনের ফলে খুব মারাত্মক আকারে কিডনী ফাংশন কমে যায়না। তবে রোগীর খুব সামান্য প্রটিনিউরিয়া থাকতে পারে। এর সংগে হাইপারটেনশানের কারণে রেনাল ড্যামেজ বা বেনাইন নেফ্রোস্কেলেরোসিস

banglainternet.com

সমৃক্ত আছে কিনা বা এরই ফলশ্রুতিতে রেনাল ফেইলিওর হয়েছে কিনা তা বলা খুব মুস্কিল। যদি কোন বেনাইন হাইপারটেনসিভ রোগীর কিডনী ফাংশান খুব খারাপ পাওয়া যায়, এর সংগে প্যাথলজিক্যাল বা রেডিওলজিক্যাল কোন পরিবর্তন না থাকে তাহলে পরবর্তীতে দেখা যায় যে, অন্য কোন কারনে রেনাল স্ক্যারিং হয়ে এই কিডনী ফাংশান কমে গেছে এবং হাইপারটেনশান এর সংগে এর সমপৃক্ততা একেবারেই হঠাৎ একত্রে হয়েছে । যদি কোন রোগীর এসেনশিয়াল হাইপারটেনশান এর সংগে রেণাল ফেইলিওর ডেভেলপ করে তাহলে সংযুক্ত কোন প্রাইমারী রেণাল ডিজঅর্ডার আছে কিনা তা নির্নয় করতে হবে। যেমন ম্যালিগ্যান্ট ফেজ, রেণোভাসকুলার অবষ্ট্রাকটিভ লেসিওন ইত্যাদি। এটা পরিস্কার নয় যে অনেক রোগীর এসেনশিয়াল হাইপারটেনশান এর সংগে সমপৃক্ত হ্যাপারইউরিসেমিয়ার কারণে রেণাল ড্যামেজ হয় কি না।

ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশান ও কিডনী

ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশান হলে যে ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম প্রকাশ পায় তা সাধারণতঃ বেশী আর্টারিয়াল প্রেসার এর ফলে ছোট ছোট রক্তনালী আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। এর ফলে হিষ্টোলজীক্যালী রক্তনালীর ফিব্রিনয়েড নেক্রোসিস দেখতে পাওয়া যায় মাইক্রোসকপিতে। হাইপারটেনশান এর যে কোন অবস্থায়, ম্যালিগন্যান্ট ফেজ একটী জটীলতা নিয়ে প্রকাশ পেতে পারে, তবে যে সমস্ত রোগীর রেণাল ফেইলিওর আছে তাদের এই প্রবনতা বেশী। ছোট রক্তনালীর যে ফিব্রিনয়েড নেক্রোসিস হয় তা শরীরের যে কোন ব্লাড ভেসেলে হতে পারে তবে কিডনী ও ব্রেনের ব্লাডভেসেলে বেশী হয়।

ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশান থাকলে কিছু ডিগ্রী রেণাল ফেইলিওর সংযুক্ত থাকেই। তবে ত্বরিৎ ও সাফল্য জনকভাবে চিকিৎসা শুরু করলে স্বাভাবিক রেণাল ফাংশনে পুনরায় ফিরে যেতে পারে। দেরীতে চিকিৎসা শুরু করলে রোগীর মারাত্মক অবনতি হতে পারে।

চিকিৎসা

জরুরী ভাবে ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশান এর চিকিৎসা শুরু করতে হলে প্রথমে–

(১) বোলাস ডোজে ইন্ট্রাভেনাস ডাইজোকসাইড (ইউডেমিন) দিতে হবে ১৫০–৩০০ মিলিগ্রাম অথবা হাইড্রালাজাইন (এপ্রিসোলিন) ২০–৪০ মিলিগ্রাম

ইন্ট্রামাসকুলারলি বা ইন্ট্রাভেনাস ড্রিপ সহযোগে।

(২) অনেকে সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড বা ট্রাইমেটাফেন ইনফিউশান দিতে পছন্দ করেন। চিকিৎসার কার্য্যকারিতা দেখার জন্য ফ্রিকুয়েন্টলি ব্লাডপ্রেসার মনিটর করতে হবে যাতে অন্ততঃ ২। ৩ দিন ডায়াষ্টলিক প্রেসার ৯৫ –১০৫ মিলিমিটার মার্কারীর মধ্যে থাকে। খুব স্বল্প ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি রক্তচাপ কমার কারনে সেরিব্রাল ইনফ্রাকশান (ডিজিনেস, ফিট, লোকাল নিউরোলজীক্যাল সাইন) হয়ে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদি নিয়ন্ত্রনের জন্য বিটা এড্রেনার্জিক ব্লকিং এজেন্ট, ভাসোডাইলেটর ও ডায়ুরেটিক সহযোগে দিতে হবে। ম্যালিগন্যান্ট ফেজ এ মাইক্রোএনজিওপ্যাথিক এনিমিয়া দেখা দিতে পারে এবং এটা হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস এর জটীলতা। আর্টারিয়াল প্রেসার কমালেই এটা ভাল হবে এবং এক্ষেত্রে হেপারিন বা বা ফিব্রিনোলাইটিক এজেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

রেনোভাসকুলার রেণাল ফেইলিওর

অনেক সময় হাইপারটেনসিভ রোগীদের হঠাৎ করে ও অপ্রত্যাশিতভাবে রেণাল ফাংশন খারাপ হয়ে যায়। এর কারন ছোট রক্তনালীর অসুখ নয় বরং উভয় পার্শ্বের বা এক পার্শ্বের বড় রেণাল আর্টারির এথেরোমা হয়ে অবষ্ট্রাকশনের কারণে এটা হয়ে থাকে। কিডনী দুটো সাইজে একরকম হয়না এবং সংকোচিত দেখা যেতে পারে। এনজিওগ্রাম করলে এই রোগ ধরা পড়ে এবং সেখানে রিকনষ্ট্রকটিভ সার্জারীর প্রয়োজন হয় স্বাভাবিক রেণাল ফাংশান পুনরায় চালু করার জন্য।

রেণাল হাইপারটেনশান

কি কারণে কিডনীর রোগ হলে রক্তচাপ বাড়ে এটা খুব একটা পরিস্কার নয়। ধারনা করা হয় যে এর জন্য অনেকগুলো কনট্রিবিউটারী ফ্যাকটর আছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল রেনিন এলজিওটেনসিন সিষ্টেম, লবন ও পানি রিটেনশান, সেন্ট্রাল নিউরোজেনিক মেকানিজম, কার্ডিয়াক আউটপুটের পরিবর্তন এবং ভাসকুলার রিএকটিভিটি। এছাড়াও কিডনী থেকে নিঃসৃত হিউমোরাল ভাসোডাইলেটারেরও এই আর্টারিয়াল প্রেসার বাড়ার জন্য দায়ী। কিভাবে এসমস্ত ফ্যাকটর রেণাল ডিজিজের কারনে রক্তচাপ বাড়ায় যদিও তা পরিস্কার নয় তথাপি ক্লিনিক্যাল প্রাকটিস এর অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা যায় যে রেনিন এনজিওটেনসিন এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টির ব্যাপারে। এই ফ্যাকটরগুলো পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

banglainternet.com

রেনোভাসকুলার হাইপারটেনশান ঃ-

রেনোভাসকুলার হাইপারটেনশান এর প্রধান দুটো কারণ হোল আর্টারির (বিশেষত রেনাল আর্টারী ও এওরটার জাংশনে) এথেরোম্যাটাস প্লেক দিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং রেনাল আর্টারিও তার ব্রাঞ্চ সমূহে ফাইব্রোমাসকুলার হাইপারপ্লাশিয়া হয়ে বন্ধ যাওয়া। এছাড়াও ট্রমা, টিউমার, এনিউরিজম বা ভেসেলে চাপ প্রয়োগের কারণেও এটা হতে পারে। হাইপারটেনশান এর অন্য কারণ একক্লুড করার পর ও সাধারনতঃ সার্জারী করার পর রক্তচাপ স্বাভাবিক হলে তাকেই রেনোভাসকুলার হাইপারটেনশান বলা হয়।

ক্লিনিক্যাল ফিচার ঃ- সাধারণতঃ খুব কম বয়সী বা খুব বেশী বয়সের কোন রোগীর উচ্চ রক্তচাপ থাকলে যাদের এসেনশিয়াল হাইপারটেনশান হওয়ার সম্ভাবণা কম তাকে ক্লিনিক্যালী সাসপেক্ট করা হয়। এর সঙ্গে এডোমিন্যাল ব্রুইট থাকতে পারে। তবে এর সঙ্গে নীচের পরীক্ষা গুলো করতে হবে।

- ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রাফী (র‍্যাপিড সিকুয়েন্স)।
- রেনোগ্রাফী।
- রেনাল এনজিওগ্রাফী।
- রেনাল ভেইন রেনিন ত্রসে।
- এঞ্জিওটেনসিন এন্টাগনিষ্ট (স্যারালাসিন টেষ্ট)।

রেনোভাসকুলার হাইপারটেনশান ম্যানেজমেন্ট

চিকিৎসা দু'ভাবে করা সম্ভব।

১। মেডিসিন সহযোগেঃ আজকাল ঔষধ দিয়ে ব্লাডপ্রেসার কন্ট্রোল করা গেলে সেটাই প্রিফারেবল। কারণ অনেক সময় সার্জারীর পরও দেখা যায় যে ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক অবস্থায় আসছেনা। সেজন্য ব্লাড প্রেসার মনিটর করার জন্যও মেডিসিন সহযোগে চিকিৎসা করা শ্রেয়।

২। সার্জারী ঃ- সার্জারীর মধ্যে এনজিওপ্লাষ্টি, রি কনষ্টাকটিভ সার্জারী প্রধান। আবার ফাইব্রোমাসকুলার প্রলিফারেশন এবং এর সঙ্গে খুব মারাত্মক ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশান থাকলে (যা মেডিসিন দিয়ে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না) সার্জারীর মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হবে।

৩। রেনিন সিক্রেটিং টিউমার থাকলেও সার্জারীর মাধ্যমে তা কেটে ফেলতে হবে।

(গ) বাইলেটারাল রেনাল প্যারেনকাইমাল ডিজিজ ঃ-

রেনাল ডিজিজের উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহ যেমন গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, পাইলোনেফ্রাইটিস, ইন্টারষ্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস এবং পলিসিসটিক ডিজিজ থাকলে তারসঙ্গে কিছু না কিছু হাইপারটেনশান সম্পৃক্ত থাকেই এবং যা রেনাল ফাংশান খারাপ হলে আরও বাড়তে থাকে। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স যখন ১০ মিলি লিটার / প্রতি মিনিট এর কম হয় তখন ৮০% রোগীর উচ্চ রক্তচাপ ডেভেলাপ করে এবং ২০% রোগী ম্যালিগন্যান্ট ফেজ এ চলে যায়। বেশী সোডিয়াম ও পানি জমা, রেনিন এনিজিওটেনসিন সিষ্টেম এর বেশী কার্য্যকারীতা, এর কারণ বলে মনে করা হয়। ভালমত আর্টারিয়াল প্রেসার নিয়ন্ত্রণ করলে (ডায়াসটোলিক রক্তচাপ ১০০ মিলিলিটার মার্কারীর নীচে রাখলে) এবং ক্রনিক রেনাল ডিজিজ যেমন একুইট পোষ্ট ষ্ট্রেপটোকক্কাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস সম্পৃক্ত হাইপারটেনশান এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। অবষ্ট্রাটিভ ইউরোপাথীর কারণে হাইপারটেনশান হলে সার্জারীর মাধ্যমে অবষ্ট্রাকশন দুর করলে হাইপারটেনশান ভাল হয়ে যায়। তবে সবচেয়ে মুস্কিল হোল একদিকের রেনাল ডিজিজ বিশেষতঃ রেনোভাসকুলার হাইপারটেনশান হলে এর রিভারসিবল কারন বের করাটা খুবই কষ্ট সাধ্য।

চিকিৎসা ঃ ১। উচ্চরক্তচাপের চিকিৎসা

২। রেনাল প্যারেনকাইমার বিভিন্ন রোগের সার্জিক্যাল চিকিৎসা যেমন পাইলোনেফ্রাইটিস, সিষ্ট, টিউমার বা অবষ্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথীর সার্জারী করা।

৩। রি কনষ্ট্রাকটিভ সার্জারী।

banglainternet.com

২য় অধ্যায়

৫ম পরিচ্ছেদ

ইউরোলিথিয়াসিস বা ইউরিণারী ষ্টোন বা কিডনী পাথুরে রোগ
(KIDNEY STONE)

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
হারুন উর রশীদ

ইউরিণারী ট্রাক্টের যে কোন অবস্থানে পাথর হতে পারে তবে বেশীর ভাগই কিডনীতে হয়। উন্নত বিশ্বে শতকরা ০.১% থেকে ৬% সাধারণ লোক এর এইকিডনী পাথুরী আছে। এটা মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের বেশী হয় এবং সাধারণত ৩০ বৎসরের উপরের লোকদের এটা বেশী হয়ে থাকে। এই কিডনী পাথুরীর সঙ্গে জন্মগত ও বংশগত সম্পৃক্ততা আছে। কিডনী পাথুরীর বহু কারণের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হোল ঃ

- মেটাবলিক ডিজিজ যেমন গাউট, সিসটিনিউরিয়া , হাইপার অক্সাল ইউরিয়া।
- ইউরিনারী ট্রাক্টের ইনফেকশান বা প্রদাহের সেকেণ্ডারী বা দ্বৈতীয় ।
- টিবিউলসের কোন রোগ যেমন প্যাপিলারি নেক্রোসিস।
- ইডিওপ্যাথিক বা কোন কারণ ছাড়া।

ইটিওলজী এবং প্যাথজেনেসিস ঃ

বেশীর ভাগ কিডনীর পাথর (প্রায় ৭৫% থেকে ৮৫%) ক্যালশিয়াম কন্টেইনিং যার মধ্যে ক্যালশিয়াম অক্সালেট, ক্যালসিয়াম অক্সালেট এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট এর মিশ্রণ, ক্যালসিয়াম ফসফেট একা। অন্য ১৫% কিডনী পাথর যাদের অপর নাম ট্রিপল ষ্টোন, এর মধ্যে থাকে ম্যাগনেসিয়াম

এমোনিয়া ফসফেট, ৬% ইউরিক এসিড ষ্টোন, ১% থেকে ৩% সিসটিন ষ্টোন। কিডনীর পাথর জননের অনেক থিওরী আছে তবে সবচেয়ে যেটা গুরুত্ব পূর্ণ সেটা হলো পাথর তৈরীর মালামাল প্রস্রাবে অতিরিক্ত জমা হওয়া। যেমন ক্যালশিয়াম ষ্টোনের বেলায় ১০% রোগীর হাইপারক্যালশিউরিয়া এবং হাইপারক্যালসেমিয়া থাকে। এগুলোর কারণ হলো হাইপারথাইরয়ডিজম, ডিফিউজ বোন ডিজিজ, ভিটামিন ডি ইনটক্সিকেশন, সারকয়ডোসিস, মিল্ক এলকালি সিনড্রোম, রেণাল টিবিউলার এসিডোসিস, কুশিং সিনড্রোম ইত্যাদি। অর্ধেকের ও বেশী রোগীর হাইপারক্যালসেমিয়া ছাড়াই হাইপারক্যালসিউরিয়া থাকে। এর দুটো কারণ আছে। প্রথমত যাকে বলা হয় এবসরপটিভ হাইপারক্যালসিউরিয়াযেখানে অন্ত্র থেকে ক্যালশিয়াম বেশী শোষিত হয়। দ্বিতীয়ত যার নাম রেণাল হাইপারক্যালসিউরিয়া যেখানে ইনট্রিনসিক ইমপেয়ার্ড ডিফেক্ট অব রেনাল টিবিউলার রিএবসরপশন অব ক্যালসিয়াম হয়।

প্রায় শতকরা ২০ভাগ ক্যালশিয়াম পাথর সম্পৃক্ত রোগীর ইউরিক এসিড নিঃসরণ বেশী হয়ে থাকে যাকে হাইপারইউরিকোসুরিয়া বলে। প্রায় শতকরা ২০ভাগ রোগীর কোন হাইপারক্যালসেমিয়া এবং হাইপারক্যালসিউরিয়া থাকে না। হাইপার অক্সালইউরিয়ার ক্যালশিয়াম ষ্টোন তৈরীতে অবদান সামান্য এবং যাদের বংশগত প্রাইমারী হাইপারঅক্সালইউরিয়া আছে বা ইন্টেসটিনাল ডিজিজ এবং পাইরিডক্সিন ডেফিসিয়েন্সীর কারণে একোয়ার্ড হাইপার অক্সালইউরিয়া আছে তাদের হতে পারে। ক্যালশিয়াম ফসফেট ষ্টোন সাধারণতঃ এলকালাইন ইউরিনে হয়।

ম্যাগনেশিয়াম এমোনিয়াম ফসফেট ষ্টোন সাধারণতঃ ইনফেকশান এর পর (বিশেষতঃ ইউরিয়া স্পিলিটিং ব্যাকটেরিয়া যেমন প্রটিয়াস এবং ষ্টাফাইলোকক্কাস যারা ইউরিয়াকে এমোনিয়াতে রূপান্তরিত করতে পারে) এর ফলশ্রুতিতে এলকালাইন প্রস্রাবে ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট লবণ প্রিসিপিটেশন হয়ে পাথর তৈরী হয়। এই ধরনের কিডনীর পাথর আকারে খুব বড় হয়ে থাকে এবং ষ্টাগহর্ণ ক্যালকুলাইএই শ্রেণীতে পড়ে।

ইউরিক এসিড ষ্টোন যে সমস্ত রোগীর হাইপারইউরেশিমিয়া আছে (যেমন গাউটএবং সে সমস্ত রোগে দ্রুত সেল টার্নওভার যেমন (লিউকেমিয়া) তাদের বেশী হয়। তবে অর্ধেকেরও বেশী রোগীর কোন হাইপারইউরেশিমিয়া থাকে না এবং এদের প্রস্রাবে ইউরিক এসিড বেশী পরিমানে নির্গত হয় না। যেহেতু ইউরিক এসিড, এসিড পিএইচ এ ইনসলুবল সেহেতু প্রস্রাবের পি এইচ ৫.৫ এর নীচে হলে ইউরিক এসিড ষ্টোন বেশী হবে।

banglainternet.com

সিসটিন ষ্টোন সাধারণতঃ জেনেটিক্যালী ডিটারমিণ্ড ডিফেক্ট, রেণ্যাল ট্রান্সপোর্ট অফ এমাইনোএসিড বিশেষতঃ সিসটিন এর কারণে হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে ষ্টোন তৈরীর কনষ্টিটুয়েন্ট এর বেশী কনশেট্রেশন, প্রস্রাবের পি,এইচ এবং ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিপাথর তৈরীর সহায়ক। তবে এই ফ্যাক্টরগুলোর অনুপস্থিতিতেও কিডনীতে পাথর তৈরী হতে পারে। এ জন্য ধারণা করা হয় যে ইউরিনারী কণটেন্ট অব মিউকোপ্রোটীন, নেক্রোটিক টিসু , ব্লাড ক্লট, স্লাফিং ইত্যাদি পাথর তৈরীর অর্গানিক ম্যাট্রিক্স হিসেবে কাজ করে। এর উপরই বিভিন্ন প্রকার লবণ জমা হয়ে পাথর তৈরী হয়। এ ছাড়াও প্রস্রাবে ক্রিষ্টাল তৈরীতে বাধাদানকারী পদার্থ সমূহ যেমন পাইরোফসফেট, ডাই ফসফেট, ম্যাগনিশিয়াম, সাইট্রেট, ইউরিয়া, পলিপেপটাইড এবং এমাইনো এসিডের স্বল্পতার কারণে ও পাথর হতে পারে। জন্মগত বা একুয়ার্ড ডিফরমিটিজ যেমন স্পঞ্জ কিডনী, হর্স স্যু কিডনী এবং লোকাল ক্যালিশিয়াল অবষ্ট্রাশনের জন্যও পাথর হতে পারে।

সাধারণতঃ শতকরা ৮০ভাগ পাথর একদিকের কিডনীতে হয়ে থাকে। পাথর তৈরীর ফেভারেট স্থান হচ্ছে রেণাল কেলিসেস, পেলভিস এবং ব্লাডার। যদি রেনাল পেলভিসে পাথর হয় তাহলে এটা ছোট আকারে (২-৩ মিলিমিটার ব্যাস) । এগুলোর মসৃণ, স্পাইকযুক্ত ইরেগুলার হতে পারে। কোন কোন সময় একই কিডনীতে অনেকগুলো পাথরও একসঙ্গে হতে পারে।

লক্ষণঃ

ক) ব্যাথা – একদিকের বা দু দিকের কিডনীতে (সামনের থেকে পিছনে বা পিছনের থেকে সামনে) ব্যথা হতে পারে। ইউরেটারের ষ্টোন হলে উপরের থেকে নীচের দিকে, পুরুষদের বেলায় অণ্ডকোষ পর্যন্ত এ ব্যথা প্রবাহিত হয়। কিডনী পাথরের ব্যাথা খুব তীব্র হয়। ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যথা স্থায়ী হতে পারে। পাথর ছোট হলে এটা প্রস্রাবের বেগের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আর বড় হলে কিডনী বা ইউরেটারেরমধ্যে আটকে যাবে। দুইদিকের কিডনীতে বা ইউরেটারে একত্রভাবে বড় পাথর হলে প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে বা খুব অল্প অল্প রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব বা হেমাচুরিয়া হবে। কিছু কিছু রোগীর কোন ব্যথা হয় না।

খ) রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব বা হেমাচুরিয়া–অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা বা ব্যাথাছাড়া প্রস্রাব যেতে পারে। পরে এক্সরে করলে কিডনী বা ইউরেটারে পাথর দেখা দিতে পারে।

গ) ষ্টোন পাসার–এ, সমস্ত রোগীর সাধারণতঃ ব্যথা থাকে না তবে মাঝে মাঝে প্রস্রাব দিয়ে পাথর বের হয়ে যাবে এবং এক্সরে করলে ছোট ছোট পাথর ধরা পড়বে।

ঘ) একুইট কিডনী ফেইলিওর – দুই পার্শ্বের ইউরেটারে একত্রে পাথর হলে এনুরিয়া বা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে একুট রেনাল ফেইলিওর হবে, এটা একটা মেডিকেল ইমর্জেন্সী এবং তাৎক্ষনিক ভাবে এর চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

ঙ) ক্রনিক রেণাল ফেইলিওর বহুদিন ধরে লক্ষণহীন যুক্ত পাথর থাকলে রোগীর হাইপারটেনশান বা এর জটিলতা ডেভেলপ করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে লবণ জমা হতে হতে এতে ডাল পালা সমৃদ্ধ পাথর যা ষ্টাগহর্ণ পাথরও হতে পারে যা পেলভিসএবং ক্যালিসিয়াল সিষ্টেম উভয়ই জুড়ে থাকে।

ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং ঃ

ল্যাবরেটরী ফাইণ্ডিং ঃ গ্রস এবং মাইক্রোসকপিক হেমাচুরিয়া, পাইয়ুরিয়া, কিছু কিছু ক্ষেত্রে Albumin (+) থেকে (++) যেতে পারে।

সিরাম এর বিভিন্ন পাথর তৈরীর উপাদান এবং সংযুক্ত মেটাবলিক কোন রোগ আছে কিনা তা নির্ণয় করা ।এক্সরে –প্লেন এক্সরে এবডোমেন বা কে ইউ বি, আই ভি পি, আলট্রাসনোগ্রাফি।

ডি/ডি ঃ

- একুইট পাইলোনেফ্রাটিস
- রেণাল টিউমার
- রেণাল টিউবারকুলোসিস
- ইউরিনারী ট্রাক্ট ইনফেকশান (UTI)

জটিলতা ঃ

- ইনফেকশান, অবষ্ট্রাকশান (obstruction)
- একুট রেণাল ফেইলিওর
- ক্রনিক রেণাল ফেইলিওর
- হাইপার টেনশান

banglainternet.com

চিকিৎসা ঃ-

- ছোট পাথর (১-১.৫ইঞ্চি ব্যস) পানি বেশী খেলে এমনিতেই বেড়িয়ে যাবে
- বড় পাথর হলে পারকিউটেনিয়াস নেফ্রেকটমী, মেকানিক্যাল, আলট্রা-সাউণ্ড বা ইলেকট্রো হাইড্রোলিক ডিজইনটিগ্রেশন।
- কদাচিত নেফ্রেকটমী।
- ইনফেকশান থাকলে সঠিক ও উপযুক্ত এন্টিবায়োটিক এবং কোন এবসেস থাকলে তা ড্রেইন করতে হবে।

প্রগনোসিস ঃ

অবষ্ট্রাকশান দূর করতে পারলে , ইনফেকশান নিয়ন্ত্রণ করলে প্রগনোসিস ভাল। কিডনীতে যেন আর পাথর না হয় তার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১. প্রথমে সংগৃহীত পাথরের কেমিকাল এনালাইসিস বা রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এর গঠন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

২. পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে কোন মেটাবলিক রোগ আছে কিনা তা বের করে চিকিৎসা করতে হবে।

৩. প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ৩-৫সের পানি খেতে হবে যাতে প্রস্রাব খুব তরল হয়।

৪. প্রস্রাবের পি এইচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৫. যদি হাইপার ইউরেকোসুরিয়া থাকে তাহলে এলুপুরিণল ১০০ মিলিগ্রাম দিনে দুবার দিতে হবেসঙ্গে পিউরিন যুক্ত খাবার বেশী করে খেতে বলতে হবে।

৬. যদি ইডিওপ্যাথিক হাইপারক্যালসিউরিয়া থাকে তাহলে ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবারের পরিমান কমাতে হবে। ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার (দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্য), ক্যালশিয়াম যুক্ত ঔষধ পরিহার করতে হবে। থায়াজাইড ডায়ুরেটিক ৫.০ মিলিগ্রাম দিনে একবার খেতে বলতে হবে, সঙ্গে লবন কম খাবে। এতে ক্যালশিয়াম নির্গমন কমবে এবং ম্যাগনেশিয়াম নির্গমণ বাড়বে। ইনঅর্গানিক অর্থোফসফেট একা বা থায়াজাইড ডায়ুরেটিক সহ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ইন্টেসটিনাল এবসরপশন কমানোর জন্য সেলুলোস ফসফেট চিলেট ব্যবহার করা যায়। সঙ্গে ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার কম খেতে বলতে হবে এবং ম্যাগনেশিয়াম যুক্ত খাবার বেশী খেতে বলতে হবে। এতে পাথর তৈরীর প্রবণতা কম হবে।

৭. ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ক্যালশিয়াম লবণের সাথে প্রিসিপিটেশন রোধ করে। ফলে যদি পাথরে ক্যালশিয়াম থাকলে অক্সালেট খাওয়া কম করতে হবে। সে জন্য কোকা, চা, রুবার্ব, শালগম, বিট, বাদাম, বেশী ভিটামিন সি খাওয়া পরিত্যাজ্য।

৮. ইউরিক এসিড ষ্টোন বন্ধ করা সম্ভব যেমন জ্বানথিন থেকে ইউরিক এসিড হওয়া বন্ধ করা যায় এলোপুরিনল দিয়ে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৬০০ মিলিগ্রাম /ডি,এল (৩০০ মিলিগ্রাম প্রতি১২ ঘন্টায়) দিলে ইউরিক এসিডের পরিমান কমে আসবে এবং নির্গমন কম হবে। গাউট ও অন্যান্য মাইলোপ্রলিফারেটিভ ডিজঅর্ডারস এর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

৯. সিসটিন ষ্টোন হলে প্রস্রাবের পরিমান ৩-৪ লিটার প্রতিদিন রাখতে হবে। প্রস্রাবের পি এইচ কে এলকালাইন করে (সোডিয়াম বাই কার্বনেট, সোডিয়াম সাইট্রেট এবং এসিটাজোলামাইড) রাখতে পারলে নতুন ভাবে সিসটিন ষ্টোন হওয়া বন্ধ করা সম্ভব। ডেকট্রো পেনিসিলামিন (৩০ মিঃ গ্রাম/ কেজি/দিন) দেয়া হয়। তবে অনেক সময় ত্বকে র‍্যাশ করে এবং নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম হোতে হতে পারে।

১০. ইনফেকশান থাকলে তা সঠিক ভাবে এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

banglainternet.com

২য় অধ্যায়

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিডনীর টিউমার
(KIDNEY TUMOUR)

এম, এ ওয়াহাব
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

বেনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট উভয় ধরণের টিউমার কিডনীতে হতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অটোপসিতে বেনাইন টিউমার এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তবে এর কোন ক্লিনিক্যাল তাৎপর্য নেই। অপর পক্ষে কিডনীর ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সমূহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সমূহের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের বেলায় রেণাল সেল কার্সিনোমাএবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে উইলমস টিউমারখুব বেশী দেখা যায়।

শ্রেণী বিন্যাস ঃ

ক) বেনাইন ঃ
- কর্টিক্যাল এডেনোমা
- রেনোমেডুলারী ইন্টারষ্টিশিয়াল টিউমার। রেণাল ফাইব্রোমা, হারমারটোমা
- অন্যান্য বেনাইন টিউমার।

খ) ম্যালিগন্যান্ট ঃ
- রেনাল সেল কার্সিনোমা (হাইপারনেফ্রোমা, এডেনোকার্সিনোমা)
- উইলমস টিউমার (নেফ্রোব্লাষ্টমা)
- রেণাল পেলভিস (ইউরোথেলিয়াল কার্সিনোমা)

রোগ নির্ণয়ের জন্য ঃ
- ব্যাথামুক্ত গ্রস হেমাচুরিয়া
- জ্বর
- বড় কিডনী যা সহজেই পালপেবল
- মেটাসটাসিস এর এভিডেন্স।

রেণাল সেলকার্সিনোমা

(হাইপারনেফ্রোমা, এডেনোকার্সিনোমা কিডনী)

উন্নত বিশ্বে সমস্ত ভিসেরাল ক্যান্সারের মধ্যে রেণাল সেল কার্সিনোমার ইনসিডেন্স এর হার শতকরা ১ থেকে ৩ ভাগ। প্রাপ্ত বয়স্কদের রেনাল ক্যান্সারেরমধ্যে শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ হচ্ছে রেণাল সেল কার্সিনোমা। সাধারণত ৬০ বৎসর বা তার উর্দ্ধের বয়সের লোকদের এই ক্যান্সার হয়ে থাকে। মহিলা এবং পুরুষের এই ক্যান্সারের অনুপাত ৩ ঃ ১। এর বাহ্যিক রং হলুদাভ হওয়ার জন্য এবং টিউমার সেলের চেহারা করেটেক্স এর ক্লিয়ার সেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আগে ধারণা করা হতো এ ক্যান্সার এড্রেনাল রেষ্ট থেকে উদ্ভূত। কিন্তু বর্তমানে এটা প্রমানিত যে এটা কিডনীর টিবিউলার ইপিথেলিয়াম থেকে উঠে।

কারণ ঃ পরীক্ষাগারে জীবজন্তুর উপর বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল এবং ভাইরাস ইনজেক্ট করে রেনাল এডেনো কার্সিনোমা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। তবে এর মধ্যে কতগুলো মানুষের রেণাল সেল কার্সিনোমার জন্য দায়ী তা সঠিক ভাবে বলা মুসকিল। তবে ইপিডেমিওলজীক্যাল ষ্টাডি করে দেখা গেছে যারা ধুমপায়ী , পাইপ বা সিগার খান তাদের মধ্যে এর হার তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক লোকের থেকে বেশী।জেনেটিক ফ্যাক্টর এরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে রেনাল কার্সিনোমায়। ভন হিমুল লিণ্ডু সিনড্রোম এর রোগীদের প্রায় $\frac{১}{২}$ অংশ রোগী উভয় পার্শ্বের কিডনীতে রেণাল কার্সিনোমায় ভোগে। খুব সাম্প্রতিক কালে একটি পরিবারে যাদের এডেনোকার্সিনোমা ছিল তাদের ক্রোমোজম এনালাইসিস করে দেখা গেছে ক্রমোজোম নাম্বার ৩ ও ৮ এর মধ্যে ট্রান্সলোকেশান হয়েছে। বেনাইন রেণালকর্টিক্যাল এডেনোমা যার ব্যাস ৩ সেন্টিমিটার এর বেশী তাদের ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশান হওয়ার সম্ভাবণা বেশী থাকে।

banglainternet.com

মরফোলজী ঃ

খালি চোখে রেণাল সেল কার্সিনোমার কিডনী প্রত্যক্ষ করলে খুব বৈশিষ্ট পূর্ণ হয়। কিডনীর যে কোন অংশ থেকে এটা উঠতে পারে তবে সাধারণতঃ যে কোন প্রান্ত বিশেষতঃ উপরের প্রান্তে এটা বেশী হয়। একদিকের কিডনীতে একটি লেশিওন হিসেবে এটা বড় হয় তবে কোন কোন সময় উভয় পার্শ্বের কিডনীতে একই সাথে এই টিউমার বড় হতে পারে। দেখতে এটা গোলাকৃতি, ব্যাস ৩ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার, রং হলুদাভ সাদা।সাধারণতঃ এর মধ্যে ইসকিমিক নেক্রোসিস বা রক্তপাতসহ কোষ নাশের চিহ্ন থাকবে। এর মার্জিন বা ধার পরিস্কার ভাবে চিহ্নিত এবং অন্যান্য টিস্যু থেকে আলাদা যা অনেক সময় এনক্যাপসুলেটেড বলে মনে হবে। তবে ভাল ভাবে দেখলে এর ছোট ছোট নেষ্ট চর্তুদিকের কিডনীতে দেখতে পাওয়া যাবে। টিউমারটি আকারে যত বড় হবে ততই এটা ক্যালিস এবং পেলভিস ভেদকরে ইউরেটার পর্যন্ত চলে যাবে। এই টিউমারএর একটা বৈশিষ্ট হোল এটা রেণাল ভেইনে মেটাসটিসাইজ করে তাড়াতাড়ি।

মাইক্রোসকপিক্যাল চেহারা ঃ

হিষ্টোলজীক্যালী এটা এডেনো কার্সিনোমা তবে এর গ্রোথ প্যাটার্ণ সলিড, ট্রাবিকুলার বা টিবিউলার হতে পারে। সেল টাইপের মধ্যে বেশীরভাগ ক্লিয়ার সেল টাইপ এবং কিছু গ্রানুলার সেল টাইপ হয়ে থাকে। নিউক্লিয়াসের অস্বাভাবিকতা এবং সংযুক্ত ইনফিলট্রেশান বা আগ্রাসণের উপর ভিত্তি করে একে ৪টি ভাগ করা যায় যেমন গ্রেড-১ , গ্রেড-২, গ্রেড-৩ এবং গ্রেড-৪ ।এই টিউমারের ষ্ট্রোমা খুব কম কিন্তু অত্যন্ত ভাসকুলার। সঙ্গে রক্তপাত , স্কার এবং ক্যালসিফিকেশন এর অতিরিক্ত হিষ্টোলজক্যিাল বৈশিষ্ট।

ক্লিনিক্যাল কোর্স ঃ এই টিউমারের ৩টি প্রধান ডায়াগনোষ্টিক লক্ষণ হচ্ছে (ক) ভার্টিব্রাল এঙ্গেলে ব্যথা (খ) পালপেবল মাস (গ) হেমাচুরিয়া । কিন্তু এই তিনটি লক্ষণ মাত্র শতকরা ১০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। তবে শতকরা ৯০ভাগ রোগীর লক্ষণ হচ্ছে হেমাচুরিয়া। এর সঙ্গে জ্বর, ম্যালাইজ, দূর্বলতা এবং ওজন কমে যাওয়া থাকতে পারে। আবার শতকরা ১০ জন রোগীর ক্ষেত্রে কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না শুধুমাত্র টিউমারটি বড় হতে হতে এত বড় হয় যে পেটের দিকে তাকালে তা চোখে পড়বে। এগুলো ছাড়াও একটোপিক হরমোন বা হরমোন জাতীয় পদার্থ নিঃসরণের কারণে রেণাল সেল কার্সিনোমার কতগুলো আলাদা লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। যেমন,

ক. পলিসাইথেমিয়া (শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ রোগীর হয় এরিথ্রোপয়টিন নামক হরমোন নিঃসরণের কারণে)।

খ. হাইপারক্যালসেমিয়া (প্যারাথাইরয়েড সম পদার্থ নিঃসরণের জন্য)

গ. উচ্চ রক্তচাপ (রেণিন নামক হরমোন নিঃসরনের ফলে)

ঘ. ফেমিনাইজেশন বা মাসকুলানাইজেশন (গোনাডোট্রপিন নিঃসরণের জন্য)।

ঙ. কুশিং সিনড্রোম (গ্লুকোকর্টিকয়েড নিঃসরণের ফলে)

চ. ইউসিনোফিলিয়া এবং লিউকোময়েড রিএকশানস

ছ. এমাইলয়ডোসিস।

এই টিউমারের একটা প্রধান বৈশিষ্ট হোল কোন রকম লোকাল বা স্থানীয় লক্ষণ প্রকাশ করার আগেই মেটাসটিসাইজ করা। প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ নতুন রোগীর রোগ নির্ণয়ের পূর্বে এক্সরে করলে মেটাসটাসিস দেখা যাবে। যে সমস্ত স্থানে এই টিউমার মেটাসটাসিস করে ক্রমঅনুসারেসেগুলো হচ্ছে ফুসফুস (শতকরা ৫০ভাগ), হাড় (শতকরা ৩৩ ভাগ) লিম্ফ নোড, লিভার ও ব্রেইন । এ-ছাড়াও শতকরা ১০ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে বিপরীত পার্শ্বের কিডনীতে এটা মেটাসটাসিস করতে পারে। উপরন্তু শরীরের যে কোন স্থানে এমনকি চোখ এবং ভ্যাজাইনাতেও এটা মেটাসটাসিস করতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ

রোগ নির্ণয়ের জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা গুলো করা হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল প্রসাব পরীক্ষা, এক্সরে, আলট্রাসাউণ্ড, নেফ্রোটমোগ্রাফী, ক্যাটস স্কানিং ইত্যাদি। এই ক্যান্সারের একটা বৈশিষ্ট হোল এর ভাসকুলার প্যাটার্ন। এই জন্য প্রায় শাতকরা ৯০ ভাগ রোগীর রেণাল আর্টারিওগ্রাফী খুব সহায়ক হয়। এ ছাড়াও প্রস্রাবের সাইটোলজী টিউমার সেল চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়।

চিকিৎসা ঃ

নেফ্রেকটমী এবং কেমোথেরাপী যত শীঘ্রই সম্ভব শুরু করলে বিশেষতঃ যাদের মেটাসটাসিস হয়নি সেই সমস্ত রোগীর ৭০ ভাগ ৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। যাদের ইতিমধ্যে মেটাসটাসিস হয়েছে তাদের ৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচার হার শতকরা ৪৫ ভাগ। যাদের রেণাল ভেইন, পেরিনেফ্রিক ফ্যাট এফেকটেড

banglainternet.com

হয়েছে তাদের ৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচার হার শতকরা ২০ ভাগ।

উইলমস টিউমার (নেফ্রোব্লাসটোমা)

১০ বৎসর বয়সের নীচের শিশুর এটা একটা উল্লেখযোগ্য ক্যান্সার। সাধারণতঃ ১ থেকে ৪ বৎসর বয়সের শিশুদের মধ্যে এই ক্যান্সার খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। তবে খুব স্বল্প ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্কদেরও এই টিউমার হতে পারে। এই টিউমার হওয়ার ফলে বাচ্চাদের পেট স্বাভাবিকের তুলনায় বড় হয়, হেমাচুরিয়া হয়, সংগে পেটে ব্যাথা বা ভারী ভাব থাকে। এর সংগে ইন্টেশটিনাল অবষ্ট্রাকশন এবং উচ্চ রক্ত চাপও থাকতে পারে। রোগ নির্ণয়ের সময় অনেকেরই লাংগস এ মেটাসসিস থাকতে পারে। খালি চোখে দেখলে টিউমারটি খুব বড়, গোলাকৃতি হয় যা স্বাভাবিক ছোট কিডনীকে ঢেকে রাখে। এটা সাধারণতঃ এক দিকের কিডনীতে হয়ে তবে শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ রুগীর ক্ষেত্রে উভয় পার্শ্বের কিডনীতে হতে পারে। টিউমারটি কাটলে বিভিন্ন ধরণের টিস্যু যেমন সফট ফিশ ফ্লেশ এপিয়ারেন্স, শক্ত হায়ালিন কার্টিলেজ, হেমোরেজিক এরিয়া দেখতে পাওয়া যাবে। হিষ্টোলজীক্যালী এবরটিভ গ্লোমেরুলাই সংগে এবরটিভ টিবিউলস, স্পিনডেল ষ্ট্রমা দেখতে পাওয়া যাবে। অতিরিক্ত ভাবে মাসল, কোলাজেন, কার্টিলেজ, বোন, ফ্যাট ফাইব্রাস টিস্যু উপস্থিত থাকবে।

চিকিৎসা ঃ

কেমোথেরাপী, রেডিওথেরাপী, সার্জারী, একত্রে করলে শতকরা ৯০ ভাগ রোগী বহুদিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

বেনাইন টিউমার

কর্টিক্যাল এডেনোমা ঃ ছোট আকারের, আলাদা এডেনোমা সাধারণতঃ রেণাল টিবিউল থেকে উদ্ভূত এবং খুব প্রচলিত ভাবে অটোপসিতে দেখতে পাওয়া যায় (শতকরা ৭ থেকে ২২ ভাগ) এগুলোর ব্যাস ২ সেন্টিমিটার এর নীচে হয়। এগুলো স্বভাবতই করটেক্স এ অবস্থিত থাকে এবং দেখতে হাল্কা হলুদ, ক্যাপসুলেটেড আলাদা মাস হিসেবে উপস্থিত থাকে। মাইক্রোসকপিক্যালী অনেক ধরণের বেনাইন টিউমার দেখতে পাওয়া যায় যেমন কমপ্লেক্স ব্রাঞ্চিং, প্যাপিলোমেটাস ইত্যাদি। এই বেনাইন টিউমারের গ্রোথ প্যাটার্ণ মোটামুটি রেগুলার এবং এটিপিয়া থেকে মুক্ত। এগুলো কিউবয়ডাল বা পলিগোনাল হয় এবং নিউক্লিয়াস স্বাভাবিক এবং সাইটোপ্লাজমে ভ্যাকুলেটেড থাকে। হিষ্টোলজীক্যালী এই টিউমার রেণাল

সেল এডিনোকার্সিনোমা থেকে পৃথকীকরণ সম্ভব নয় আকার ছাড়া। যে টিউমার ৩ সেন্টিমিটার ব্যাস এর উপরে সেগুলো সাধারণতঃ মেটাসটাসাইজ করেনা।

অন্যান্য বেনাইন টিউমার ঃ

অন্যান্য টিউমার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল রেনোমেডুলারী ইন্টারষ্টিশিয়াল টিউমার, এনজিওফাইব্রোলাইপোমা, রেনিন প্রডিউশিং জাকষ্টাগ্লোমেরুলার সেল টিউমার, অকজোসাইটোমা ইত্যাদি। এর মধ্যে জাকষ্টগ্লোমেরুলার সেল টিউমার সাধারণতঃ বাচ্চাদের হয় এবং সঙ্গে হাইপারটেনশান থাকে। হিষ্টোলজীক্যালী এটা দেখতে হেমাঞ্জিও-পেরিসাইটোমার মত। আর অকজোসাইটোমা হচ্ছে ইপিথেয়াল সেল টিউমার যার কোষ গুলো দেখতে ইউসিনোফিলিক এবং নিউক্লিয়াস গোলাকার, ছোট এবং স্বাভাবিক ।

banglainternet.com

২য় অধ্যায়

৭ম পরিচ্ছেদ

গর্ভাবস্থা ও কিডনী
(KIDNEY IN PREGNANCY)

মতিউর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

গর্ভাবস্থা এবং গর্ভকালীন সময়ে অবষ্ট্রেটিশিয়ানরা অনেক সময় বিভিন্ন কিডনী রোগের ব্যাপারে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। এজন্য চিকিৎসকদের গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন সম্পৃক্ত এনাটমিক্যাল এবং ফাংশনাল পরিবর্তন সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায় কিডনী ঃ

এনাটমিক্যাল পরিবর্তন ঃ– গর্ভাবস্থায় কিডনীর আয়তন ১ সেন্টি মিটার স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং কিডনীর ক্যালিসেস, পেলভিস, ইউরেটার ডাইলেটেড হয়। প্রসবের পর তিন মাসের মধ্যে এই গুলো পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সুতরাং বিভিন্ন রেডিওলজিক্যাল ইনভেষ্টিগেশন যেমন IVU প্রসবের ১২ সপ্তাহ পরে করা ভাল।

ফাংশনাল পরিবর্তন সমূহ ঃ – স্বাভাবিক গর্ভকালীন সময়ে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট (GFR) এবং ইফেক্টিভ রেনাল প্লাজমা ফ্লো (ERPF) স্বাভাবিকের তুলনায় ৫০ – ৬০ ভাগ বেড়ে যায়। গর্ভধারনের শুরু থেকে এটা বাড়তে থাকে এবং ছয় মাসের মধ্যে পিকে উঠে এবং শেষ তিন মাসে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী হয়। এই পরিবর্তনের কারনে রক্তের ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিনের মান স্বাভাবিকের তুলনায় কমে আসে (ইউরিয়া ২৬ মিলি গ্রাম থেকে ১৩ মিলি গ্রাম এবং ক্রিয়েটিনিন ০.৭ মিলি গ্রাল থেকে ০.৫ মিলি গ্রাম)।

সিরাম ইউরিক এসিডের মানও ৪ – ৬ মিলি গ্রাম থেকে ৩ – ৪ মিলি গ্রাম নেমে আসে। সুতরাং গর্ভাবস্থায় সিরাম ক্রিয়েটিনিনের মান ০.৮ মিলি গ্রাম বা ইউরিক এসিডের মান ৪.৫ মিলি গ্রামের উপরে গেলে চিকিৎসকদের হুশিয়ার হতে হবে। এছাড়াও গর্ভবস্থায় প্রসাবের গ্লুকোজ মেহ বা প্রেগনেনসি গ্লাইকোসুরিয়া, এবং প্রোটিনইউরিয়া (৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ ২৪ ঘন্টার বেশী নয়) হতে পারে।

ভলিয়ুম রেগুলেশন এবং সোডিয়াম হেমোষ্টাসিস ঃ

খুব সুস্থ গর্ভবতি মা স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করলে প্রথমে গর্ভাবস্থায় ১২.৫ কেজি এবং পরবর্তী গর্ভাবস্থায় ১ কেজি করে ওজন প্রাপ্ত হয়। প্রায় ৯০০ মিলি গ্রামের বেশী সোডিয়াম গর্ভাবস্থায় শরীরে জমা হয়। ভ্রুন এবং মায়ের একষ্টা সেলুলার ফ্লুইড কম্পার্টমেন্টে এর ফলে ফিজিওলজিক্যাল হাইপার ভলিয়ুম রিসিস্টরস এই অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবে কাজ পরিচালনা করতে পারে বলে খাবার লবন নিয়ন্ত্রন এবং ডায়ুরেটিকস এর ব্যবহার রোগীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় এসিডবেস রেগুলেশন ঃ

গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিকএসিড বেস রেগুলেশন পরিবর্তিত হয়। গর্ভাবস্থার সংগে সংযুক্ত হাইপারভেন্টিলেশনের কারনে হাইপোক্যাপনিয়া হতে পারে। PCO_2 এবং HCO_3 কমের কারনে বাইকার্বোনেট থ্রেসহোল্ড কমে যাবে। এজন্য গর্ভবতী মায়েদের একুইট রেনাল ফেইলিওর সম্পৃক্ত এসিডোসিস এবং ডায়াবেটিক কেটোএসিডোসিসে ভোগার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তবে কিডনী কর্তৃক H^+ আয়ন হ্যাণ্ডলিং গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক থাকে।

গর্ভাবস্থায় উচ্চরক্তচাপ ঃ

গর্ভাবস্থায় মিন রক্ত চাপ খুব প্রাথমিক অবস্থায় কমতে শুরু করে এবং ৬ মাসের মধ্যে গর্ভ ধারণ করার পূর্বের রক্ত চাপের মান স্বাভাবিক থেকে ১০ – ১৫ মিলি মিটার কমে যায়। আবার প্রসবের পূর্বে রক্ত চাপের মান গর্ভধারনের পূর্বের মানের সমান হয়। যেহেতু গর্ভাবস্থায় কার্ডিয়াকআউট পুট বাড়ার কারণে এবং ভাসোডাইলেটেশনের কারনে পেরিফেরাল রেজিষ্ট্যান্ট কমে যায় ফলে রক্ত চাপ স্বাভাবিকের তুলনায় কম হয়। এই জন্য গর্ভাবস্থার ৬ মাসের মধ্যে ৭০ মিলি মিটার এবং পরবর্তী ৩ মাসের ৮০ মিলি মিটার ডায়াসটোলিক প্রেসার স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে এবং এর বেশী হলে চিকিৎসককে সাবধান হতে হবে।

banglainternet.com

গর্ভাবস্থায় উল্লেখযোগ্য কিডনীরোগ সমূহ

ইউরিনারী ট্রাক্ট ইনফেকশান (UTI)

এসিম্পটোমেটিক ব্যাকটেরিউরিয়া ঃ গর্ভবতী মায়ের এসিমটোমেটিক ব্যকটিরিউরিয়া হওয়ার হার ৪ – ৭ ٪ যা যৌনক্ষম অগর্ভবতী মায়েদের প্রায় সমান। তবে পার্থক্য হলো অগর্ভবতী মেয়েদের এটা বেশীর ভাগ বেনাইন অবস্থায় থাকে এবং গর্ভবতী মায়েদের লক্ষন সমূহ প্রকাশ পায়। গর্ভধারণকারী মায়েদের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগের এই এসিমপটোমেটিক ব্যাকটিরিউরিয়া থেকে একুইট সিমটোম্যাটিক UTI বা একটু পাইলোনেফ্রাইটিস হতে পারে। সেজন্য গর্ভবতী মেয়েদের প্রস্রাবের কালচারে গ্রোথ থাকলে এন্টিবায়োটিক সহযোগে চিকিৎসা করাতে হবে।

একুইট পাইলোনেফ্রইটিস

এটা একটি মারাত্মক অবস্থা যা সব গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ১–২٪ আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এই অবস্থা গর্ভবতী মায়ের ভ্রুণের জন্মগত অস্বাভাবিকতা, ভ্রুণের মৃত্যু এবং প্রিম্যাচুর লেবার ইনডাক্ট করতে পারে। রোগ নির্ণয় খুব সহজ কারণ এ সমস্ত রোগী একুইট ইনফেকশানের স্থানীয় ও সাধারণ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ করে। তথাপি সঠিক ব্যাকটেরিয়া চিহ্নিত করণ, রোগ নির্ণয় এবং ম্যানেজমেন্ট খুব জরুরী।

ব্যবস্থাপত্র ঃ

ক) এসিমপটোম্যাটিক ব্যাকটেরিউরিয়া হলে ২ সপ্তাহ এন্টিব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট (এমপিসিলিন বা সেফালোস্পোরিণ) দিয়ে চিকিৎসা করলে যথেষ্ট।

খ) রিলাপ্স (৬ সপ্তাহের মধ্যে একই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ব্যকটেরিউরিয়া হলে) এবং পুনঃ পুনঃ প্রদাহ (যে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে প্রথম প্রদাহ হয়েছিল সেটা বাদে অন্য প্রদাহ হলে) ২য় কোর্স এন্টিবায়োটিকসএর প্রয়োজন হয়। পুনর্বার প্রস্রাব কালচার করা গুরুত্বপূর্ণ তবে লংটার্ম প্রোফাইল্যাটিক এন্টিবায়োটিক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না এসিমটোম্যাটিক ব্যকটিরিউরিয়ায়। তবে একুউট সিমটোমেটিক ইউরিনারী ট্রাক্ট ইনফেকশানে যার সঙ্গে জ্বর, বমি, পিছনে মাজায় ব্যথা থাকলে এ সমস্ত রোগীদের হাসপাতালে চিকিৎসা করতে হবে।কারণ এই রোগীরা সাধারণতঃ ডিহাইড্রেড থাকে যা কারেক্ট করার জন্য ফ্লুয়িড থেরাপী প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত

এন্টিবায়োটিক (সাধারণত এমপিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন) প্রথমে ইনজেকশান দিয়ে পরে খাওয়ার ব্যবস্থাকরতে হবে। এন্টিবায়োটিক থেরাপী ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত চালাতে হবে এবং পরবর্তী প্রতি ২ সপ্তাহ পর পর প্রসাব কালচার করতে হবে। এরপরও যদি রিকারেন্স হয় তাহলে লংটার্ম প্রোফাইলাকটিক এন্টিবায়োটিক থেরাপী যেমন লোডোজ নাইট্রোফুরান্টয়েন দেওয়া যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডারস ঃ

গর্ভাবস্থায় ২৫٪ ক্ষেত্রে হাইপারটেনশান দেখা যায়। প্রি একলাম্পসিয়ার কারণেও হাইপারটেনশান হতে পারে। তবে এসেনসিয়াল হাইপারটেনশান সাধারণতঃ প্রি এক্সজিসটিং রেণাল ডিজিজ এর কারণে হয়ে থাকে যার মধ্যে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস বা পাইলোনেফ্রাইটিস উল্লেখ যোগ্য। গর্ভবতী মা ন্যালিপ্যারা না মাল্টিপ্যারা , গর্ভাবস্থায় ১ম তিন মাস না শেষ তিন মাস এসমস্ত বিষয় হাইপার টেনশানের চিকিৎসা শুরুর সময় বিবেচনা করতে হবে।

প্রি একলাম্পশিয়া ঃ

প্রি একলাম্পশিয়া সাধারণতঃ নালিপ্যারা মহিলার গর্ভধারনের ২০ সপ্তাহ পর প্রকাশ পায় এবং রোগীর ইডিমা, প্রোটিনইউরিয়া এবং হাইপারটেনশান থাকে। বাংলাদেশে সঠিক এন্টিনেটাল কেয়ার এর অভাবে রেনাল ডিজিজ এবং প্রি একলাম্পশিয়া পৃথকীকরণ করা খুবই মুস্কিল। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে প্রি একলাম্পশিয়া রোগীদের ভাসোকনষ্ট্রিকশান, হেমোকনসেনট্রেশান এবং ইন্ট্রভাসকুলার ভলিউম কম থাকে।

গর্ভাবস্থায় হাইপারটেনশনের ব্যবস্থা ঃ

নীচের ঔষধগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক) আলাফা মিথাইল ডোপা।

খ) হাইড্রোলাজিন।

গ) বিটাব্লকারস এর ব্যবহার তর্ক সাপেক্ষ।

ঘ) ডায়ুরেটিকস এর ব্যবহার তর্ক সাপেক্ষ। যদি রোগী ইডিমেটাস থাকে তা হলে লুপ ডায়ুরেটীক ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঙ) কনভালশান বন্ধ করার জন্য ইনজেকশান ডায়াজেপাম এবং $MgSO_4$ (আমেরিকায় বেশী ব্যবহৃত হয়) ব্যবহার করা যেতে পারে।

banglainternet.com

প্রি একজিসটিং রেনাল ডিজিজ সম্পৃক্ত এসেনসিয়াল হাইপারটেনশান এবং হাইপারটেনশান ঃ

গর্ভাবতী মায়েদের আগে থেকে হাইপারটেনশান এবং রেণাল ফেইলার থাকলে গর্ভাবস্থায় খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে। সুতরাং এটা অত্যন্ত জরুরী যে এ সমস্ত গর্ভবতী মায়েদের ব্লাডপ্রেসার এবং রেনাল ফেইলার সার্বক্ষনিক ভাবে মনিটর করতে হবে এবং গর্ভস্থিত ফিটাসের অবস্থা সব সময়ই মনিটর করতে হবে।

গ্লোমারুলোনেফ্রোইটিস ও নেফ্রোটিক সিণ্ড্রোম ঃ

অনেক ক্ষেত্রে গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম থাকলে প্রসুতিকে যথাযথ ব্যবস্থাপণার মাধ্যমে সময়মত ডেলিভারী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে আগে থেকেই যদি কিডনী ফাংশন অনেক কম থাকে তা হলে এ্যাকুট অন রেনাল ফেয়লিওর হোতে পারে যখন প্রেগন্যান্সি টারমিনেট করা প্রয়োজন হতে পারে।

একুট রেনাল ফেয়লিওর ঃ

বাংলাদেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রসূতিদের একুইট রেনাল ফেইলিওর দেখা যায় যদি প্রসূতি অনভিজ্ঞ হাতুড়ে দাই দ্বারা প্রসব করিয়ে থাকেন। সাধারণত এই ক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ ও ইনফেকশান এর কারণে একুট রেনাল ফেয়লিওর হয়। অথবা ডেলিভারীর সময় রক্তক্ষরণ বা প্রি একলাম্পশিয়া থাকলেও একুট কিডনী ফেয়লিওর হতে পারে। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় শক বা DIC থাকতে পারে। তবে একুট কিডনী ফেয়লিওর ডায়াগনোসিস হলে তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ও প্রয়োজন মত ডায়ালাইসিস করা হলে একুট কিডনী ফেয়লিওর এর রেজাল্ট খুব খারাপ হয় না।

চিকিৎসা ঃ

১) প্রাথমিক অবস্থায় হেমোগ্লোবিণ, টিসি, ডিসি, প্লাটিলেট কাউন্ট, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন এবং ইলেকট্রোলাইট এবং প্রসাব রুটীন ও কালচার এবং ব্লাড কালচার করাতে হবে।

২) ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট।

৩) রক্ত দেয়া যেতে পারে।

৪) উপযুক্ত এন্টি বায়োটিক।

৫) শক থাকলে উচ্চমাত্রায় ষ্টেরয়েড।

৬) DIC থাকলে হেপারিন দেয়া যেতে পারে।

৭) ডায়ালিসিস – পেরিটোনিয়াল বা হেমোডায়ালিসিস করা যেতে পারে।

banglainternet.com

২য় অধ্যায়

৮ম পরিচ্ছেদ

জেনিটো ইউরিনারি টিউবারকুলোসিস
(GENITO URINARY TUBERCULOSIS)

মতিউর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

ভূমিকা ও প্রকোপ ঃ

যদিও সঠিক এন্টি টিউবারকুলাস চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের ফলে উন্নত বিশ্বে সব ধরণের যক্ষা রোগের প্রকোপ কমেছে তথাপি উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশ সমুহে যক্ষা এখনও একটি প্রধান সংক্রামক রোগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে প্রায় ৫ কোটির মত নতুন যক্ষা রোগী আছে যার বেশীর ভাগ উন্নয়ণশীল দেশে। শরীরের ইমুনিটি কম হওয়ার ফলে, অপুষ্টি,অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ঘন বসতি ইত্যাদির কারণে এই রোগ ছড়ায় এবং শরীরের যে কোন অর্গান ইনভলমেন্ট করতে পারে। এই পরিচ্ছেদে আমরা শুধু ইউরিনারী টিউবারকুলোসিস সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। কিডনী সম্পৃক্ত যক্ষা রোগ সম্পর্কে সর্ব প্রথম মেডলার (১৯২৬–১৯৪৯) সনে ৩০ জন পালমোনারী যক্ষা সম্পৃক্ত রোগীর কিডনী হিষ্টোলজিক্যালী প্রমান করে দেখান যে রেনাল ও জেনিটোইউরিনারী লেসিওন রক্ত বাহিত। এর পর ১৯৩৭ সনে ওয়াইল্ডবোলডজ মেডলারস এর তত্ব জোরালো করে এই সম্পৃক্ততার নাম দেন জেনিটোইউরিনারী টিউবারকুলোসিস। এই জেনিটো ইউরিনারী টিউবারকুলোসিস এর প্রকোপ খুব মারাত্মক কারণ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে জেনিটোইউরিনারী টিউবারকুলোসিস ইংল্যাণ্ডে প্রতি ১ লাখে ১৩ জন অথচ উন্নয়নশীল দেশে এই হার ১ লাখে ৪০০ জন।

কারণ ও জনন ঃ

মানুষেয় বেলায় যক্ষা রোগের প্রধান কারণ মাইকোব্যাকটেরিয়াম

টিউবারকুলোসিস নামক জীবানু। এই জীবানু খুবই সংক্রামক ও ভিরুলেন্ট। এই জীবানুর বৈশিষ্ট হোল এটা খুব আস্তে আস্তে বাড়ে, ফাগোসাইটস এর এসিড p^H এটা বাড়াতে পারে, এন্টিবায়োটিকে খুব সাসটিপটিবল এবং এটা সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। জেনিটোইউরিনারী টিউবারকুলোসিস সাধারণতঃ ফুসফুসের প্রাইমারী যক্ষা রোগের স্থান থেকে সেকেণ্ডারীলী রক্ত বাহিত ভাবে ছড়িয়ে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুরানো ফোকাস থেকে রি একটিভেশন হয় যা ডেবিলিটেটিং রোগ যেমন ইমুইন সাপ্রেসড অবস্থা, মারাত্মক আঘাত, ডায়াবেটিস ইত্যাদির ফলে ইনফেকশান হয়ে প্রকাশ পায়।

রেনাল টিউবারকুলোসিস

প্রাইমারী পালামোনারী টিউবারকুলোসিস থেকে রক্ত বাহিত হয়ে রেনাল লেসিওন হয়। প্রথমে জীবানু কিডনীর ছোট ছোট রক্তনালী তে তারপর গ্লোমেরুলাই বাসা বাধে এবং বংশবৃদ্ধি করে। এর পরবর্তীতে এখানে মাক্রোফেজ এনগালফ করে মাইক্রোসকপিক ফোসাই তৈরী করে।এর পর গ্রানুলোমা তৈরী হয় যার মধ্যে থাকে ইপিথেলিস্তয়েড সেল, চার পার্শ্বে লিমফোসাইট ও ফাইব্রোসিস এবং এর মধ্যে ল্যাংহ্যান্স জায়ান্ট সেল। এর পরের কোর্স নির্ভর করে জীবানুর ভিরুলেন্স ও হোষ্ট এর ডিফেন্স এর উপর। হোষ্ট এর ডিফেন্স যদি ভাল হয় তাহলে এই লেসিওন ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে রিপ্লেসড হবে এবং এর উপর ক্যালশিয়াম সল্ট ডিপোজিশান হবে যা এক্সরেতে দেখা যাবে। আবার জীবানু বেশী ভিরুলেন্ট হলে এবং হোষ্ট ডিফেন্স কম হলে কিডনীতে অনেক টিউবারকুল হবে। এগুলো পরস্পর এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নেক্রোসিস করবে এবং কালেকটিং সিসটেম এর মধ্যে খসে পড়ে প্যাপিলার ধ্বংস প্রাপ্তি ও কোষ বিনষ্টি করবে। এছাড়াও টিউবারকুলাস ব্যাসিলিউরিয়া করবে। এর থেকে বেশী মারাত্মক হলে ক্যালিসকে ইনভলব করবে এবং ক্যাভিটেশন হবে।

ইউরেটার, ব্লাডার ও জননেন্দ্রিয়র টিউবারকুলোসিস ঃ

কিডনীর টিউবারকুলোসিস বৃদ্ধি পেয়ে বা সেকেণ্ডারীলি ইউরেটার, ব্লাডার, ইপিডিডাইমিস, টেষ্টিস, প্রষ্টেট ও ইউরেথ্রা ইনভলব করতে পারে। ইউরেটারের লেসিওন সাধারণত পেলভিও ইউরেটেরাল জাংশান, ইউরেটার এর মিডল থার্ড, বা ইউরেটেরো ভেসিকাল জাংশান হয়ে থাকে। ব্লাডার এর টিউবারকুলোসিস সাধারণত সেকেণ্ডারী ভাবে আসে ইউরেনারিক অরিফিস থেকে যা প্রদাহের কারণে লাল ও ইডিমেটাস হয়ে থাকে।এর পর আস্তে আস্তে ব্লাডার মিউকোসা ইনভলব হয় এবং প্রদাহের ফলে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

banglainternet.com

এর পর পরই খুব অস্বস্তিকর ফ্রিকুয়েন্সীর লক্ষণ সমুহ প্রকাশ পায়। টিউবারকুলোস ইপিডিডাইমিডিস মাঝে মধ্যে জেনিটোইউরিনারী টিউবারকুলোসিস এর লক্ষন হিসেবে প্রকাশ পেতে পারে যেখানে আই ভি ইউ স্বাভাবিক থাকবে এবং সাইনাস ডিসচার্জ কালচার করলে বা ইপিডিডাইমিস থেকে টিস্যু নিয়ে পরীক্ষা করলে কোন টিউবারকুলোসিস এর জীবানু পাওয়া যাবে না। খুবই স্বল্প ক্ষেত্রে প্রষ্টেট গ্লান্ড, ইউরেথ্রা বা পেনিস এর টিউবারকুলোসিস ও হতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ

ক) **নিদানিক উপসর্গ ঃ** উন্নয়নশীল দেশের জেনিটোইউরীনারী টিউবারকুলোসিস এর প্রকাশ এর ধরণ ভিন্ন। এখানে কম বয়সী লোকজন এফেকটেড হয় এবং খুব একটু অবস্থায় জেনিটোইউরীনারী ট্রাক্টের প্রদাহ , ধ্বংসপ্রাপ্তির লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পায়। যদি রোগীর পূর্বে পালমোনারী টিউবারকুলোসিসে ভোগার ইতিহাস থাকে এবং এর সঙ্গে ইউরিনারি লক্ষন থাকে তাহলে চিকিৎসক কে সাবধান হতে হবে। ভারতে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ২০% রোগী যাদের পাল'মোনারী টিউবারকুলোসিস আছে তাদের সংযুক্তজেনিটোইউরিনারী টিউবারকুলোসিসও আছে।

খ) **সাধারণতঃ** হেমাচুরিয়া বিশেষতঃ বেদনাহীন হেমাচুরিয়া যার ধরন ইন্টারমিটেন্ট এই সমস্ত রোগীর রোগ প্রকাশের একটি বিশেষ ধরন। এছাড়াও ফ্রিকুয়েন্সী, হেমোস্পারমিয়া ও উপস্থিত থাকতে পারে। তবে এই লক্ষণগুলো নন স্পেশিফিক। কারন ১০% রোগীর মাক্রোসকপিক হেমাচুরিয়া এবং ৪ % রোগীর হেমোস্পারমিয়া পাওয়া যায়। নীচের টেবিলে বাংলাদেশের একটি সমীক্ষার ফলাফল দেওয়া হোল।

রেনাল টিউবারকুলোসিস রোগীর ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশান

লো গ্রেড জ্বর		৬৬%
লোইনে ব্যথা		৪৭%
হেমাচুরিয়া		৪০%
ফ্রিকুয়েন্সী, ডিসইউরিয়া		৩৩%
তলপেটে ব্যথা, ওয়েষ্টিং		৩৩%
রিটেনশান অব ইউরিন		১৩%

banglainternet.com

ঃ পরীক্ষা নীরিক্ষা ঃ

(১) প্রসাবের রুটীন মাইক্রোসকপিক পরীক্ষা ঃ ২০ পুঁজ সেল / প্রতি হাই পাওয়ার ফোকাসে পাওয়া গেলে এই রোগ সন্দেহ করা হয়। তবে ইকোলাই প্রদাহ বা অন্য কোন প্রদাহের কারনেও এটা হতে পারে।

(২) প্রস্রাবের লোহিত কনিকার উপস্থিতিও তাৎপর্য্যপূর্ণ, যদিও হেমাচুরিয়ার অন্য কারণগুলো এক্সক্লুড করতে হবে।

(৩) পর পর ৩-৫ দিন প্রস্রাবের AFB কালচার এর জন্য পরীক্ষা (লোইনষ্টেন জেনসন মিডিয়া)। এখানেও উন্নত বিশ্বের সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের পার্থক্য আছে। যেমন বাংলাদেশে ১৯৮৫ -৮৮ সনে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শতকরা ১১% রোগীর AFB কালচার পজেটিভ হয়েছে।

(৪) • এক্সরে সহায়ক বিশেষতঃ ক্যালিসিয়াল অস্বাভাবিকতা নির্ণয়ের জন্য।

• সিসটোসকপি - সিষ্টোসকপি এবং বায়োপসি এই রোগ নির্ণয়ে খুব সহায়ক। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ম্যানিপুলেশান এর কারণে একুইট টিউবারকুলোস সিসটাইটিস হয়ে মেনিনজাইটিস যেন না হয়।

• আলট্রোসনোগ্রাফী

• চেষ্ট এক্সরে -পালমোনারী টিউবারকুলোসিস এক্সক্লুড করার জন্য।

(৫) অন্যান্য ঃ- • রক্ত- টিসিডিসি ইএসআর

• টিউবারকুলিন টেষ্ট।

চিকিৎসা ঃ

জেনিটোইউরিনারী টিউবারকুলোসিস এর মেডিসিন সহযোগে চিকিৎসা পালমোনারী টিউবারকুলোসিস এর মতই। তবে প্রচলিত থেরাপী যেমন INH, PAS, TZ, EMB এবং সঙ্গে Streptomycin (প্রথম ২-৩ মাস) সহযোগে ১৮-৩৪ মাস চিকিৎসার চাইতে বর্তমানে দু তিনটি শর্ট রেজিম প্রচলিত যা নীচে বর্ণনা করা হোল।

নয় মাস কেমোথেরাপী

INH — ৩০০ মিলিগ্রাম প্রত্যহ RIF — ৪৫০ গ্রাম –৬০০মিলিগ্রাম প্রত্যেহ EMB — ৮০০ মিলিগ্রাম প্রত্যেহ OR SM — ২০ মিলিগ্রাম / প্রতিকেজি বডি ওয়েট	২ মাস

পরবর্তী ৭ মাস INH ও RIF চালাতে হবে অথবা INH ৫ মিলিগ্রাম /প্রতিকেজি এবং RIF ১০ মিলিগ্রাম / প্রতিকেজি প্রত্যেহ ১ মাস। এর পর INH ৯০০ মিলিগ্রাম এবং RIF ৬০০ মিলিগ্রাম। সপ্তাহে দু বার পরবর্তী ৮ মাসের জন্য। তবে উন্নয়নশীল দেশে INH রেজিষ্টেন্স এর কারণে দুই ঔষধের সমন্বয় বেশী ব্যবহৃত হয় না।

ছয়মাস কেমোথেরাপী

INH = ৩০০ মিলিগ্রাম প্রত্যেহ RIF = ৪৫০–৬০০মিলিগ্রাম প্রত্যেহ পাইরাজিনামাইট ১০০০ মিলিগ্রাম প্রত্যেহ	২ মাস

এর পর INH এবং RIF আরও চারমাস। খুব মারাত্মক ক্ষেত্রে SM বা EMB প্রথম দুমাসে। এই রেজিম জেনিটোইউরেনারী টিউবারকুলোসিস এর জন্য উত্তম।

চারমাস কেমোথেরাপী

উন্নত বিশ্বে এই রেজিম বেশী প্রচলিত।

SM বা EMB INH RIF PZM	প্রথম ২ মাস একত্রে

এর পরবর্তী ২ মাস INH ৬০০ মিলিগ্রাম এবং RIF ৯০০ মিলিগ্রাম প্রতি সপ্তাহে ৩বার।

ছয়মাস ও চারমাসের রেজিম উন্নত বিশ্বে সাফল্যজনক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে ড্রাগ রেজিষ্টেন্স কম হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে

ঔষধের স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা হেতু ছয় থেকে নয় মাসের রেজিম প্রচলিত করা যুক্তি সঙ্গত।

ষ্টেরয়েড ঃ

যেখানে খুব মারাত্মক ব্লাডার অসুবিধা থাকে প্রেডনিসলোন ২০ মিলিগ্রাম প্রত্যেহ তিনবার, ৪ সপ্তাহে পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

কেমোথেরাপী ঃ

রেনাল ফেওলিওর রোগী যাদের জেনিটোইউরিনারী টিউবারকুলোসিস আছে তাদের SM ও EMB মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। কারণ এই দুই ঔষধ কিডনী দিয়ে নির্গত হয়। সাধারণতঃ ৫০% মাত্রা কমানো হয়। INH, RIF, PZM যেহেতু লিভার দিয়ে মেটাবোলাইজড হয় সেহেতু এদের মাত্রা কমানোর প্রয়োজন হয় না।

টক্সিসিটি ঃ

সাধারণতঃ এন্টিটিউবারকুলাস ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে মারাত্মক টক্সিসিটি হয় না। হাইপারসেনসিটিভিটি এবং হেপাটোটক্সিসিটি হতে পারে। RIF, INH, PZM জণ্ডিস এবং লিভার এনজাইম এর মান বাড়াতে পারে। জণ্ডিস দেখা দিলে ঔষধ বন্ধ করতে হবে এবং জণ্ডিস ভাল হলে পুনরায় ঔষধ শুরু করতে হবে। প্রাথমিক ভাবে ২ সপ্তাহ অর্ধেক মাত্রা এবং পরে আকাংখিত মাত্রায়।

banglainternet.com

৩য় অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

এ্যাকুট রেণাল ফেইলিওর
(ACUTE RENAL FAILURE - ARF)

মতিউর রহমান

কোন সুস্থ লোকের হঠাৎ করে কিডনীর কার্য্যক্রম কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়াকেই এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর বলে। এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর হলে সাধারণত প্রস্রাবের মাত্রা কমে যায় (oliguria), অনেক সময় প্রস্রাব একে বারেই বন্ধ হয়ে যায় (এনুরিয়া, Anuria) আবার কখন ও কখনও স্বাভাবিক মাত্রায় প্রস্রাব হয়েও এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর হতে পারে। বাংলাদেশে সাধারণত একেবারে প্রস্রাব বন্ধ হলেই অর্থাৎ anuria নিয়েই বেশীর ভাগ রোগী এসে থাকে। এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এ রক্তে ইউরিয়া (Urea) ও ক্রিয়াটিনিনের (Creatinine) পরিমান বাড়তে থাকে।

প্রকোপ ঃ

বাংলাদেশে এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এর প্রকোপ স্বাভাবিক কারণেই পশ্চিমা দেশের তুলনায় বেশী, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে।

কারণ ঃ

এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এর কারণ এক এক দেশে এক এক রকম। বাংলাদেশে শরীরে পানি ও লবণ জাতীয় পদার্থের হঠাৎ করে কমে যাওয়া যাকে ইংরেজিতে (Hypovoluemia) বলা হয়, এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এর প্রধান কারণ। এটা বয়স্কদের ক্ষেত্রে পেটের পীড়া (gastro enteritis) যা কিনা পাতলা পায়খানা ও বমির মাধ্যমে শরীরের পানি ও লবণ জাতীয় স্বল্পতা সৃষ্টি করে এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর করে। পশ্চিমা দেশে বড় ধরনের সার্জিক্যাল অপারেশন এবং নেফ্রাইটিস ইত্যাদি এ্যাকুট রেনাল

ফেইলিওর এর প্রধান কারণ। এ্যাকুট কিডনী ফেইলিওর এর কারণ গুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। (টেবিল –৩)

১) প্রি রেনাল (Pre renal)

২) রেনাল (Renal)

৩) পোষ্ট রেনাল (Post renal)

টেবিল –৩ এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এর কারণ

ক) প্রি – রেনাল

- পানি ও লবন জাতীয় পদার্থের অভাব
- সাংঘাতিক ধরণের পেটের পীড়া, বমন ইত্যাদি
- পোড়া (Burns)
- রক্তক্ষরণ (Haemorrhage) যেমন রক্তবমি, সার্জিক্যাল অপারেশন, গর্ভপাত (Abortion)
- সাংঘাতিক ধরনের প্রদাহ। যেমন গ্রাম নেগেটিভ সেপটিসিমিয়া
- শক (Shock) যে কোন কারনে হার্ট এটাক , এ্যাকুট প্যানক্রিয়াটাইটিস, ভুল রক্ত দেয়া। (Mismatched blood transfusion)

খ) রেনাল ঃ

- নেফ্রাইটিস (Acute glomerulonephritis) যে কারণে ই হোক না কেন।
- কিডনীর উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া করে এরূপ পদার্থ (Nephrotoxic substances) যেমন -- কার্বণটেট্রাক্লোরাইড, মার্কিউরিক ক্লোরাইড, ইথিলিন গ্লাইকল, আর্সেনিক, প্যারাকোয়াট, গোল্ড, লেড ইত্যাদি।
- কতকগুলো ঔষধ যদি যথেস্ট সাবধানতা অবলম্বন করে না ব্যবহৃত হয়। যেমন -- ক্যানমাইসিন, জেন্টামাইসিন, এ্যামফো টেরিসিন- বি, সালফোনামাইড ইত্যাদি।
- শরীরের ভেতরের ছোট ছোট অথচ বিস্তারিত ভাবে যদি রক্ত

banglainternet.com

জমে (DIC)। যেমন টি দেখা যায়-সর্প দংশন, হেমোলিটিক ইউরিমিক সিণ্ড্রোম, বা সাংঘাতিক উচ্চ রক্ত চাপে।

গ) পোষ্ট রেণাল

সমস্ত কিডনী ফেইলিওর একটি ক্ষুদ্রাংশ (৫%) বা তারও কম সংখ্যক রোগীদের সাধারণত ইউরেটার এ পাথর হয়ে কিডনী ফেইলিউর করে। দুটো ইউরেটার বন্ধ হলে তবেই এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর হবে। এটি স্বল্প সংখ্যক রোগীদের হোলেও এই রোগ অস্ত্রোপচার দ্বারা সারিয়ে তোলা যায়। সে জন্য এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ গ্রুপ।

কিডনী ফেইলিওর এর কারণকে অন্যভাবে ভাগ করা যায় দুই প্রকারে ঃ

১) ইস্কিমিক (Ischaemic)

অর্থাৎ যে কোন কারণেই কিডনীতে রক্ত সঞ্চালন কমিয়ে দিয়ে এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর করে।

২) টক্সিক (Toxic) যা আলোচনা করা হয়েছে।

এ ছাড়া যে সমস্ত রোগীদের হৃদপিণ্ডের (Heart), যকৃতের (Liver) বা আগে থেকেই কোন কিডনী (Kidney) রোগ থাকে তাদের উপরোক্ত কারণে দ্রুত এ্যাকুট কিডনী বা রেনাল ফেইলিওর করে থাকে।

কি করে এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর হয়

উপরে বর্ণিত কারণগুলি বিশেষ করে প্রি-রেনাল (Pre renal) গ্রুপ এ বর্ণিত, ঠিক কি উপায়ে এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর করে তা জানা নাই তবে ধারণা করা হয় যে,

১) কিডনীতে রক্ত প্রবাহ কমে গেলে করটেক্স (Cortex) থেকে মেডুলা (Medulla) তে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে এ্যাকুট কিডনী ফেইলিওর করে। ২) এ ছাড়াও রেনিন -- এ্যানজিওটেনসিন (Renin angiotensin) কার্য্যকারীতা বাড়া ৩) টিবিউলার কোষ (tubular cell) গুলি ফুলে (swelling) যাওয়া এবং সর্বশেষে ৪) কোষের মধ্যে ক্যালশিয়াম এর পরিমান বৃদ্ধিকে দোষারোপ করা হয়ে থাকে।

উপসর্গ (Clinical features)

এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এর কোন বিশেষ উপসর্গ নাই। প্রথমের

দিকে যে কারণে এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর হয় যেমন ডাইরিয়া বা নেফ্রাইটিস তারই উপসর্গ থাকে। পরে অবশ্য যখন প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় বা একেবারেই প্রস্রাব হয় না তখন কিছু কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন হেচকি উঠা , বমি হওয়া, রক্ত বমি হওয়া। এর পর ঘুম ঘুম ভাব , ঝিচুনী বা একেবারে অজ্ঞান (Coma) হওয়াও দেখা যেতে পারে। শরীরে পানি আসতে পারে (oedema) বা কমে যেতে (dehydration) থাকতে পারে। রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকতে পারে কমে যেতে পারে আবার অনেক সময় বেড়েও যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়ণ (Diagnosis)

এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এর উপসর্গ তিন ভাগে ভাগ করা যায় --

১) প্রস্রাবের পরিমাণ কম বা একেবারে বন্ধ হওয়া (oliguria -anuria)

২) দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন চিকিৎসা দ্বারা রোগী ভাল হতে থাকে প্রস্রাব বেড়ে যাওয়া (Diuretic phase)

৩) তৃতীয় পর্যায়ে যখন প্রস্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে আসে (Recovery phase)

উপসর্গ ছাড়াও কতকগুলো বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষা দ্বারা এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর রোগ নির্ণয় করা হয় --

১) রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়াটিনিন (Urea, creatinine) এর মান বেড়ে যায়

২) রক্তে পটাশিয়াম (ScrumK^+) বেড়ে যায়।

৩) রক্তে সোডিয়াম (Scrum Na^+) স্বাভাবিক থাকতে পারে আবার কমেও যেতে পারে।

খ) রক্তে হাইড্রোজেন (H^+) বেড়ে যায় এবং বাইকারবনেট (HCo_3) কমে যায়। যাকে acidosis বলা হয় যার ফলে রোগীর শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। উপরোক্ত পরীক্ষাগুলো অর্থাৎ রক্তে Urea, Electrolyte এবং Creatinine সঠিক মাত্রার উপর এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এর রোগ নির্নয় ও চিকিৎসা একে বারে নির্ভরশীল।

এ ছাড়াও যদি রোগীর প্রস্রাব পাওয়া যায় তা হলে অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে (টেবিল) যা থেকে এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এর রোগ নির্ণয় চিকিৎসাতে সহায়তা করে-

banglainternet.com

টেবিল

এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এ প্রস্রাব ও রক্তের কতকগুলো বিশেষত্ব

পরীক্ষা	প্রি-রেনাল এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর	রেনাল এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর
প্রস্রাবে আমিষ (Urinary protein)	থাকে না	ক) ইসকিমিক গ্রুপে অল্প থাকতে পারে। খ) নেফ্রাইটিক গ্রুপে বেশী থাকবে।
মাইক্রোসকপি (Microscopy)	কাষ্ট (Cast) ইত্যাদি থাকে থাকলেও খুব কম	বিভিন্ন রকমের কাষ্ট (Cast) পাওয়া যায়।
প্রস্রাবের ওসমোলালিটি – (Osmolari ty of urine)	> ৫০০	< ৪০০
প্রস্রাবের সোডিয়াম (Urinary Sodium)	< ২০ মি: মোল	> ৪০
প্রস্রাব ওসমোলালিটি রক্ত অনুপাত (Ratio)	> ১ ঃ ২	< ১ঃ১

চিকিৎসা (Treatment)

এ্যাকুট কিডনী ফেইলিওর একটি মেডিক্যাল জরুরী অবস্থা। সময় মত রোগ নির্ণয় করে সুচিকিৎসা দিতে পারলে রোগী বেঁচে যেতে পারে, তবে দেরী হয়ে গেলে অনেক রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

যে কোনএ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর রোগী এলে প্রথমতঃ পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে রোগীর কোন প্রদাহ (Infection) আছে কি না, শরীরে পানি ও লবন (Na^+) জাতীয় পদার্থ কম না বেশী। এ্যাসিডোসিস আছে কি না, পটাশিয়াম (K^+) কত এবং রক্ত চাপ কেমন।

তাই রোগীর ক্লিনিক্যাল ও বায়োকেমিক্যাল (Biochemical) অবস্থার উপর নির্ভর করবে চিকিৎসা ব্যবস্থা।

১. প্রাথমিক অবস্থা ঃ

যেমন কোন রোগীর ডাইরিয়া হয়ে প্রস্রাবের পরিমান কমে যেতে থাকে তখন যদি শরীরে যথেষ্ট পরিমানে পানি ও লবন দেয়া যায় তা হলে অনেক ক্ষেত্রে অতি সত্বর রোগী ভাল হয়ে উঠবে। সব রোগীর ক্ষেত্রে কোন (obstruction) আছে কি না তা দেখতে হবে।

২. দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ঃ

রোগী যদি আর একটু খারাপ হয় এবং শরীরের ইউরিয়া (Urea) ও ক্রিয়েটিনিন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী থাকে তা হলে উপরোক্ত (১) এর ব্যবস্থাতে রোগী উন্নতির দিকে যাবে না তখন এই পর্যায়ে ডাইউরেটিক (Diuretic) ব্যবহার করা যায় এবং প্রধানত নিম্নে বর্ণিত দুইটি (Diuretic) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ক) ম্যানিটল (Mannitol) ঃ

একজন বয়স্ক রোগীকে ২০% ম্যানিটল ১০০ -২০০ মিঃলিঃ দেয়া যেতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ করতে পারে।

খ) ফ্রুসেমাইড (Frusemide) ঃ

বয়স্কদের ক্ষেত্রে ৫০০ মিঃ গ্রাম থেকে ২০০০ মিঃ গ্রাঃ ফ্রুসেমাইড ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত রক্তে (Vein) $\frac{১}{২}$ ঘন্টা থেকে ২ ঘন্টা ধরে দেয়া হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় কাজ করলেও কোন রোগীর প্রস্রাব যদি ৪৮ ঘন্টার বেশী একেবারে বন্ধ থাকে এবং শরীরে ইউরিয়া বা ক্রিয়েটিনিন খুব বেশী থাকে তাহলে উপরোক্ত ডাইয়ুরেটিক কাজ করবেনা।

এই অবস্থায় সব এ্যাকুট রেনাল ফেয়লিওর রোগীদের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে –

১) নার্সিং – মুখ পরিস্কার রাখতে হবে এবং যেহেতু এই রোগীদের infection হতে পারে সেহেতু ব্যরিয়ার নার্সিং (Barrier Nursing) এর ব্যবস্থা করতে হবে।

banglainternet.com

২) যদি K^+ বেশী হয় তাহলে কমানোর জন্য বাইকারবোনেট, গ্লুকোজ-ইনসুলিন এবং ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিতে হবে। এই অবস্থায় রোগীর পানির পরিমান নির্দিষ্ট করে দিতে হয় যথা গত ২৪ ঘন্টায় প্রস্রাবের সম পরিমান পানি + ৫০০ মিঃ লিঃ পানি দিতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে এর পরিমান আনুপাতিক হারে কম দিতে হবে। তাছাড়া রোগীর আমিষ (Protein) কমিয়ে ২০ – ৩০ গ্রাম করতে – তবে ক্যালোরী (২০০০) রাখতে হবে এবং তা শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্য দিয়ে পূরণ করতে হবে।

ঔষধ পত্র (Drugs) ঃ

এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর ঔষধ খুব সাবধানে দিতে হবে। শুধু মাত্র যদি infection থাকে উপযুক্ত এ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে কোন এ্যান্টিবায়োটিক যা কিনা অনেক সময় জীবন রক্ষাকারী কিন্তু কিডনীর জন্য ক্ষতিকারক দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে – যেমন এ্যামিনো গ্লাইকোসাইডস।

ডায়ালিসিস (Dialysis) ঃ

যখন উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি সত্বেও রোগী সুস্থতার (অর্থাৎ প্রস্রাব হচ্ছে না বা বাড়ছেনা) দিকে যাচ্ছেনা ক্রমাগত রক্ত ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিন বেড়ে চলেছে তখনই ডায়ালিসিস করতে হয়।

তবে আমাদের দেশে রোগীরা এত পরে আমাদের কাছে আসে, তারা এত বেশী অসুস্থ এবং রক্তে এত বেশী ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন থাকে যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই রোগীর ডায়ালাইসিস চিকিৎসার ইণ্ডিকেশন (Indication) থাকে।

তবে স্বাভাবিক ভাবে যখন রক্ত ইউরিয়া ২০ মিলিমোল এর বেশী, ক্রিয়েটিনিন ৫০০ মাইক্রোমোল এর বেশী এবং বাই কারবোনেট অর্থাৎ (TCO_2) ১২ মিলি মোলের কম তখন ডায়ালিসিস করা উচিত। অবশ্য শিশুদের ক্ষেত্রে আগেই ডায়ালিসিস করলে ভাল।

ডাইউরেটিক ফেজ (Diuretic Phase) ঃ

উপরোক্ত চিকিৎসা ও ডায়ালিসিস করলে রোগী সাধারনত প্রস্রাব করতে শুরু করে এবং পরিমান ক্রমাগত বেড়ে যায়। অনেক সময় একজন বয়স্ক মানুষ ৫ লিটার থেকে ২০ লিটার প্রস্রাব করবে। এই সময় পানি ও

লবন রোগীকে দিতে (replace) হবে তাছাড়া রোগী আবার ডিহাইড্রেটেড (Dehydrated) হয়ে এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর ফিরে যেতে পারে।

মৃত্যুর হার (Mortality) ঃ

আমাদের দেশে বয়স্কদের মৃত্যুর হার ৩০ – ৪০ ২, কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার ৯০ ২ এর মত। এর প্রধান কারণ অনেক দেরীতে এরা চিকিৎসার জন্য আসে, বাবা মার অজ্ঞতার জন্য এবং শিশুদের এই রোগের কারন Ischaemic হওয়া এবং প্রয়োজনীয় উপযুক্ত Centre এর অপ্রতুলতা।

প্রতিরোধ (Prevention) ঃ

প্রথমত যে সমস্ত রোগীর যকৃতের দোষ আছে, যাদের হৃদরোগ আছে তাদের যদি বড় ধরনের সার্জিকেল অপারেশন দরকার হয় তাহলে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রয়োজন হোলে প্রি-অপারেটিভ ম্যানিটল দেয়া প্রয়োজন।

অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ –

১) পাতলা পায়খানা, বমি বা জ্বর হলে ঘন ঘন লবন চিনির শরবৎ পান করা। অবস্থা ক্ষেত্রে IV route এ Normal Saline দিতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে প্রস্রাব ঠিক পরিমান মত হচ্ছে।

২) প্রসূতিরা যেন কোন মতেই আনাড়ী দাই দ্বারা গর্ভপাত না করেন। মেয়েদের মধ্যে এটি এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর এর প্রধান কারণ যা কিনা প্রতিরোধযোগ্য।

৩) ঔষধ – অনেক ভেষজ ঔষধ যা কিনা কিডনীর জন্য ক্ষতিকারক তা এড়িয়ে চলা।

৪) এখনও আমাদের দেশে ভুল রক্ত বা যে রক্ত অনেকদিন রাখা (Stored blood) হয়েছে এই রকম রক্ত দেওয়ার কারনে অনেক রোগীর এ্যাকুট রেনাল ফেইলিওর করে। একটু সতর্কতা অবলম্বন করলেই এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

banglainternet.com

৩য় অধ্যায়

২য় পরিচ্ছেদ

ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর
(CHRONIC RENAL FAILURE - CRF)

মোঃ হাবিবুর রহমান

সংজ্ঞা ঃ – কোন কিডনী রোগ যদি অনেক দিন ধরে চলতে থাকে তাহলে ধীরে ধীরে দুইটি কিডনীই অকেজো হয়ে যায় ও তার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। কিডনীর এই অবস্থাকেই আমরা ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর বলে থাকি।

ভূমিকা ঃ – ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর সারা পৃথিবীতেই একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। কারন এ রোগ প্রায়ই দেখা যায় ও একবার হলে সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। এ রোগের সঠিক চিকিৎসা না হলে, মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবে বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই সব কিডনী অকেজো হয়ে যাওয়া রোগীদেরও ডায়ালিসিস অথবা কিডনী সংযোজনের মাধ্যমে অনেক দিন সুস্থ মানুষ হিসাবে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। ডায়ালিসিস এবং কিডনী সংযোজন বেশ ব্যয় বহুল। তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা কিডনী অকেজো হয়ে যাওয়াকে প্রতিরোধ করতে পারি।

প্রাদুর্ভাব ঃ – সারাপৃথিবীর কত লোক ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর এর ভুগছে তা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয় তবে এটা যে একটা মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা সে সমন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ঢাকার পি, জি, হাসপাতালের কিডনী বিভাগে গত ১০ বৎসরে যত রোগী ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর এ ভুগছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান থেকে এটা সঠিকভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, প্রতি দশ লক্ষ লোকের মধ্যে একশত লোকের কিডনী প্রতি বৎসরে একেবারেই অকেজো হয়ে যাচ্ছে –

যাদের বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে ডায়ালিসিস অথবা কিডনী সংযোজন। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ১০ (দশ) হাজার রোগীর কিডনী প্রতিবৎসর একেবারেই অকেজো হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের অধিকাংশই সঠিক চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরন করছেন।

কারণ ঃ অধিকাংশ কিডনী রোগই একবার হলে সারা জীবন চলতে ও পরিনতিতে কিডনীকে একেবারে অকেজো করে দেয়। সে সব কিডনী রোগে রেনাল ফেইলিওর হয় সেগুলো হচ্ছে – বিভিন্ন ধরনে নেফ্রাইটিস এবং কিডনীর প্রদাহ বিশেষ করে যদি এই প্রদাহ ৪ বৎসর বয়সের আগে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য কারন গুলো হচ্ছে অনেক দিন ধরে চলতে থাকা বহুমুত্র রোগ, উচ্চ রক্ত চাপ জনীত রোগ, কিডনীর পাথুরী রোগ, কিছু জন্ম গত কিডনী রোগ যেমন পলিসিসটিক কিডনী, কিডনীর যক্ষারোগ ও ঔষধ জনীত কিডনী রোগ। সারা পৃথিবীতেই নেফ্রাইটিসই হচ্ছে ক্রনিক রেনাল ফেইলিওরের সব চেয়ে প্রধান কারন (প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ), আমাদের দেশে বহুমুত্র জনিত কিডনী রোগ অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী দেখা যায় কিন্তু কিডনীর প্রদাহ জনিত ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর এর সংখ্যা এ দেশে কম।

লক্ষণ ঃ ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর এর লক্ষণ গুলো নির্ভর করে রেনাল ফেইলিওর এর অবস্থার উপরে। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীর তেমন কোন লক্ষন নাও থাকতে পারে শুধু রক্ত পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষা করার পরই তার রোগ ধরা পড়ে। রোগ যখন বেশ সাংঘাতিক পর্যায় পৌছে তখন রোগীর মধ্যে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই লক্ষণ গুলোর মধ্যে প্রধান কতগুলো হচ্ছে শরীর ফুলে যাওয়া, রাতের বেলায় বেশী প্রস্রাব হওয়া, সারা শরীর চুলকানো, ক্ষুধা কমে যাওয়া ও বমি হওয়া। এ সব রোগীরা ধীরে ধীরে রক্ত শুন্য হয়ে পড়া এবং এই রক্ত শুন্যতা আয়রন ও ফোলিক এসিড দিয়ে ভাল করা যায় না। অধিকাংশ রোগীদেরই উচ্চ রক্ত চাপ দেখা দেয়। অনেকের হাড়ের মধ্যে ব্যথা হয় ও হাড় নরম হয়ে যায় বলে অল্প আঘাতেই হাড় ভেংগে যায়। অনেকের হৃদপিণ্ডের রক্ত চলাচল কমে যায় ও হৃদপিণ্ডের মাংস পেশীর দুর্বলতা দেখা যায়। অনেকে শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টে ভোগেন। শেষ পর্যায়ে অনেক রোগীর খিচুনী হয় ও কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে যায়। এই রোগে রোগীর শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে বোঝা যায় কি কারনে এই রোগ হয়েছে, ও এখন রোগ কি পর্যায় আছে। ক্রনিক রেনাল ফেইলিণার এর কারনের উপর পরীক্ষার কিছু কিছু ফলাফল নির্ভর করে তবে

banglainternet.com

যে কারনেই ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর হোক না কেন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে দুইটা কিডনীই অকেজো হয়ে গেছে। প্রস্রাব পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রস্রাবের সংগে প্রোটিন যাচ্ছে। বহুমূত্র রোগের কারনে যাদের কিডনী খারাপ হয়ে গেছে তাদের প্রস্রাবে শর্করা পাওয়া যেতে পারে। অনেক সময় লোহিত কণিকা ও পুঁজ কণিকা পাওয়া যায়। প্রস্রাব কালচার করলে কিডনীর প্রদাহের জন্য দায়ী জীবানু পাওয়া যেতে পারে। রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যায় শরীরে হিমোগ্লোবিনের পরিমান খুবই কম কিন্তু লোহিত কণিকা গুলো অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে স্বাভাবিক মনে হয়। রক্তের বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে রক্তে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক এসিড, পটাসিয়াম, এলক্যালাইন ফসফাটেস বেড়ে গেছে এবং ক্যালসিয়াম, বাইকারবানেট ও ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স কমে গেছে। পেটের (কে, ইউ, বি,) এক্স-রে ও কিডনীর এক্স-রে (আই, ভি, পি) করলে দেখা যায় যে দুইটি কিডনীই ছোট হয়ে গেছে এবং ভাল ভাবে কাজ করছে না। রেনোগ্রাম, কিডনীর স্ক্যান করলে কিডনী যে অকেজো হয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

প্রতিরোধ ব্যাবস্থা ঃ-

যেহেতু ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর একবার হলে, কিডনীকে চিকিৎসার মাধ্যমে আর কোন দিন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে যে সব কারনে এই রোগ হয় সেগুলোকে প্রতিরোধ করা যায়। কিছু কিছু নেফ্রাইটিস যেমন খুজলী পাঁচড়ার ও ম্যালিরিয়ার পরে যে নেফ্রাইটিস হয় সেগুলো, ঐ সব রোগের সঠিক ও সময় মত চিকিৎসা করলে নেফ্রাইটিসের হাত থেকে বাঁচা যায়। চার বৎসরের কম বয়সী বাচ্চাদের কিডনী প্রদাহের সঠিক চিকিৎসা করা খুবই প্রয়োজন, তাতে ভবিষ্যতে কিডনী অকেজো হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যাওয়া যায়।যে মহিলাদের বারে বারে কিডনীর প্রদাহ হয় তাদেরকে প্রতি রাতে অল্পমাত্রায় এন্টিবায়োটিক খাওয়ালে ও অধিক মাত্রায় পানি পান করতে বললে, কিডনীর প্রদাহ কম ও পরিণতিতে কিডনী অকেজো হয়ে যাওয়া থেকে রেহাই পাওয়া যায়। উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র রোগ সাধারণতঃ সারা জীবন ধরে চলতে থাকে, তাই এর চিকিৎসাও সারা জীবন ধরে করতে হয়। আমাদের দেশে অনেকেরই ধারণা কোন কষ্ট না হলে, চিকিৎসার কি প্রয়োজন। এটা একটা ভুল ধারনা। উচ্চরক্তচাপ ও বহুমূত্র রোগের জন্য মাঝে মাঝেই রক্তচাপ পরীক্ষা ও রক্তের শর্করা পরীক্ষা করে সেই অনুপাতে ঔষধ চালিয়ে যেতে হবে। বেশী পানি খেলে (দিনে ৩ - ৪ সের) কিডনীর পাথরে রোগ কম হয়।এ ছাড়াও কিছু

কিছু ঔষধ যেমন থায়াজাইড ডাইয়ুরেটিক ও এলোপিউরিনল, অল্পমাত্রায় অনেকদিন ধরে সেবন করলে কিডনীর পাথুরে রোগ কম হয়। সময় মত ও সঠিক ভাবে যক্ষা রোগের চিকিৎসা করলে যক্ষা জনিত কিডনী রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ঃ-

প্রাথমিক পর্যায়ে যদি কারো ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর হয় তবে প্রথম অবস্থায়ই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ প্রথম অবস্থায় এই রোগ ধরা পড়লে , চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের অনেকটা উপশম করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছেরোগীর খাবার। রোগীর খাবারের সঙ্গে কম প্রোটিন দিতে হবে। পূর্ণ বয়স্কদের দৈনিক ২০ - ৩০ গ্রাম প্রোটিন দেয়া উচিৎ। সাধারণত দৈনিক একটুকরো মাংশ , ১ টুকরো মাছ ও ১টা ডিম দিলেই যথেষ্ট। রোগীকে ভাত ও প্রচুর শাক শব্জী খেতে বলতে হবে।সব ধরণের ফল খাওয়া নিষেধ করে দিতে হবে। পানির পরিমান নির্ভর করে রোগীর সারাদিনে কত প্রস্রাব হয় ও তার শরীরে পানি জমে আছে কিনা তার উপরে। তবে সারাদিনে যেটুকু প্রস্রাব হয়, তার চেয়ে $\frac{১}{২}$ সের বেশী পানি দেয়া যেতে পারে। এদেরকে লবণ কম খেতে দেয়া উচিৎ।

বেশীর ভাগ ক্রনিক রেনাল ফেওলিওর রোগীদেরই উচ্চচাপ থাকে। এদের অনেকেই ডায়ুরিটিক দিয়ে ও লবন কম খাইয়ে চিকিৎসা করা যায়। তবে যাদের এই ঔষধে কাজ হয় না, তাদেরকে অন্যান্য রক্তচাপকমানোর ঔষধ যেমন মিথাইলডোপা, প্রাজোসিন ও বিটাব্লকার দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা সবাই রক্তশুন্যতায় ভোগেন। যেহেতু তাদের শরীরে এরিথ্রোপয়েটিনের অভাব থাকে তাদের রক্ত শুন্যতা সাধারণতঃ আয়রণ ও ফলিক এসিড দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। রক্তশুন্যতার জন্য প্রয়োজন মত তাদের শরীরে রক্তসঞ্চালন করতে হয়। যদি কারও মধ্যে কিডনী জনিত হাড়ের রোগ দেখা দেয় তাদেরকে এলুমিনিয়াম হাইড্রোকসাইড জাতীয় এন্টাসিড ও ভিটামিন ডি দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। কারণ ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর রোগীদের রক্তে ফসফেট বেশী থাকে ও তাদের শরীরে কার্যকরী ভিটামিন ডি এর অভাব দেখা দেয়। এই ভাবে চিকিৎসা করলে রোগীদের কষ্টের অনেকটা উপশম হয় ও তাদের কিডনীর কার্যকরীতা বেশ কিছু দিন বজায় থাকে।

banglainternet.com

শেষ পর্যায়ে ঃ যখন ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌছায়, তখন পূর্বে উল্লেখিত চিকিৎসা দিয়ে রোগীকে সুস্থ রাখা যায় না। এই অবস্থায় রোগীকে ভাল ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ডায়ালিসিস অথবা কিডনী সংযোজনের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে এই চিকিৎসা সারা পৃথিবীতেই চলছে এবং বর্তমানে প্রায় ৩ লক্ষ রোগী এই চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থভাবে বেচে আছে। এই চিকিৎসা বেশ ব্যয় বহুল। তাই আমাদের দেশের মত গরীব দেশের পক্ষে এই রোগে আক্রান্ত সব রোগীর এই উপায়ে চিকিৎসা সম্ভব নয়।

ডায়ালিসিস এর মাধ্যমে রক্তের মধ্যে জমে যাওয়া বিষাক্তপদার্থগুলিকে শরীর থেকে বের করে নিয়ে আসা যায়। সাধারণতঃ দুই ভাবে ডায়ালিসিস করা যায় যেমন প্যারিটোনিয়াল ডায়ালিসিস ও হিমো ডায়ালিসিস। প্যারিটোনিয়াল ডায়ালিসিস এ প্যারিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে প্যারিটোনিয়াল ডায়ালিসিস ফ্লুয়িড ঢুকানো হয় এবং কিছুক্ষণ পরে বের করে নিয়ে আসা হয়। সপ্তাহে দুইদিন এইভাবে ডায়ালিসিস করলে রোগীরা মোটামুটি সুস্থ থাকে। আর এক ধরণের প্যারিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে (সি,এ,পি,ডি) ৬ঘন্টা পর পর ডায়ালিসিস ফ্লুয়িড ঢুকান ও বের করা হয়। এই পদ্ধতি সব সময়েই চলতে থাকে এই পদ্ধতিতে ডায়ালিসিস করলে রোগীরা অনেক বছর ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে পারে। হিমো ডায়ালিসিস পদ্ধতিতে রোগীর শরীর থেকে রক্ত বের করে মেশিনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করে আবার শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই ডায়ালিসিস সপ্তাহে তিন দিন করতে হয়। এক এক দিনে চার ঘন্টা করে ডায়ালিসিস করা হয়। বর্তমানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক ডায়ালিসিসের মাধ্যমে বেঁচে আছে। ডায়ালিসিসের মধ্যে হিমো ডায়ালিসিসই উত্তম। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে শতকরা ৮০ জন লোক ৫ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

কিডনী সংযোজন ঃ কিডনী সংযোজনের মাধ্যমে একজন ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর রোগী অনেক বছর একেবারে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারেন। একজন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় অথবা একজন মৃত ব্যক্তির একটি কিডনী নিয়ে অস্ত্রপোচারের মাধ্যমে রোগীর পেটে লাগিয়ে দেয়া হয়। যার কাছে থেকে একটা কিডনী নেয়া হয়, সে সুস্থ থাকে। কারণ মানুষের শরীরে দুইটি কিডনী আছে এবং একটি কিডনীই তাকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। যাদের মধ্যে রক্তের গ্রুপ ও টিস্যুর মিল আছে তারা একজন আর একজনকে কিডনী দিতে পারে। কিডনী সংযোজন সফল হলে, রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। তবে তাদের সব সময়ই কিছু ঔষধ খেতে হয়। এবং নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ মত চলতে হয়। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায়

৭০হাজার লোক কিডনী সংযোজনের মাধ্যমে বেঁচে আছেন। কিডনী সংযোজনের পরে শতকরা ৭০জন লোক ৫ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারেন। কিডনী সংযোজনই ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর এর সব চেয়ে উত্তম চিকিৎসা

আমাদের দেশে এ রোগের চিকিৎসার সুযোগ ঃ

আমাদের দেশে এ রোগের চিকিৎসার সুযোগ খুবই সীমিত। ঢাকার পি জি হাসপাতালে গত ১৫ বৎসর যাবত প্যারিটোনিয়াল ডায়ালিসিস ও হিমোডায়ালিসিসের মাধ্যমে কিছু কিছু রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, চিটাগাং মেডিক্যাল কলেজ এবং রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ প্যারিটোনিয়াল ডায়ালিসিসের মাধ্যমে কিডনী অকেজো রোগীদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। আশার কথা এই যে ১৯৮৮ সন থেকে পি, জি, হাসপাতাল ও সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়মিত ভাবে কিডনী সংযোজন শুরু হয়েছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এই চিকিৎসার সুযোগ কম। তবুও ধীরে ধীরে সারা বাংলাদেশে এই চিকিৎসার সুযোগ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চলছে।

উপসংহার ঃ যেহেতু অধিকাংশ কিডনী রোগই একবার হলে সারা জীবন চলতে থাকে ও অবশেষে কিডনীকে অকেজো করে দেয়, আমাদের এই সব রোগকে প্রতিরোধ করতে হবে। ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর এর চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল ও আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে কোন দিনই এই রোগে আক্রান্ত সমস্ত রোগীদের চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না, তাই এ রোগের প্রতিরোধ এর ব্যাপারে আমাদের খুবই বেশী যত্নবান হতে হবে।

banglainternet.com

৩য় অধ্যায়

৩য় পরিচ্ছেদ

পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস
(PERITONEAL DIALYSIS)

দীপ্তি চৌধুরী

পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস ঃ-

ক্রণিক কিডনী ফেইলিওর শেষ অবস্থায় (এণ্ড ষ্টেজ রেনাল ফেইলিউর) রোগীকে ডায়ালাইসিস অথবা কিডনী সংযোজনের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা হয়, নতুবা রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

ডায়ালাইসিস দুই প্রকার যথা -- পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস এবং হিমোডায়ালাইসিস।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস

এই পদ্ধতিতে পেটের মধ্যে নলের সাহায্যে বিশেষভাবে ডায়ালাইসিসফ্লুইড ঢুকিয়ে দেয়া হয়। সাথে সাথে বা ১৫ মিনিট থেকে $\frac{১}{২}$ ঘন্টা পর আবার বের করে নেয়া হয়। এভাবে ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা ডায়ালাইসিস চালানো হয়। এতে রোগীর শরীরে দুষিত পদার্থগুলি বের হয়ে যায় এবং রোগী সুস্থতা ফিরে পায়।

ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের গঠন বা কম্পোজিশান ঃ-

একটা ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের ব্যাগে এক লিটার পরিমান মিশ্রণ থাকে এতে থাকে

পানি – (water)	১ লিটার
সোডিয়াম (Na) ৩.২৪ গ্রাম	১৪১ মিলিইকুভ্যালেন্ট/ লিটার
ক্যালসিয়াম (Ca) ০.০৭ গ্রাম	৩.৫ মিলিইকুভ্যালেন্ট/ লিটার
ম্যাগনেশিয়াম (Mg) .০১৮ গ্রাম	১.৫মিলিইকুভ্যালেন্ট/ লিটার
এসিটেট (Acetate) ২.৬৭গ্রাম	৪৫.০ মিলিইকুভ্যালেন্ট/ লিটার
ক্লোরাইড (Cl_2) ৩.৪৯ গ্রাম	১০১.০ মিলিইকুভ্যালেন্ট/ লিটার
ডেক্সট্রোজ (Dextrose) ১.৫%	

উল্লেখিত – ফ্লুইডের অসমোলালিটি ৩৫৫ মিলিঅসমোল পার লিটার , এটা প্লাজমা অসমোলালিটির সমান বা সামান্য একটু বেশী। আরেকটা ডায়ালাইসিস ফ্লুইড আছে সেটা হচ্ছে হাইপার টনিক। এতে ১.৫% এর পরিবর্তে ৩.৮৬% = ডেক্সট্রোজ মিশানো থাকে এবং এর অসমোলালিটি হচ্ছে ৫৫০ মিলি অসমোল এর সমান। এই ধরণের ফ্লুইড অতিমাত্রায় ফুলে গেছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

কি কি নীতির উপর ভিত্তি করে এই ডায়ালাইসিস চলে ঃ –

প্রথম হচ্ছে ডিফিউশান ঃ– এই পদ্ধতিতে শরীরের দুষিত পদার্থ পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস ফ্লুইডে চলে আসে কনসেনট্রেশনে গ্র্যাডিয়েন্ট বা ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। এই ডিফিউশান পদ্ধতি পেরিটোনিয়াল মেমব্রেন এর মধ্য দিয়ে উভয় দিকে চলতে থাকে। উদাহরণ, রেনাল ফেইলিউর ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ অনেকবেশী থাকে এবং পেরিটোনিয়েল ফ্লুইডে এগুলো মোটেও নেই তাই রক্ত থেকে এই দুটো পদার্থ পেরিটোনিয়াল মেমব্রেন ভেদ করে ফ্লুইডের মধ্যে চলে আসে। আবার রক্তে সোডিয়াম এবং এসিটেড বা বাই কার্বনেট কম থাকে তাই পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড থেকে এসব আয়ণ পেরিটোনিয়ামের মধ্য দিয়ে রক্তে চলে আসে।

এই ডিফিউসান পদ্ধতিও পেরিটোনিয়েল মেমব্রেনের পারমিয়েবিলিটির উপর নির্ভর করে। ইউরিয়া , ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি সহজেই পারমিয়েবল কিন্তু ইনিউউলিন সাইজের অনুর পারমিয়াবিলিটি কম। তবে এই সাইজের অনুগুলোর পারমিয়েবিলিটিপেরিটোনিয়েল মেমব্রেনের বেলায় সেলুলোজ হিমোডায়ালাইজারের তুলনায় ৫ থেকে ৮ গুণ বেশী। নীচে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন এবং ইনউলিনের ক্লিয়ারেন্স দেয়া হল ঃ

banglainternet.com

টেকনিক	মেমব্রেন	ক্লিয়ারেন্স মিলিলিটার / প্রতি মিনিট		
		ইউরিয়া ৬০ মোল ওয়েট	ক্রিয়োটিনিন ১১৩ মোল ওয়েট	ইনিউলিন ৫২০০ (মোল ওয়েট)
পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস	পেরিটোনিয়াম	২০	১১	৬
হিমো ডায়ালাইসিস	সেলুলোজ (১ মি^{2})	১২৮	৮৫	২
	কিউপ্রোফেন	১২৪	৮৬	৪.৫

পেরিটোনিয়াল মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে কোন পদার্থের ক্লিয়ারেন্স নিম্ন লিখিত ফর্মুলা দিয়ে প্রকাশ করা হয়

$$\text{Clearance } \frac{C_D D}{C_p}$$

C_D = প্রতি সাইকেলে ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের পরিমাণ

C_p = সাইকেলেরে মাঝামাঝি সময়ে প্লাজমায় ঐ পদার্থের ঘনত্ব

D = ঐ সময়ে নির্গত ডায়ালাইসিস ফ্লুইডে ঐ পদার্থের ঘনত্ব।

২য় নীতি হল আলট্রাফিলটারেশন ঃ-

পেরিটোনিয়াল ডালাইসিস ফ্লুইডের অসমোটিক প্রেসার বেশী থাকায় শরীর থেকে পানি পেরিটোনিয়েল মেমব্রেন ভেদ করে পেটে ফ্লুইডে চলে আসে। এই পানি চলে আসার সময় এর সাথে সাথে পারমিয়েবেল সলিউটও চলে আসে। এই সলিউট ট্রান্সফার প্লাজমা এবং ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের ঘনত্বের পার্থক্যে নির্ভর করে না। এটা শুধু পানির প্রবাহের সাথে

চলে আসে। এটাকে বলা হয় -- সলিউটের কানভেকটিভ মাস ট্রান্সফার (Connective mass transfer)

মোট কথায় পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিসের সময় কোন পদার্থেরট্রান্সফার নির্ভর করে ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের পরিমাণ এবং কার্যরত পেরিটোনিয়েল মেম্ব্রেনের এরিয়ার উপর। নিম্ন লিখিত সমীকরণ নিয়ে এটা বুঝা যায়।

$$t\frac{1}{2} = \frac{\text{In}0.5V_D}{K\sum A}$$

$t\frac{1}{2}$ = যে সময়ে প্লাজমা থেকে অর্ধেক পরিমাণ পদার্থ ডায়ালাইসিস ফ্লুইডে চলে আসে।

V_D = ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের পরিমাণ।

$K\sum$ = ম্যাচ ট্রান্সফার কোফিসিয়েন্ট ফর পেরিটোনিয়েল মেমব্রেন ইন সেঃ মিঃ পার মিনিট।

A = পেরিটোনিয়াল মেমেব্রেনের কার্যরত এরিয়া ইন স্কোয়ার সেঃ মিঃ।

কি কি কারণে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস করা হয় ?

১) একিউট রেনাল ফেইলিউর

২) ক্রনিক কিডনী ফেইলিওর

৩) পয়জনিং বা বিষ ক্রিয়া যথা বারবিচুরেট, পারাসিটামল ইত্যাদি পয়জনিং

৪) একিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস

৫) লিভার ফেইলিউর

পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস পদ্ধতি ঃ-

একটা ষ্টীলের ট্রোকার যুক্ত বহুছিদ্রবিশিষ্ট ক্যানুলা পেটে অর্থাৎ পেরিটোনিয়েল ক্যাভিটিতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। এই ছিদ্র করার বিশেষ কতকগুলো উপযুক্ত স্থান আছে যথা পেটের নাভি এবং সিম্ফাইসিস পিউবিস হতে সমদুরবর্তী বিন্দুতে লাইনে অথবা রেক্টাস মাসলের পার্শ্বে।

banglainternet.com

এসেপটিক বা জীবানু মুক্ত বিহীন পদ্ধতিতে পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস করা কর্তব্য। ট্রোকার এবং কেনুলা ঢুকানোর আগে ১০ সি, সি, এনেসথেটিক (১% জাইলোকেইন) লম্বা সুঁচ ওয়ালা সিরিঞ্জ দিয়ে ইনজেকশান দিতে হয় যেন পেরিটোনিয়াম পর্যন্ত পৌছায়। নতুবা রোগী ব্যথা অনুভব করতে পারে। তারপর চিহ্নিত স্থানে ছুঁচালো ছুরি দিয়ে ষ্টেব করতে হয় যেন সাব কিউটেনিয়াস টিস্যু কাটা যায়। তারপর ট্রোকার যুক্ত কেথেটার লম্বালম্বি ভাবে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয় । যখন রেজিষ্টেনস রিলিজ হয়ে কেথেটার ঢুকিয়ে দিতে হয় যেন ছিদ্র ওয়ালা অংশ সম্পূর্ণ ভাবে পেরিটোনিয়েলকেভিটির ভিতর থাকে নতুবা এবডোমিনেল ওয়ালে ডায়ালাইসিস ফ্লুইড ঢুকে বিভিন্ন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। অধিকাংশ কেথেটারের সাথে নব থাকে। নব পর্যন্ত কেথেটার ঢুকিয়ে ট্রোকার বের করে নেয়া হয় এবং কেথেটারের চার পার্শ্বে ড্রেসিং করে ফিকস করে দিতে হয়। কেথেটারের সাথে কানেক্টিং টিউব সংযুক্ত করে দেয়া হয় এবং কানেক্টিং টিউবের অপর প্রান্ত গিভিং সেটের সাথে সংযুক্ত থাকে ছবি গিভিং সেট বয়স্কদের বেলায় ২টা –১ লিটার ব্যাগের সাথে যুক্ত করা হয় এবং শিশুদের বেলায় করা হয়একটার সাথে। গিভিং সেটের একটা প্রান্ত আউটলেট হিসাবে কাজ করে।

পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্স এবং পারামেডিক্স দারা চালানো যায়। ডায়ালাইসিসের ইনপুট, আউটপুট এবং অন্যান্য জটিলতার হিসাব রাখার জন্য ডায়ালাইসিস চার্ট অত্যন্ত প্রয়োজন।

নীচে একটা ডায়ালাইসিস চার্টের নমুনা দেয়া হয়।

পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস চার্ট

রোগীর নাম তারিখ	বয়স	রোগ নির্ণয়		
ক্রমিক নং সময়	ইনপুট ব্যালেন্স	আউপুট	মেডিসিন ইঞ্জেকশানহিপারিন পটাশিয়াম	মন্তব্য ক্লোরাইড

ডায়ালাইসিস চালানোর নিয়ম ঃ – বয়স্কদের বেলায় প্রতিবার দুই লিটার ফ্লুইড ঢুকায়ে দেয়া হয় এবং এটা প্রায় ১৫ মিনিট লাগে। পেটের ভিতরে ফ্লুইড ১৫ মিঃ থেকে $\frac{১}{২}$ ঘন্টা রাখা হয় এবং তারপর বের করে নেয়া

হয়। বের হতে লাগে প্রায় ১৫ মিনিট। এভাবে প্রতিবার দেয়া এবং বের করাকে বলা হয় এক সাইকেল। শিশুদের বেলায় ২০মিলি লিটার প্রতি কেজি প্রতি সাইকেলে ফ্লুইড দেয়া হয়। ব্যবহার করার আগে ডায়ালাইসিস ব্যাগ ইষদুষ্ণ গরম করা হয়। এতে ডায়ালাইসিসের কার্যকারিতা (Efficiency) ভাল হয়। প্রতি সাইকেলে ৪ মিঃ লিঃ ইঞ্জেকশান পটাশিয়াম ক্লোরাইড (1 meq/ml inj KCL) ব্যাগের ভিতরে দেয়া হয় এবং প্রতি ২ থেকে ৩ সাইকেল এর পর ১০০০ ইউনিট ইঞ্জেকশান হেপারিন ব্যাগের মধ্যে দেয়া হয় এতে ডায়ালাইসিস ক্যাথেটারের ছিদ্রময় অংশ ফিব্রিন ক্লটে বন্ধ হতে পারে না।

এভাবে ৪৮ ঘন্টা ৭২ ঘন্টা পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস চালানো হয়। তারপর কেথেটার বের করে নিয়ে সে স্থান ষ্টেরাইল গজ দিয়ে ড্রেসিং করে দেয়া হয়।

ডায়ালাইসিসের প্রকার ঃ

১) উপরে যে প্রকারের ডায়ালাইসিস বর্ণনা দেয়া হল তা হল ইন্টার – মিটেন্ট পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস (আই, পি, ডি) এটা একিউট রেনাল ফেইলিউর এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে ক্রনিক রেনাল ফেলিউরের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

২) সি, ই, পি, ডি, (Continuous Equilibratory Peritoneal Dialysis) এই প্রকার ডায়ালাইসিসে দুই ফ্লুইড পেটের মধ্যে টুকিয়ে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা রাখা হয় এবং সম্পূর্ন ডায়ালাইসিসের .মেয়াদ ৫ থেকে ৭ দিন। এ ধরনের পি, ডি, হাইপার ক্যাটাবলিক একিউট রেনাল ফেইলিউরে ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত রোগী গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী থাকে।

৩) সি, এ, পি, ডি, (Cuntenous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

এ ধরনের ডায়ালাইসিস সি, ই, পি, ডি র মত। তবে এখানে রোগী এমবুলেন্ট থাকে বা চলাফেরা করে। এটাই হল সেই ডায়ালাইসিস যা উন্নত বিশ্বে ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং যা ঠিকমত চালাতে পারলে রোগী হিমোডায়ালাইসিসের চেয়েও ভাল থাকে।

এতে অপেক্ষাকৃত বড় লুমেনের এবং অপেক্ষাকৃত ফ্লেক্সিবল কেথেটার পেরিটোনিয়েল কেভিটির ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়। কেথেটারের গায়ে একটা কাফ পরিয়ে দেয়া হয় বাইরের কোন রোগ জীবানু কেথেটারের গায়ে গায়ে ভিতরে যেন ঢুকে না যায় এবং কেথেটার ওয়ালে ফিক্স

banglainternet.com

হয়ে যায়। এই প্রকার ডায়ালাইসিসে ক্লোজড পেটের মধ্যে ফ্লুইড ঢুকানো হয় এবং বের করে নেয়া হয়। এতে দুই লিটারের একটা ব্যাগের সাথে সীল করা একটা সংযুক্ত নল থাকে। নলের মাথা পেটের ভিতর থেকে থাকা কেথেটারের মাথার সাথে জীবানুমুক্ত পদ্ধতিতে (aseptic way) লাগানো হয়। এই লাগানোর পদ্ধতিটা সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন। কারন এটা জীবানুমুক্ত ভাবে করতে পারলে ইনফেকশানের ভয় বহুলাংশে কমে যায়। এজন্য কেউ স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে, কেউ আয়োডিনের সাহায্যে এবং কেউ আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে এই জীবানু মুক্ত করণ করে থাকে।

সংযুক্তির পর - মাধ্যাকর্ষনের ফলে ব্যাগের ফ্লুইড পেটের মধ্যে চলে যায়। তারপর ষ্টপ কর্ক এর সাহায্যে নল বন্ধ করে দিয়ে ব্যাগ ও নলকে ভাঁজ করে কোমরে বেল্টের সাহায্যে বেঁধে রাখা হয় এবং রোগী স্বাভাবিক ভাবে কর্ম করতে পারে এবং ৬ ঘন্টা পর কোমরের ব্যাগ খুলে নিয়ে নীচে একটা ট্রেতে হয় কর্ক খুলে দেয়া হয়। মাধ্যাকর্ষনের ফলে পেটের মধ্য হতে ফ্লুইড আবার ব্যাগে এসে ব্যাগ পূর্ন হয়। ফ্লুইড আসা বন্ধ হলে ব্যাগযুক্তি নলকে কেথেটার হতে নিযুক্তি করা হয় এবং নতুন একটা নলযুক্ত ব্যাগ সংযুক্ত করে দেয়া হয়। এভাবে দিনে ৪ বার ফ্লুইড পরিবর্তন করা হয়।

এই ধরনে ডায়ালাইসিস অন্যান্য প্রকার ডায়ালাইসিসের তুলনায় অত্যন্ত ফিজিওলজিকেল। এখানে সার্বক্ষনিক সলিউট একচেঞ্জ চলতে থাকে। এর ফল ও অত্যন্ত ভাল। কিন্তু একটা মাত্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হলে ইনফেকশান। উন্নয়নশীল বিশ্বে তাই এটার প্রয়োগ অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু উন্নত বিশ্বে এই প্রকার ডায়ালাইসিসের অনেক সেন্টার রয়েছে এবং অনেক রোগী এটাতে অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।

পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিসের জটিলতা ঃ

ইনফেকশান ঃ- উন্নয়নশীল দেশে এটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং মারাত্মক জটিলতা। এতে রোগী পেট ব্যাথা অনুভব করে। জ্বর হয় এবং পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস ফ্লুইড ঘোলাটে হয়ে যায়। পরীক্ষা করলে দেখা যায় এ ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের প্রতিমিলি লিটারে ১০০ এর বেশী পুঁজ সেল বা শ্বেত কনিকা থাকে। এই ইনফেকশানের প্রধান কারন আমাদের দেশে ই, কলাই, এবং উন্নত বিশ্বে ষ্টেফাইলোকক্কাস জীবানু।

এই ইনফেকশানের প্রধান উৎস হল হাত, সিরিঞ্জ, সুঁচ ইত্যাদি জীবানু মুক্ত না হলে পেরিটোনিয়েল ডায়ালাইসিস ফ্লুইডকে পেটে ঢুকানোর সময় দুষিত করে ফেলে। তাছাড়া কেথেটারের গা বেয়েও রোগ জীবানু পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে এটা বেশী হয় সি, এ, পি, ডি এর বেলায়। আই, পি ডি, এর বেলায় কেথেটার বার বার উঠা নামা করলেও রোগ জীবানু পেটের ভিতর ঢুকে যেতে পারে।

ইনফেকশানের ফলে পেরিটোনিয়েল মেমব্রেনের কার্যকারিতা কমে যায় এবং এডেশান (Adhesion) হয়ে ভবিষ্যতে খাদ্যনালী পেঁচ খেয়ে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। সর্বোপরি জীবন রকম ইনফেকশানের ফলে রোগীর মৃত্যু হওয়ার ও আশংকা থাকে।

ব্যাথ্যা ঃ

অনেকক্ষেত্রেই পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসের সময় রোগী ব্যথা অনুভব করে এটার কারন হল নিম্নরূপ ঃ -

১। যদি কেথেটারের মাথা ব্লাডার অথবা রেকটামের সাথে ঘর্ষিত হয় অথবা পেছনের পেরিটোনিয়ামের সাথে ঘষা লাগে তবে ব্যথা অনুভূত হয় এক্ষেত্রে কেথেটার কিয়দংশ বের করে দিয়ে ব্যথা কমে যায়।

২। অনেক সময় হাইপারটনিক ফ্লুইড ব্যবহার করলে ওই ব্যথা অনুভূত হয়।

৩। কোন কোন ক্ষেত্রে বুঝা যায় না এসব ক্ষেত্রে ১% জাইলোকেইন পেটের মধ্যে ৫/৬ সাইকেল পর পর ঢুকিয়ে দিলে ব্যথা কমে।

৪। পেরিটোনাইটিস হলেও ব্যথা অনুভব হয়। এক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস ফ্লুইড পরীক্ষা করে তা বুঝা যায় এবং চিকিৎসা করা যায়।

৫। অনেক সময় রোগী কাঁধে ও বুকে রেফার্ড পেইন (Referred Pain) অনুভব করতে পারে।

রক্তক্ষরন (Bleeding) ঃ- আই, পি , ডি এর বেলায় ব্যথার পর রক্তক্ষরনই হল ২য় প্রধাণ জটিলতা। প্রথম সাইকেলে ফ্লুইড সামান্য রক্ত মিশ্রিত থাকতে পারে। তবে এটা পরের সাইকেল গুলোতে আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে যায়। প্রথম সাইকেলের রক্ত সাধারনত এবডোমিনেল ওয়ালের থেকেই আসে। কিন্তু কোন কোন ফ্লুইড একেবারে টাটকা রক্তের মত লাল এবং পরের সাইকেল গুলোতে পরিস্কার হতে না থাকলে তবে

banglainternet.com

পেটের ভিতর কোন রক্তনালী ফুটা হয়েছে বলে সন্দেহ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে হিপারিন ছাড়া ডুয়েল টাইম না দিয়ে ডায়ালাইসিস চালালে রক্তক্ষরন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পেটের ভিতরের অর্গান ফুটা করার সম্ভাবনা ঃ - প্রস্রাব করিয়ে না নিলে বা ইউরিনারী রিটেনশান থাকলে ডায়ালাইসিসের সময় ব্লাডার বা মূত্র থলি হয়ে ফুটো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কেথেটারের সাহায্যে ব্লাডার খালি করে নেয়া আবশ্যক।

Post Partum বা ডেলিভারীর পর একিউট ফেইলিউর হলে আই, পি, ডি এর সময় জরায়ু ফুটা করার সম্ভাবনা থাকে।

তাছাড়া বার বার আই, পি, ডি, করার পর এডেশান হয়ে থাকলে পরের দিকে পরিপাক যন্ত্র (intestine) ফুটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ডায়ালাইসিস প্রবাহ (Flow) বন্ধ হয়ে যাওয়া ঃ– অনেক সময় ফ্লুইড ভিতর যাওয়ার পর আর আসে না – এসব ক্ষেত্রে রোগীকে একটু পার্শ্ব পরিবর্তন করলে আবার ফ্লুইড আসতে থাকে। অনেক সময় একেবারেই আসেনা। এ সব ক্ষেত্রে দেখা যায় কেথেটারের ছিদ্র অংশটা ফিব্রিন ক্লট দিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে অথবা কেথেটারের সাথে ওমেনটাম (Omentum) পেঁচিয়ে গেছে। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে হিপারিন যুক্ত ফ্লুইড দিয়ে পরিস্কার (flush) করে দিলে আবার ফ্লুইড আসা শুরু হয় অন্যথায় কেথেটার খুলে নিয়ে (withdraw) নতুন কেথেটার ঢুকাতে হবে।

অনেক সময় ফ্লুইড সামান্য পরিমান গিয়ে আর যায় না। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় হয় কেথেটার পেটের মধ্যে ঢুকেইনি এবং এবডোমিনেল ওয়ালে false cavity এর সৃষ্টি হয়েছে। নতুন বার বার ডায়ালাইসিসের ফলে পেরিটোনিয়েল পকেটের সৃষ্টি হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে কেথেটার খুলে নিতে হবে এবং হিমো ডায়ালাইসিসে ট্রান্সফার করাই ভাল।

ফুসফুসের জটিলতা ঃ -

আই, পি, ডি এর ফলে নিউমোনিয়া, পালমোনারী কোলাপস ইত্যাদি জটিলতা দেখা দিতে পারে। এসব শিশু এবং বৃদ্ধদের বেলায় বেশী দেখা দেয়। এজন্য এসব ক্ষেত্রে কম সময়ের জন্য আই, পি ডি করা ভাল। বিরল ক্ষেত্রে হাইড্রোথোরাক্স ও দেখা যায় এবং এ ধরনের রোগীর ডায়াফ্রামে জন্মগত ফুটা থাকে।

প্রোটিন লস ঃ– (Protein loss) আই, পি, ডি প্রতি লিটার ডায়ালাইসেইট ৫০০ মিঃ গ্রাঃ প্রোটিন বেরিয়ে যায়। ইনফেকশান হলে আরও বেশী পরিমান প্রোটিন বেরিয়ে যায়। তাই যে সব রোগী আই, পি, ডি, করে বেঁচে আছে তাদের ১.৫ গ্রাম প্রোটিন প্রতি কেজি প্রতিদিন খাওয়া দরকার।

অপুষ্টি বা ম্যালনিউট্রিশান ঃ– (Malnutrition) অপরিমিত ডায়ালাইসিসের ফলে রোগী ভাল হয় না এবং খাওয়ার রুচি ফিরে পায়না। ফলে রোগী যথেষ্ট পরিমান খায় না। তাছাড়া ডায়ালাইসিসের ফলেও অনেক প্রোটিন বেরিয়ে যায়। এই দুই কারনে এসব রোগী অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে। অবশ্য এই জটিলতা সি, এ, পি ডি তে দেখা যায় না। শুধু যে সব ক্রনিক কিডনী ফেইলিউর রোগী আই, পি ডি, এর উপর আছে তাদের বেলায় দেখা যায়।

banglainternet.com

৩য় অধ্যায়

৪র্থ পরিচ্ছেদ

হেমোডায়ালিসিস
(HAEMODIALYSIS)

মতিউর রহমান

দুটো কিডনী একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে যে সমস্ত পদ্ধতিতে এই সমস্ত রোগীদেরকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় হেমোডায়ালিসিস তার অন্যতম। আজকের পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ লোক এরুপভাবে হেমোডায়ালিসিস এর মাধ্যমে মোটা মুটি সুস্থ জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশের ও বহু রোগী এরুপভাবে পি, জি, হাসপাতাল ও সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়মিত ভাবে হেমোডায়ালিসিস করে জীবন যাপন করছে।

আবাল এবং টার্নার যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে প্রথম জন্তুর উপর হেমোডায়ালিসিস করেন ১৯১৩সালে। আর মানুষের উপর হেমোডায়ালিসিস করা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে এবং পরে ইউরোপের হলাণ্ডের কলফ এবং সুইডেনের আলাওয়াল ছিলেন এক্ষেত্রে পাইওনিয়ার। প্রথম প্রথম হেমোডায়ালিসিস করা হোত শুধু মাত্র এ্যাকুট কিডনী ফেয়লিওর জন্য এবং ১৯৬০ সনে স্কিবলনার ও কুইনটন কর্তৃক আরটেরিও ভেনাস সান্ট প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রনিক কিডনী ফেওলিওর রোগীদের জন্য হেমোডায়ালিসিস এর প্রবর্ত্তন হয়। হেমোডায়ালিসিস এর বিভিন্ন দিক আলোচনার আগে এর মূল নিয়ম বা বেসিক প্র্যাকটিক্যাল সম্পর্কে জানা দরকার।

ঃ হেমোডায়ালিসিস এর মূল নিয়ম (Principle) ঃ

গ্রাহাম সর্ব প্রথম উনবিংশ শতাব্দীতে দেখান যে যদি ২ টি সলিউশন একটি সেমিপারমিয়েবল মেমেব্রেন দ্বারা আলাদা করা হয় তাহলে যে সলিউশনে কোন পদার্থ যেমন ধরুন লবন (সল্ট) বেশী পরিমানে থাকে

banglainternet

তাহলে বেশী পরিমানের দিক থেকে কম পরিমানের দিকে সেমিপারমিয়েবল মেমব্রেন এর মধ্যে দিয়ে যায় যাকে diffusion বলা হয়। এই diffusion দ্বারা শুধু সলিউট যাতায়াত করে। আর পানির সংগে যখন সলিউট যায় তখন তাকে আলট্রাফিলট্রেশন বলে। দুটি পদ্ধতি অর্থাৎ diffusion ও ultrafiltration এর মাধ্যমে শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ যেমন শরীরের রক্ত থেকে ডায়ালিসিস ফ্লুইড এ বেরিয়ে যায় তেমন ক্যালশিয়াম ও বাইকার্বোনেট ডায়ালিসিস কম্পার্টমেট থেকে রোগীর রক্তে যায় এবং সুস্থতা ফিরিয়ে আনে। ছবিতে এটা খুব সহজ করে দেখানো হয়েছে। সুতরাং হেমোডায়ালিসিস এর

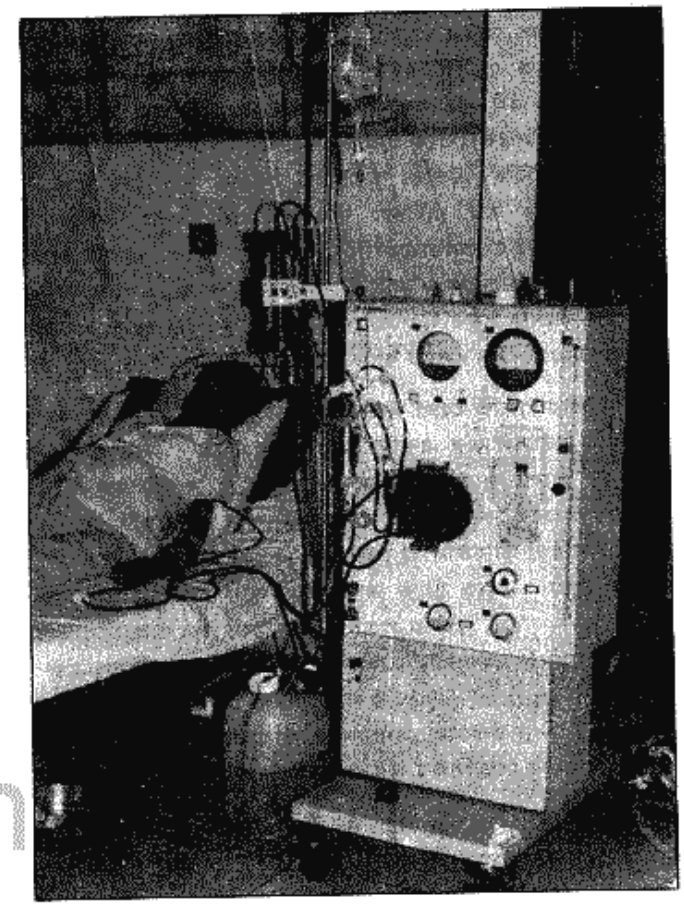

ছবি ১৪ হেমোডায়ালাইসিস মেশিনসহ ডায়ালাইসিস গ্রহণকারী একজন রোগী।

একটা প্রধান ব্যাপার হোল যে শরীর থেকে রক্ত বাহিরে এনে একে প্রবাহ করা হয় সেমিপারমিয়েবল মেমব্রেন দ্বারা তৈরী টিউবের মধ্যে দিয়ে বাইরে, ডায়ালিসিস ফ্লুইড অপর দিকে প্রবাহ হতে থাকে। শুরুতে এই রক্ত বের করা নিয়ে অনেক সমস্যা ছিল কিন্তু এখন সেটা অনেকাংশে সমাধান করা হয়েছে।

ভাসকুলার আকসেস (Vascular access) ঃ

বর্তমানে হেমোডায়ালিসিস এ ব্যবহৃত Vascular access পদ্ধতি গুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। ফেমোরাল ভেইন বা সাব ক্ল্যাভিয়ান ভেইন ক্যাথেটারাইজেশন এই দুইটি পদ্ধতিতে এ্যাকুট রেনাল ফেয়ালিওর রুগীদের হেমোডায়ালিসিস করা হয়ে থাকে। এই দুই পদ্ধতি ১ থেকে ৩/৪ সপ্তাহ পর্যন্ত কয়েকটি ডায়ালিসিস করা সম্ভব। তবে ইনফেকশন বা ক্যাথেটার ব্লক বা মিসপ্লেস হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এছাড়া আর্টেরিও ভেনাস সান্ট এর দ্বারা এ্যাকুট রেনাল ফেয়ালিওর এর রুগীদের এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্রনিক রেনাল ফেয়ালিওর রুগীদের হেমোডায়ালিসিস করা হয়ে থাকে। একটি ভাল সান্ট অবশ্য অনেক দিন ৩ থেকে ৬ মাস ভাল থাকতে পারে। এখানে সান্ট অনেক সময় ব্লক হয় অনেক সময় সান্টের গোড়ায় ইনফেকশন হয় ভাল নার্সিং ও ড্রেসিং অবশ্যই প্রয়োজন। সান্ট হাতে বা পায়ে করা যেতে পারে।

২। দ্বিতীয় পদ্ধতি হোল অপারেশনের মাধ্যমে সাধারণ হাতে (Wrist) রেডিয়াল ব্লাড ভেসেল এর একটি ব্রাঞ্চের সংগে যোগ করে দেয়া – এতে হাতের ভেইন গুলো ফুলে উঠে এবং ২ থেকে ৬ সপ্তাহ পর এই ভেইন গুলোর মধ্যে পাংচার কোরে রক্ত বের করে আনা যায়। এছাড়া ভেইন গ্রাফট অথবা আর্টিকোরিয়া ড্যাক্রোন বা গোরট্রেক্স টিউবও চামড়ার নীচে আর্টারী ও ভেইন এবং সংগেও জুড়ে দিতে ভাসকুলার আকসেস এর বন্দোবস্ত করা যায়। যেমন রক্ত বাইরে আনার পদ্ধতি এখন বেশ সহজ হয়েছে উপরোক্ত অগ্রগতি দ্বারা তেমনি হেপারিন আবিস্কার ও ব্যবহারের মাধ্যমে রক্ত যাতে ডায়ালাইসিস বা artificial kidney র মধ্যে জমাট বেধে না যায় তাও সমাধান হয়েছে এবং বিভিন্ন রকমের মেমব্রেন ও ডায়ালাইজার এর আবিস্কারের সংগে ক্রনিক রেনাল ফেয়লিওর এর রুগীদের জন্য বয়ে এনেছে দুনিয়া জুড়ে সুসংবাদ।

বিভিন্ন রকমের ডায়ালাইজার ঃ

বর্তমান এ প্রধানত তিন প্রকার ডায়ালাইজার ব্যবহার হয়ে থাকে ---

১। কয়েল (Coil) ঃ এই কয়েল এর ব্যবহার যদিও এখন কমে আসছে সত্তর দশকে এটাই ছিল প্রধান ডায়ালাইজার। এটা কিথ্রোকেন মেমেব্রন যা কিনা প্লাষ্টিক মেশের চারিদিকে জড়ানো। এর মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয় আর টিউব এর বাইরে দিয়ে ডায়ালিসিস ফ্লুইড সারকুলেট করে।

২। দ্বিতীয় ফ্ল্যাট প্লেট ডায়ালাইজার (Flat plate dialyser) এটা সাইজে আগে বড় ছিল যাকে বোর্ড বলা হত। কিন্তু বর্তমানে এটাকে ছোট করা হয়েছে। এটার কতকগুলো প্রান্ত থাকে এবং দুই প্রান্তর মধ্যে দিয়ে রক্ত এবং তার অপর পার দিয়ে ডায়ালাইসিস ফ্লুইড সারকুলেট করে বিপরীত দিকে এবং এখানেই পানি ও বিভিন্ন পদার্থের এক্সচেঞ্জ হয়।

৩। তৃতীয় ডায়ালাইজার , হলো ফাইবার ডায়ালাইজার (Hollow Fibre dialyser) এই রকম ডায়ালাইজারই সর্বাধিক আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে। পিজি হাসপাতালেও এই প্রকার ডায়ালাইজার ব্যবহার করা হচ্ছে। এর সাইজ ছোট যদিও বিভিন্ন (Surfacearea যেমন ০.৪ থেকে ২.০ স্কয়ার মিটার) Surface area র Hollow fiber dialyser পাওয়া যায় যা কি না ছোট শিশু থেকে প্রয়োজন মত বড়দের জন্য বেশী surface area র ডায়ালাইজার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন রকমের মেশিন ঃ

প্রথমদিকের rotatingdrum মেশিন থেকে আজকে কম্পিউটার যুক্ত বিভিন্ন রকমের মেশিন পাওয়া যায় এবং এখনকার মেশিনে বিভিন্ন রকমের মনিটর সিষ্টেম যেমন ডায়ালিসিস ফ্লুইড ঠিক কনসেনট্রেশন এ আছে কি না তা ইলকট্রনিক্যালি মেশিনে মনিটর হতে থাকে। একটু এদিক ওদিক হলেই মেশিন শব্দ করে বন্ধ হয় এবং কর্তব্যরত নার্স উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে। ছবিতে পিজিতে ব্যবহার করা হয় এমন একটি মেশিন দেখানো হয়েছে।

ডায়ালাইসিস ফ্লুইড ও পানি ঃ

প্রথমের দিকের মেশিন গুলোতে বড় ড্রাম থাকতো তার মধ্যে পানিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম,ক্যালশিয়াম ইত্যাদি মিশিয়ে ডায়ালিসিস ফ্লুইড তৈরী করা হতো। এখন অবশ্য আগেই হেমোডায়ালাইসিস Concentrate তৈরী করা থাকে যা কি না মেশিনের মধ্যে পানির সঙ্গে ১ ঃ ৩৫ ভাগে মিশ্রিত হয়ে। উপযুক্ত তাপে ডায়ালাইজারের মধ্যে যায় এবং পরে নির্গত হয়। এই পদ্ধতি একটি মেশিনের জন্য অথবা অনেকগুলি মেশিনের জন্য এক জায়গা তৈরী (Central delivery system) করা যায়।

banglainternet.com

ডায়ালাইসিস ফ্লুইড এর কম্পোজিশন, প্লাজমাতে যে রকম ইলেকট্রলাইট এর পরিমাণ থাকে তেমনি যেমন

১। সোডিয়ামঃ ডায়ালাইসিস ফ্লুইডের সোডিয়ামের কনসেনট্রেশান ১৩৫ – ১৪০ মিঃ মোল প্রতি লিটারে

২। পটাশিয়াম ২.০ মিঃ মোল প্রতি লিটারে

৩। ক্যালসিয়াম ২–৩ মিঃ মোল প্রতি লিটারে

৪। ম্যাগনেশিয়াম ১ – ১.৫ মিঃ মোল প্রতি লিটারে

৫। অ্যাসিটেট ২৩ মিঃ মোল প্রতি লিটারে

৬। গ্লুকোজ ২০০ মিঃ গ্রাম প্রতি লিটারে

ডায়ালাইসিস মেশিনে পানি যাবার আগে প্রথমে পানি থেকে ব্যাকটেরিয়া, পাইরোজেন এবং ক্লোরাসিন ইত্যাদি বড় বড় Particle পানিকে কার্বণ ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে পাস করিয়ে পরিস্কার করে পরে পানিতে ক্যালসিয়াম বা অন্যান্য পদার্থ যেমন এ্যালুমিনিয়াম, ফ্লোরাইড ইত্যাদি থাকলে ডি আয়োনাইজ বা reverse osmosis এর মাধ্যমে সে গুলোকে remove করা হয়। সাধারণত reverse osmosis যথেষ্ট এবং এই Method পিজিতে হোমোডায়ালাইসিস মেশিনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

কোন রোগীকে কি ধরনের ডায়ালাইসিস করা হয়।

যাদের দীর্ঘদিন (Long term) হেমোডায়ালাইসিস করা হয় তা হাসপাতালে বা বাড়ীতে করা যায়। বাড়ীতে করলে রোগীর স্বাধীনতা বাড়ে এবং খরচ কম হয়। প্রতি সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন প্রতিবারে ৪ ঘন্টাকরে ডায়ালিসিস করা উচিৎ। ডায়ালাইসিস এ থাকা কালীন অবস্থায় অনেককে donar পেলে কিডনী সংযোজন করা হয় আর যাদের donar নেই বা অন্যকারণে সংযোজন সম্ভব নয় তাদের ডায়ালাইসিসেই রাখা হয়। ডায়ালাইসিস একটি Costly ব্যাপার। প্রতি রোগীকে এক বছর হেমোডায়ালাইসিস করতে খরচ হয় ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা। অবশ্য ডায়ালাইজার যদি ৩/৪ বার ব্যবহার করা যায় তাহলে এই খরচ কমিয়ে আনা যায় কিছুটা।

ডায়ালাইসিস রোগীর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ঃ

এই সমস্ত রোগীদের সমস্যা থাকে যেমন অনেকের উচ্চরক্তচাপ থাকে, বোন ডিজিজ বা রক্তশূন্যতা ইত্যাদি। তাই রোগীরা ডায়ালাইসিস এ থাকলেও নীচের বিষয়গুলির উপর চিকিৎসক দের নজর রাখা প্রয়োজন।

খাদ্য ঃ– এই সমস্ত রোগীকে আমিষ জাতীয় খাদ্য ১.০ গ্রাম প্রতি কিঃ গ্রাঃ বডি ওয়েটের জন্য দেয়া প্রয়োজন। এবং গড়ে ৩০–৩৫ ক্যালোরি প্রতি কিঃগ্রাঃ বডি ওয়েটে দেয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে গরীব রোগীদের diet সাধারণত এই পরিমাণ আমিষ থাকে না।

পানি ঃ– যেহেতু রোগীদের প্রতি সপ্তাহে অর্থাৎ ১৬৮ ঘন্টার মধ্যে ১২ ঘন্টা (সপ্তায় ৪ঘন্টা করে ৩ বার ডায়ালাইসিস) করা হয়–– এই রোগীদের পানির পরিমাণ বেঁধে দেয়া হয়। তাছাড়া এদের শরীর ফুলে যায় এবং রক্তচাপ বেড়ে যায়।

ভিটামিন ঃ– ডায়ালাইসিস এর মধ্যে যে সমস্ত ভিটামিন যেমন বি কমপ্লেক্স , ভিটামিন সি, ও ফোলিক অ্যাসিড শরীরে থেকে বেরিয়ে যায় তাই এই সমস্ত রোগীকে উপরোক্ত ভিটামিন নিয়মিত সেবন করতে দেয়া উচিত।

রক্তচাপ ও হার্ট ফেইলিওর ঃ

পানি বেশী খেলে হাতে পায়ে পানি আসবে। পেটে পানি আসতে পারে ও রক্ত চাপ বেড়ে হার্ট ফেইলিওর হতে পারে। যে সমস্ত রোগীদের ঠিকমত ডায়ালাইসিস হওয়া সত্বেও রক্তচাপ বেশী থাকে তাদের ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে রক্তচাপ কমিয়ে স্বাভাবিক রাখা উচিৎ।

রক্তশূন্যতা ঃ হেমোডায়ালাইসিস রোগীদের এই anaemia একেবারে যায় না। তবে যখন রক্ত শূন্যতা বেশ একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয় তখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার এবং আয়রণ অভাব থাকলে মুখে আয়রণ দেয়া উচিৎ।

হাড়ের ব্যাধি ঃ হাড়ের ব্যাধি ক্যালশিয়াম ফসফেট এবং এ্যালুমিনিয়াম এর জন্য হয়। ফসফেট কমানো উচিৎ ডায়ালাইসিস এ ফসফেট কমে গেলেও যদি ক্যালশিয়াম বেশি থাকে তাহলে ক্যালশিয়াম Supplement অথবা ভিটামিন ডি এর অ্যাকটিভ ফরম দেয়া যেতে পারে। ক্যালশিয়াম খুব কমা বা বাড়া দুটোই খারাপ সুতরাং মাঝে মাঝে রক্ত পরীক্ষা করে দেখা

banglainternet.com

দরকার। অবশ্য এ্যালুমিনিয়াম পানি থেকে বের করে করার ফলে এর দরুন হাড়ের ব্যধি হ্রাস পেয়েছে।

ডায়ালিসিস এর জটীলতা (Complications) :

দুই ভাগে ভাগ করা যায়

১। এ্যাকুট যেমন ডায়ালিসিস এর সময় রক্তক্ষরণ, embolism, রক্তচাপ কমে যাওয়া, শরীরে সোডিয়াম কমে যাওয়া, পায়ে Crump, জ্বর ইত্যাদি।

২। ক্রনিক যেমন রক্ত শুন্যতা ও উচ্চরক্তচাপ, আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এই রোগীদের অনেক সময় মানসিক রোগ যেমন ডিপ্রেশান ইত্যাদি দেখা যায়। তাছাড়া ইনফেকশান, টিউবার কুলোসিস, সেরিব্রোভাসকুলার ডিজিজ, ভাইরাল হেপাটাইটিস, পেটের আলসার এবং হার্ট ডিজিজ। বস্তুত হার্ট ডিজিজ এই সমস্ত রোগীদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

উপসংহার ঃ

হেমোডায়ালিসিস এর উপরোক্ত সমস্যা গুলি সত্বেও আজকের পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক এই পদ্ধতির মাধ্যমে সুস্থজীবণ যাপণ করছে। হেমোডায়ালিসিস এর ফলে গড়ে ৫ বৎসর সার্ভাইবাল টাইম ৮৫-৯৫%। ক্রনিক কিডনী ফেয়লিওর প্রিভেনশান করতে না পারলে এর হেমোডায়ালাইসিস এর চেয়ে ভাল কোন বিকল্প আবিস্কার না হওয়া পর্যন্ত এটি একটি পদ্ধতি যা সবদেশে ব্যবহার হতে থাকবে এবং সন্দেহ নাই আগামীতে বাংলাদেশেও আরও অনেক রোগী এই পদ্ধতির দ্বারা প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম হবে।

৪র্থ অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

ট্রান্সপ্লান্টেশন ইমিউনোবায়োলজি
(TRANSPLANTATION IMMUNOBIOL OGY)

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

ভুমিকা ঃ

বিশ্বের প্রথম সাফল্য জনক ট্রান্সপ্লান্ট ১৯৫৪ সনে পিটার বেন্ট হাসপাতালের জোসেফ-ই-মারী সম্পন্ন করেন। দুটো আইডেন্টিক্যাল টুইনের মধ্যে এই ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় এবং রোগী ৮ বৎসর স্বাভাবিক ছিল। এর দুবৎসর আগে আনরিলেটেড ডোনারএর মধ্যে অনেকগুলো ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় কিন্তু তা কার্য্যকরী হয়নি। এ সময়ে প্রাথমিক সাফল্য ছাড়া প্রায় সব ট্রান্সপ্লান্টই রিজেকশান রেসপনস্ এর জন্য অকার্য্যকরী হয়ে যায়।গত কয়েক বৎসরে কিডনী এবং অন্যান্য অর্গান ট্রানসপ্লান্টে একটি যুগান্তকারী উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষতঃ সফল টিস্যু ম্যাচিং এবং ইমিনোসাপ্রেশন এর মাধ্যমে রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট বর্তমানে নিরাপদ এবং বিশ্বাসযোগ্য চিকিৎসা হিসাবে প্রমানিত বিশেষতঃ এণ্ডষ্টেজ রেনাল ফেইলার এবং কিডনী অকার্য্যকারীতায়। ৩০ বৎসর আগে যেখানে এণ্ড ষ্টেজ রেনাল ফেইলার হলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল সেখানে বর্তমানে এ সমস্ত রোগীর গড় জীবন প্রায় দুবৎসর। বিশ্বের উন্নত এবং অনুন্নত সব দেশেই এই রেণাল ফেইলার একটি বিরাট সমস্যা। যতক্ষন না একটি ডোনার কিডনী পাওয়া যায় ততক্ষন এ সমস্ত রেনাল ফেইলার এর রোগীকে পেরিটোনিয়াল বা হেমোডায়ালাইসিস প্রোগ্রামে রাখতে হবে।

ডায়ালাইসিসে যে সমস্ত রোগী রাখা হয় তার সবগুলিই কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট এর জন্য উপযোগী নয় বিভিন্ন কারণে। এখন ট্রান্সপ্লান্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টিস্যু টাইপিং এবং সাইটোটক্সিক এন্টি বডিজ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

banglainternet.com

টিস্যু টাইপিং এবং সাইটোটক্সিক এন্টি –বডিজ ঃ

লোহিত কণিকার উপরস্থিত এ বি ও ব্লাড গ্রুপ এর এন্টিজেন এবং তাদের ন্যাচারালি অকারিং এন্টি বডিস কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্যই এরা প্রথম গ্রুপ ট্রান্সপ্লান্টেশন এন্টিজেন হিসেবে স্বীকৃত। অন্য দ্বিতীয় গ্রুপ ট্রান্সপ্লান্টেশন এন্টিজেন হচ্ছে এইচ এল এ সিষ্টেম। এইচ এল এ এন্টিজেন শরীরের সব নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষে উপস্থিত থাকে যদিও এদের টিস্যু ডিষ্ট্রিবিউশান এক নয়। এন্টি এইচ এল এ এন্টি বডি, এ বি এন্টিবডির মত ন্যাচারালি থাকে না। কিন্তু যখন কোন ব্যাক্তির ইমিউন সিষ্টেম ফরেন এইচ এল এ এন্টিজেনের সঙ্গে এক্সপোজ করা হয় তখনই তৈরী হয়। সেজন্য গর্ভাবস্থায়, রক্ত ভরণ বা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের কারণে এবং পূর্ববর্তী অকার্য্যকরী ট্রান্সপ্লান্টের কারণে এটা তৈরী হয়ে থাকতে পারে। এরকম তৈরী এন্টি এইচ এল এ এন্টিবডিজ সাইটোটক্সিক এন্টিবডি হয়ে থাকে এবং তারা রেসপেকটিভ এন্টিজেন এর জন্য স্পেশিফিক বা নির্দিষ্ট। একটি সাইটোটক্সিক এন্টিবডি কমপ্লিমেন্টের উপস্থিতিতে এইচ,এল এ এন্টিজেন সমৃদ্ধ একটি কোষকে লাইসিস বা ভেঙ্গে ফেলতে পারে এবং এটাই লিমফোসাইটোটক্সিসিটি টেষ্টের বেসিক বা আদর্শ যা টিস্যু টাইপিং এবং সাইটোটক্সিক ক্রশ ম্যাচিং এর জন্য অপরিহার্য।ক্রমোজম নম্বর ৬ এ চারটি প্রধান এইচ এল এ এন্টিজেনিক গ্রুপ আছে যেগুলো হলো এইচ এল এ এ, বি, সি এবং ডি, আর। এই জিনগুলো ডমিনেন্ট। সেজন্য দুটো এন্টিজেনই প্রত্যেকটি লোকাস এ এক্সপ্রেস করে।

এইচ এল এ এ, বি এবং সি এন্টিজেন সব নিউক্লিয়েটেড সেল বা নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষে উপস্থিত থাকে কিন্তু ডি, আর এন্টিজেন শুধুমাত্র বি লিমফোসাইটে, ডেনড্রাইটযুক্ত সেল, মাক্রোফেজ এবং রেণাল ভাসকুলার এণ্ডোথেলিয়াম উপস্থিত থাকে।

এইচ এল এ এন্টিজেন বংশগতভাবে আসে। প্রত্যেক ব্যক্তিতার পিতার কাছথেকে অর্ধেক ক্রমোজম নম্বর ৬ এবং মাতার কাছ থেকে বাকী অর্ধেক লাভ করে।এজন্য এদের নাম যথাক্রমে প্যাটার্নাল হ্যাপলোটাইপ ৬ এবং ম্যাটারণাল হ্যাপলোটাইপ ৬। সেজন্য প্রত্যেক পরিবারে শতকরা ২৫ ভাগ সম্ভাবণা থাকে দুই সন্তান বাবা–মার কাছ থেকে দুটো একই ধরণের হ্যাপলোটাইপ লাভ করার যাদের টিস্যু টাইপিং একই রকম হবে, শতকরা ৫০ভাগ সম্ভাবণা থাকে তাদের একটি হ্যাপলোটাইপ লাভ ভাগাভাগি করে লাভ করার এবং ২৫ ভাগ সম্ভাবণা থাকে কোন হ্যাপলোটাইপ ভাগাভাগি করে না পাওয়ার যেখানে সম্পূর্ণ এইচ এল এ মিসম্যাচ হবে। সঠিক টিস্যু

টাইপিং এর জন্য প্রচুর পরিমান এইচ এল এ টাইপিং সিরা প্রয়োজন হয় যার লিষ্ট বা তালিকা নীচে দেওয়া হলো। প্রত্যেকটি সিরার মধ্যে একটি সিঙ্গেল এইচ এল এ এন্টিজেনের টাইপ স্পেশিফিক এন্টিবডি সিরার মধ্যে হাইটাইটারে থাকে। পেরিফেরাল ব্লাড লিমফোসাইট যার এইচ এল এ এন্টিজেন আননোন বা অজানা ঐ সমস্ত জানা সিরার সঙ্গে ইনকিউবেট করে রিঅ্যাকশন বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কমপ্লিমেন্টে উপস্থিতিতে জানা টাইপড সিরাম করেসপণ্ডিং আননোন বা অজানা এন্টিজেনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে সেল লাইসিস বা কোষ ধ্বংস করে।

ক্রশম্যাচিং ঃ সাইটোটক্সিক ক্রশম্যাচ করা হয় পটেনশিয়াল রিসিপিয়েন্ট এর মধ্যে সার্কুলেটিং এন্টিডোনার এন্টি বডি আছে কিনা তা দেখার জন্য। ডোনার লিমফোসাইট যেখানে ডোনারের এইচ এল এ এন্টিজেন উপস্থিত থাকে, রিসিপিয়েন্ট এর সিরাম এর সঙ্গে ইনকিউবেট করা হয় কমপ্লিমেন্ট এর উপস্থিতিতে , যদি লাইসিস হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ডোনার স্পেশিফিক সাইটোটক্সিক এন্টিবডি আছে। সেক্ষেত্রে ট্রান্সপ্লান্টেশন কন্ট্রাইণ্ডিকেটেড হবে, কারণে হাইপার একুট রিজেকশন হতে পারে। তবে এর ব্যতিক্রম আছে এবং ট্রান্সপ্লান্টেশন এন্টিবি সেল এন্টি-বডি এবং ক্রশ রিএ্যাকটিভ অটোএন্টিবডির উপস্থিতি সত্বেও করা যেতে পারে।

এইচ এল এ --- লোকাই

সেন্টোমেয়ার	DR		B			C	A	ক্রমোজোম-৬
DR	1	B	7	BW	52	CW 1	A	1
DR	2	B	8	BW	53	CW 2	A	2
DR	3	B	13	BW	54	CW 3	A	3
DR	4	B	14.1	BW	56	CW 4	A	11
DR	5	B	18	BW	57	CW 5	AW	23
DRW	6	B	27	BW	58	CW 6	AW	24
DR	7	BW	35	BW	59	CW 7	A	25
DR	8	B	37	BW	60	CW 8	A	26
DRW	9	BW	38	BW	61		A	28
DRW	10	BW	39	BW	62		A	29

banglainternet.com

BW 41	BW 63	AW 30
BW 42		AW 31
BW 44		AW 32
BW 45		AW 33
BW 47		AW 34
BW 48		AW 36
BW 49		
BW 50		
BW 51		

এইচ এল এ এবং রোগের সহযোগিতা ঃ অনেক রোগের সঙ্গে এইচ এল এ র একটা সহযোগী অবস্থা বিরাজমান। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো এনকোলোইজিং স্পোণ্ডেলাইটিস এবং এইচ এল এ বি ২৭। যাদের এইচ এল এ বি ২৭ এন্টিজেন থাকে তাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবণা ৯০ গুন বেশী থাকে। তাছাড়াও আরও অনেক রোগের সংগে এইচ এল এ এন্টিজেনের সহযোগী অবস্থা আছে।

এইচ এল এ এর তাৎপর্য্য ঃ

ক. অর্গান ট্রান্সপ্লাটেশন -- যে কোন ধরণের অর্গান ও টিস্যু ট্রান্সপ্লান্টেশানে এইচ এল এ ম্যাচিং এর তাৎপর্য্য সর্বাধিক।

খ. ইমিউন কমপ্লেক্স রেগুলেশন ঃ ইমিউন রেসপন্স যেমন কোন এন্টিজেনের বিপরীতে আই জি ই (IgE) রেসপন্সের ম্যাগনিচুড কত হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে ইমিউন রেসপন্স জীন (Ir gene) যা H L A এর $\frac{D}{DR}$ অংশে ম্যাপ করা থাকে।

গ. ইমিউনরেসপন্স – সেল টু সেল ইন্টার এ্যাকশানস ঃ – অনেকগুলো সেল এর সুক্ষ যোগাযোগ সমতার উপর ইমিউন রেসপন্স নির্ভরশীল। যেমন এন্টিজেন প্রেজেন্টেশানের সময় ম্যাক্রোফেজের অবশ্যই টি (T) এবং বি (B) সেল এবং অনেক ক্ষেত্রে হেলপার টি (T) সেল, বি (B) সেল বা ইফেক্টার টি সেল এর সংগে প্রতিক্রিয়া করতে হয়।

ঘ. হোষ্ট ডিফেন্স ঃ- সি টি এল (CTL) ভাইরাস ইনফেকশান ও টিউমার সেল এর বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সাইটোক্সিক টি (T) সেল এর প্রোটেকটিভ ক্ষমতা তাদের ভাইরাস এবং নিউপ্লাষ্টিক সেল ধ্বংসের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশান ঃ

যদিও বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে এবং সার্জারির কুশলতায় বিভিন্ন টিস্যু বা অর্গান যেমন স্কিন, কিডনী, হার্ট, লাঙ্গ, লিভার, স্পিলিন, বোন মারও, এণ্ডোক্রাইন অর্গান ইত্যাদির সাফল্যজনক ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য রিসিপিয়েন্ট এর ফরেণ গ্রাফট ধারণের ক্ষমতাকে আমরা স্থায়ী করতে পারিনি। রিজেকশনের অনেক কারণের মধ্যে একটি এইচ এল এ যা ইতিমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। এইচ এল এ ছাড়াও অন্য যে সকল ফ্যাক্টর রিজেকশনের জন্য কাজ করে তা নীচে বর্ণনা করা হোল।

(ক) টি সেল মেডিয়েটেড রিএ্যাকশানস ঃ ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশানে টি (T) সেলের ভূমিকা মানুষ এবং এক্সপেরিমেন্টাল এনিমেল এর বেলায় প্রমানিত হয়েছে কিভাবে টি লিমফোসাইট গ্রাফট ডেষ্ট্রাকশনে কাজ করে। সাইটোক্সিক টি লিমফোসাইট (সি টি এল) এবং ডিলেড হাইপারসেনসিটিভিটি উভয়েই এই রিজেকশানে কাজ করে। এলোজেনিক এইচ এল এ এন্টিজেনের বিরুদ্ধে জননপ্রাপ্ত সি টি এল (CTL) এন্টিবডির তৈরী হয়। টি সেল মেডিয়েটেড রিএ্যাকশান শুরু হয় যখন রিসিপিয়েন্ট এর লিমফোসাইট ডোনার এইচ এল এ এন্টিজেনকে চিনে ফেলে। বিদেশী এই এইচ এল এ এন্টিজেনকে টি নিমফোসাইট গ্রাফটেড অর্গানের মধ্যে চিনতে পারে অথবা ডোনার এন্টিজেন শেড হওয়ার পর রিজিওনাল লিম্ফনোডে যাওয়ার পরও এটা হতে পারে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে ডোনারের লিমফয়েড সেল বা ডেনড্রাইটিক সেল এর মধ্যে দুই ধরনের ইমিনোজেন থাকে (ক্লাশ I এবং II) দুই ধরণের টি সেল (সি টি এল) জননে সম্পৃক্ত হয়। একটা ও কেটি 8(OKT_4) পজিটিভ টি হেলপার সেল যারা এইচ এল এ ডি এন্টিজেনের বিপরীতে জনন শুরু হয় এবং অন্য একটি ও কেটি (OKT 5/8) ৫/৮ পজিটিভ সি টি এল প্রিকারসার জনন সেল যার মধ্যে ক্লাশ – ১ রিসেপটার থাকে ডিফারেন্সিয়েট করে ম্যাচুর সি টি এল (CTL) হয়। সি টি এল এই ডিফারেণসিয়েশন তাদের পূর্বসুরীদের থেকে ত্বরান্বিত এবং সুবিধাজনক করে, প্রলিফারেটিং টি হেলপার সেল থেকে নিঃসৃত হেলপার

banglainternet.com

ফ্যাক্টর দিয়ে। এই ভাবে জননকৃত প্রাপ্তবয়স্ক সি টি এল দাতার ক্লাশ ১ এইচ এল এন্টিজেনের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া করতে পারে এবং গ্রাফট এর মধ্যস্থিত যে কোন নিউক্লেয়েটেড সেল ধ্বংস করতে পারে। এই স্পেশিফিক সাইটোটক্সিক টি সেল ছাড়াও সেনসেটাইজেশনের ফলে লিমফোকাইন সিক্রেটিং টি (T) কোষ তৈরী হয় যারা মাক্রোফেজ ও অন্যান্য লিমফোসাইট সংগ্রহ করে।

(খ) এন্টিবডি মেডিয়েটেড রিএ্যাকশ্যানস ঃ

(১) প্রিফরমডে সার্কুলেটিং এন্টিবডিজ রিসিপিয়েন্ট এর শরীরে ট্রান্সপ্লান্টের পূর্বেই উপস্থিত থাকে। এটা সাধারণতঃ রিসিপিয়েন্ট এর শরীরে রক্তভরণ বা ট্রান্সফিউশান, পূর্ববর্তী গর্ভাবস্থা, এইচ, এল, এ, ক্রস রিএ্যাকটিং ব্যকটেরিয়াল বা ভাইরাল এন্টিজেনের কারণে প্রদাহ ইত্যাদির কারণে রোগী প্রি সেনসিটাইজড হয়ে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে ট্রান্সপ্লান্টেশান হওয়ার সংগে সংগে রিজেকশান হয়ে যায় সার্কুলেটিং ডোনার এন্টিবডি গ্রাফট এর ভাসকুলার বেড এর এন্টিজেনের সংগে লাগার প্রতিক্রিয়ার জন্য। এণ্ডোথেলিয়াল সেল এর এন্টিজেনিক কম্পোনেন্ট হোষ্ট এর প্রাথমিক ইমিউন রিকগনিশন এবং ইফেক্টার মেকানিজম এর জন্য দায়ী। এই রিএ্যাকশানেকে হাইপারএক্যুট রিজেকশান বলে। হাইপারএক্যুট রিজেকশনের জন্য দায়ী এন্টিডোনার এন্টিবডি যা পরিচালিত হয় এইচ এল এ অথবা রক্তগ্রুপের এন্টিজেনের বিপরীতে। বর্তমানে প্রতীয়মান হচ্ছে যে নন এইচ এল এ এন্টিজেনও যা এণ্ডোথেলিয়াল সেল এবং মনোসাইটে উপস্থিত থাকে এই রিজেকশানে ভূমিকা রাখতে পারে।

(২) রিসিপিয়েন্ট যারা পূর্বে ট্রান্সপ্লান্টেশন এন্টিজেনে সেনসেটাইজড নয়, কিন্তু ক্লাশ ১ এবং এইচ এল এ এন্টিজেনে এক্সাপোজ হয় সেখানে এ সমস্ত তৈরী এন্টিবডি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইনজুরি করতে পারে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট ডিপেনডেন্ট সাইটোক্সিসিটি, এন্টিবডি ডিপেনডেন্ট সেল মেডিয়েটেড সাইটোলাইসিস এবং এন্টিজেন এন্টিবডি কমপ্লেক্স তৈরীর মাধ্যমে। এই এন্টিবডির টার্গেট হচ্ছে গ্রাফট ভাস্কুলেচার যা হিষ্টোলজীক্যালী ভাসকুল্যাইটিস হিসেবে দেখা যায় যার অপর নাম রিজেকশান ভাসকুলাইটিস। এন্টিবডি এবং এন্টিজেন এর প্রতিক্রিয়ার ফলে কমপ্লিমেন্ট ডিপেনডেন্ট টিস্যু ইনজুরি শুরু হয় এবং ইনফ্লামেশন বা প্রদাহের অন্যান্য মেডিয়েটর যেমন প্লাটিলেট এগ্রিগেশন এবং নিঃসরণ, নিউট্রোফিল লাইসোমাল এনজাইম এর মুক্তি, কোয়াগুলেশন, ফিব্রিনোলাইসিস এবং কাইনিন সিষ্টেম এর এক্টিকটিভেশন।

রিজেকশন রিএ্যাকশনের মরফোলজী ঃ

রিজেকশন রিএ্যাকশনের এর মরফোলজী সাধারণত তিন ভাগে বর্ণনা করা যায়। এগুলো হাইপারএকুট, একুইট এবং ক্রনিক রিজেকশান। যেহেতু এগুলো ট্রান্সপ্লান্ট এর সংগে সম্পৃক্ত সেজন্য এগুলোর মারফোলজী জানা আবশ্যক।

হাইপারএকুট রিজেকশন ঃ

রিসিপিয়েন্ট এর শরীরে উপস্থিত প্রিফমর্ড সার্কুলেটিং এন্টি বডির কারণে (যা ডোনার এর স্পেসিফিক এন্টিজেন এর বিপরীতে তৈরী হয়, এর জন্যই) এই হাইপারএকুট রিজেকশান হয়। এটা সাধারণত ট্রান্সপ্লান্টেশন করার সংগে শুরু হয়। যে সার্জন অপারেশন করছেন তিনি সহজেই তা বুঝতে পারেণ। গ্রাফট এর ভাসকুলেচার এনাসটোমোসিস করার পর যাদের এটা রিজেক্ট হবে না তাদের গ্রাফট স্বাভাবিক গোলাপী রং নেবে, স্বাভাবিক টিস্যু ভিগার নেবে এবং প্রস্রাব হবে। কিন্তু যে রোগীর হাইপারএকুট রিজেকশান হবে তার গ্রাফট সায়ানোটিক, মটলড এবং ফ্লাসিড হবে এবং কয়েক ফোটা রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব হবে। কোন কোন রোগীর ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া কয়েক ঘন্টা থেকে শুরু করে কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হতে পারে। এটা নির্ভর করে রিসিপিয়েন্ট এর শরীরের সংবহন ক্ষেত্রে উপস্থিত সার্কুলেটিং এন্টি বডির টাইটার এর উপর। হিষ্টোলজিক্যালী ক্লাসিক আরথাস রিএ্যাকশনের চিত্র পাওয়া যাবে। প্রথম ঘন্টায় আর্টারিওলার এণ্ডোথেলিয়াম, গ্লোমেরুলাস এর মধ্যে এবং পেরিটিবিউলার ক্যাপিলারীতে নিউট্রফিল এর উপস্থিতি থাকবে। ভেসেল ওয়ালে ইমিউনোগ্লাবিউলিন এবং কমপ্লিমেন্ট জমা হবে। ইলেকট্রোন মাইক্রোসকপি করলে এণ্ডোথেলিয়ামএ ইনজুরি এবং ফিব্রিন প্লাটিলেট থ্রম্বাই পাওয়া যাবে। পরবর্তীতে পরিবর্তনগুলো ডিফিউজ এবং ইনটেন্স হয়ে গ্লোমেরুলাসে ক্যাপিলারির থ্রম্বোটিক অকলুসন হয়।

একুট রিজেকশান ঃ

চিকিৎসা ছাড়া ট্রান্সপ্লান্ট করার কয়েকদিনের মধ্যে বা যাদের ইমিউনোসাপ্রেশন চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ করে তা বন্ধ করা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে মাস থেকে বৎসরের মধ্যে হঠাৎ এই রিজেকশান হতে পারে। এই রিজেকশানে সেলুলার এবং হিউমোরাল উভয় প্রক্রিয়াই কাজ করে। হিষ্টোলজিক্যালী হিউমারাল রিজেকশান এর জন্য ভাসকুলাইটিস এবং সেলুলার রিজেকশান হলে ইন্টারস্টিশিয়াম এ মনোনিউক্লিয়ার সেল

banglainternet.com

ইনফিলট্রেশন হবে। সংগে ইডিমা ও হেমোরেজ থাকতে পারে। একুট সেলুলার রিজেকশান হলে রেণাল ফেইলার এর একুট লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় এবং এটা ট্রান্সপ্লান্ট এর কয়েক মাসের মধ্যে হয়ে থাকে। একুট রিজেকশান ভাসকুলাইটিস বা হিউমোরাল রিজেকশান ট্রান্সপ্লান্টেশানের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে হয় বিশেষতঃ যাদের ইমিউনোসাপ্রেসিভ চিকিৎসা বন্ধ করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাফট এর কাজ খুব কমে যায় এবং অধিক ডোজে ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট দিলেও আর কাজ হয়না।

ক্রনিক রিজেকশান ঃ

এ সমস্ত রোগীর ক্রমান্বয়ে সিরাম ক্রিয়েটিনিন এর মান স্বাভাবিকের থেকে বেশী বাড়তে থাকে এবং ৪ থেকে ৫ মাসের মধ্যে এটা দেখা যায়। ভাসকুলার পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ডেন্স ইন্টিম্যাল ফাইব্রোসিস বিশেষতঃ আর্টারির, টিবিউলস এর এট্রোফি, রেণাল প্যারেণকাইমার সংকোচন এর সংগে মনোনিউক্লিয়ায় সেল ইনফিলট্রেট ও থাকতে পারে বিশেষতঃ প্লাজমাসেল এবং ইউসিনোফিল এর। অনেক ক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবিউলিন এবং কমপ্লিমেন্ট ভাসকুলার লেশিওনে উপস্থিত থাকে।

রেনাল এলোগ্রাফট রিজেকশান নির্ণয় এর পূর্ব চিহ্ন
(EARLY DIAGNOSIS OF RENAL ALLOGRAFT REJECTION)

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
মতিউর রহমান

কিডনী সংযোজনের পর দ্রুত এবং পূর্বেই এলোগ্রাফট রিজেকশান চিহ্ন নির্ণয় করতে পারলে রোগীর প্রগনোসিস ভাল হবে। এতে করে প্রাথমিক অবস্থায়ই চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে এবং রোগী উপকৃত হবে। রেনাল এলোগ্রাফট রিজেকশানের early ইনডিকেটরস সম্পর্কে বলার আগে এর টাইম কোর্স সম্পর্কে ক্রম অনুসারে আলোচনা করবো (টেবিল)।

টেবিল

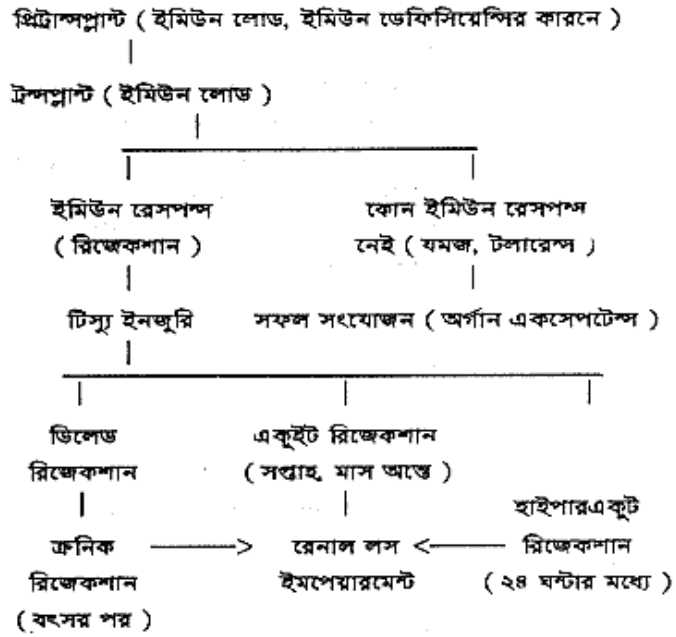

এটা প্রমানিত যে প্রিট্রান্সপ্লান্ট অবস্থায় রোগীর ইমিউন ষ্টেটাসের উপর রেনাল এলোগ্রাফট এর সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন সাইটোটক্সিক এন্টিবডি উপস্থিতির কারনে প্রি সেনসেটাইজেশনের ফলে ইমিউন লোড হতে পারে। আবার বহুবার রক্তসঞ্চালনের ফলে বা ডোনার স্পেশিফিক ট্রান্সফিউশনের ফলে বা ইমিউনোটলারেন্স হয়ে রোগীর ইমিউন ডেফিশেয়েন্সী হতে পারে। যখন কোন রোগী এলোগ্রাফট গ্রহণ করে তখনই তার ইমিউন লোড হয়ে যায়। এর ফলে হয় টিস্যু ইনজুরি হয়ে রিজেকশানের লক্ষনসমূহ প্রকাশ পায় এবং শেষ পর্যন্ত রেনাল লস বা ইমপেয়ারমেন্ট হয়। যদি কোন ইমিউন রেসপন্স না হয় যেমন যমজ এর ক্ষেত্রে বা যে সমস্ত রোগীর ইমিউন টলারেন্স আছে তাদের অর্গান একসেপটেড হয় এবং রিজেকশান ইপিসোড হয়না।

রেনাল এলোগ্রাফট রিজেকশানের জন্য কি কি পরীক্ষা প্রয়োজন ঃ

দ্রুত রেনাল এলোগ্রাফট রিশেকশানের জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা করা

banglainternet.com

প্রয়োজন তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

টেবিল

ক্লিনিক্যাল	অলিগুরিয়া, জ্বর, উচ্চরক্তচাপ, অন্যান্য লক্ষন
ল্যাবরেটরী টেষ্ট	WBC কাউন্ট বেশী, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ইউরেনারী সেডিমেন্ট একটিভিটি, স্মললিমফো সাইটোইউরিয়া (টাইপ-১), লার্জ ইনক্লুশান সেল, প্রটিনিউরিয়া, বান, সিরাম ক্রিয়েটিনিন , ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স, রেনাল টিবিউলার এসিডোসিস,রেনাল বায়োপসি।
বিশেষ ল্যাবরেটরী টেষ্ট	১৩১ আই হিপপিউরান স্কান
	৫৭ c_oB_{12} স্কান
	২০৩ Hg স্কান
	১৩৩ XC স্কান এবং ৮৫$_{kr}$ স্কান সিরাম এবং প্রস্রাবের এনজাইম (LDH , allk alin phosphatase)
ইমিউনোলজীক ষ্টাডি	সিরাম কমপ্লিমেন্ট আইসোএন্টিবডি এবং অন্যান্য হিউমোরাল এন্টি সিরাম ইমিউনোগ্লোবিউলিন, নন এন্টিবডি প্লাটিলেট সাইটোটক্সিসিটি।

শুধুমাত্র ক্লিনিক্যাল লক্ষণ সমূহই এই দ্রুত রোগ নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট নয় বরং এর সঙ্গে ল্যাবরেটারী টেষ্ট সমূহ এবং বিশেষ টেষ্ট সমূহ যেমন বায়োপসির সমন্বয় দ্রুত এলোগ্রাফট রিজানশাননির্ণয়ের জন্য জরুরী। যেমন সিরাম ক্রিয়েটিনিন, লিমফোসাইটোরিয়া স্মল সেল টাইপ, হিস্পউরান স্কান, প্রসাবের লাইসোজোমাল এনজাইম নির্ণয় খুব সহায়ক। এরসঙ্গে ইমিনোলজিক্যাল মনিটরিং যেমন সার্কুলেটিং কমপ্লিমেন্ট লেভেল খুব সহায়ক।

রেনাল এলোগ্রাফট রিজেকশান

টেবিল ইমিনোবায়োলজীল কারেক্ট থিওরীজ সমূহ প্রদর্শণ করা হল।

banglainternet.com

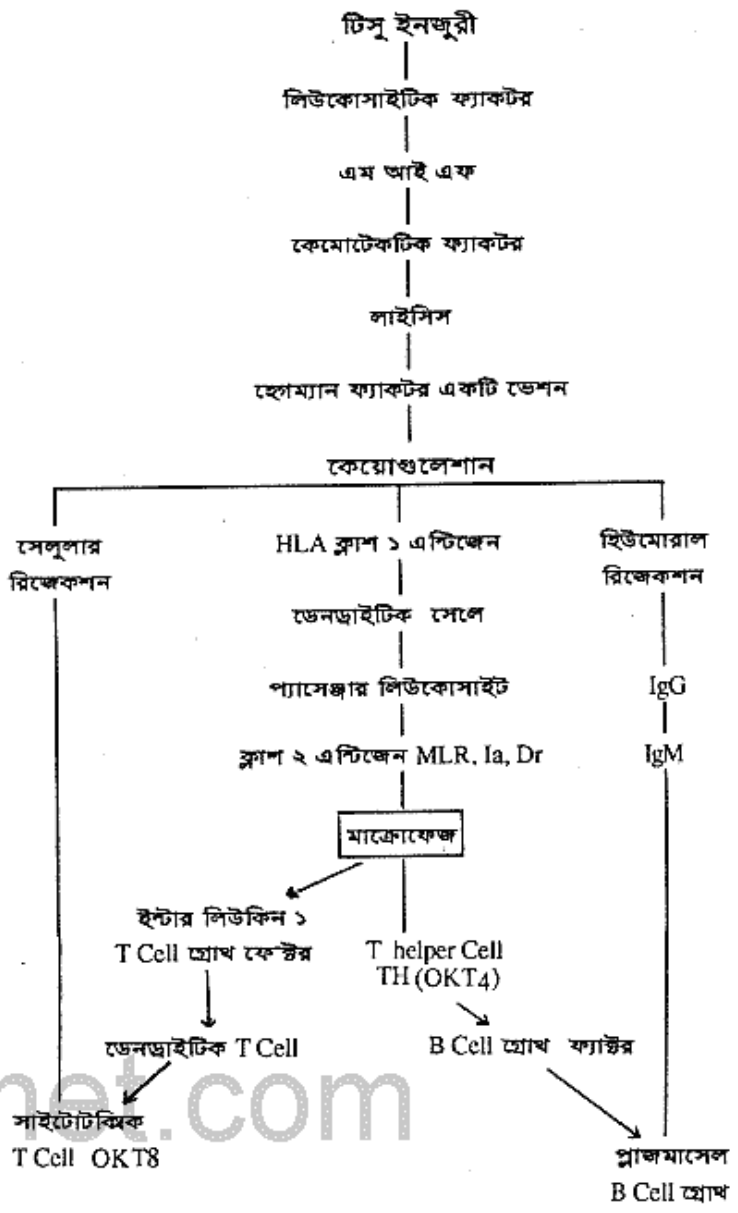

এটা ধারণা করা হয় যে, প্যাসেনজার লিউকোসাইট (ডেণ্ড্রাইটিক সেলের আকারে) ২য় ক্লাস এ্যান্টিজেন হিসাবে পরিচিত হয় এবং হোষ্টমেক্রাফেজ দ্বারা প্রসেজড হয়। এই সমস্ত মেক্রোফেজ থেকে নিঃসৃত সলিয়ুবুল ফ্যাকটর(ইন্টার লিউক্লিন ১) এর প্রভাবে কাছা কাছি অবস্থিত টি লিমফো সাইটগুলো টি হেলপার সেলে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যার উপস্থিতি সেল সারফেসেঅবস্থিত এন্টিজেন OKT4 দ্বারা বোঝা যায়। এই হেলপার সেল ইফেকটএর ফলে ইফেকটার সেল তৈরী করে। (OKT8) যা সাইটোটক্সিক টি সেল হিসাবে টিস্যু ইনজুরী করতে পারে। যে সমস্ত টিস্যুতে উপস্থিত এন্টিজেনের কারণে ও এর বিপরীত সেনসেটাইজড সেল তৈরী হয় এরা টিস্যুর প্রত্যাক্ষ্য ধ্বংস করে। অন্য দিকে B সেল লাইন এর ইফেকটার সেল এন্টিবডি মেডিয়েটেড রিএকশান করে। সুতরাং সেলুলার ও হিউমোরাল উভয় প্রকার ইমিউন রেসপন্স ক্লাশ ১ এন্টিজেন কে চিহ্নিত করতে পারে এবং টিস্যুইনজুরী করতে পারে।অন্য দিকে কোন বিশেষ এন্টিজেন এর বিপরীতে সেনসেটাইজড হেলপার T সেল T সাপ্রেসার সেল লাইন তৈরী করতে পারে। এই সাপ্রেসার সেল ইফেকটার T এবং B সেল উভয়েরই কার্যক্রম সাপ্রেস করতে পারে।

কিভাবে মনিটরিং করবেন ঃ

ক) টিসু ইনজুরি মনিটরিং ঃ – অনেকগুলো এনজাইম ইনজুরির ফলে রিলিজ হয় প্রস্রাবে যার মধ্যে কোয়াগুলেশনের প্রডাক্ট এবং নন স্পেশিফিক ইনডিকেটর আছে। এগুলো ক্লিনিক্যাল রিজেকশন নির্ণয়ের কয়েকদিন পূর্ব থেকে কয়েক ঘন্টা পূর্বে দেখা যেতে পারে। এর মধ্যে প্রস্রাবে লাইসোজাইম নির্ণয় খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া N এসিটাইলগ্লুকোমি এমাইনিডেজ, এলানিন, এমাইনোপেপটাইডেজ, এবং গামা গ্লুটামাইল ট্রান্সফারেজ নির্ণয়ও ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশান এ তাৎপর্য্যপূর্ণ। মোটামুটি এ গুলোর সমন্ধে ট্রান্সপ্লান্ট রিজেকশনের ৬.৪ দিন পূর্বে অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। অন্যান্য প্যারামিটার এর মধ্যে সিরাম ক্রিয়েটিনিন এর মান বাড়া (রিজেকশনের ১.৭ দিন পূর্বে), প্রস্রাবের থ্রম্বোক্সেন B_2 রিজেকশান এর একটা পূর্বাভাস। তবে এটা অন্যান্য রোগ যেমন গ্রস হেমাচুরিয়া, ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস এবং এসপিরিন দিয়ে চিকিৎসার ফলেও এর মান বেশী হতে পারে। সিরাম B_2 মাইক্রোগ্লোবিউলিন ইউরিয়া একটা দ্রুত ইনডিকেটর এলোগ্রাফট রিজেকশানের কারণে রেনাল ইনজুরীর।

খ) ষ্ট্রাকচার ফাংশান মনিটরিং -- DTPA হিপ্পিউরান স্কান , ক্যাট স্কান সনোগ্রাফী এবং ইনডিয়াম লেভেলড প্লাটিলেট স্কান রেনাল ষ্ট্রাকচার ও ফাংশান সম্পর্কে দ্রুত ধারণা দিতে পারে।

গ) ইমিউনোলজিক মনিটরিং --এগুলোর মধ্যে C M L আনরেসপনসিভনেসটেষ্ট, OKT_4/OKT_8 অনুপাত, একটু রিজেকশানের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং দ্রুত রিজেকশান নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত।

ঘ) ফাইন নিডল এসপিরেশন বা বায়োপসি -- এটা অত্যন্ত নিরাপদ পদ্ধতি রিজেকশান মনিটর করার জন্য।এটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুব কম এবং এর দ্বারা ইনফ্লামেটরী রেসপন্স ও একটু টিবিউলার নেক্রোসিস পৃথকী করণ করা সম্ভব এবং ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপির পর এইড হিসাবে কাজ করে। গ্রাফট বায়োপসি এবং ক্লিনিক্যাল লক্ষন সমূহ যখন কোরিলেট করা হয় তখন এর গুরুত্ব অত্যন্ত পরিস্কার, কিন্তু যখন ক্লিনিক্যাল লক্ষণ উপস্থিত থাকে না তখন এটা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। গ্রাফট বায়োপসি পারকিউটেনিয়াসলি করা হয় এবং স্পেশিমেন লাইট মাইক্রোসকপি, ইমিনোফ্লুরোসেন্স মাইক্রোসকপির জন্য প্রসেস করা হয়। এছাড়াও ইমিউনোপারঅক্সিডেজ ষ্টেইন করে CMV ইনফেকশান আছে কি না তা এক্সক্লুড করা হয়। রেনাল বায়োপসি করে দু ধরনের একুইট রিজেকশন পৃথক করা সম্ভব।

১) একুইট ইন্টারষ্টিশিয়াল রিজেকশান , যার বৈশিষ্ট হলো ইন্টার শিয়াল ইডিমা, মনোনিউক্লিয়ার সেল ইনফিলট্রেশন, নেগেটিভ ইমিউনো ফ্লুরোসেন্স।

২) একুইট ভাসকুলার রিজেকশান, যার বৈশিষ্ট হলো আর্টিরাইটিস বা আর্টারিওলাইটিস, আর্টারিয়াল ও আর্টারিওলার থ্রম্বোসিস এবং নেক্রোসিস, গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারী থ্রম্বোসিস এবং নেক্রোসিস, ইন্টারষ্টিশিয়াল হেমোরেজ এবং হাইপারিমিয়া, এবং ফ্রিব্রিনোজেন, কমপ্লিমেন্ট, ইমিউনোগ্লোবিল ডিপোজিশান ভেসেল এবং গ্লোমেরুলাইয়ে।

ইমিউনোলজিক্যাল ইনভেষ্টিগেশন এর মধ্যে -- টোটাল এ রোজেট ফর্মিং সেল, একটিভ ই রোজেট ফর্মিং সেল, OKT_4 / OKT_8 অনুপাত ইত্যাদি প্রধান।

ভাইরোলজিক্যাল ষ্টাডির মধ্যে --- কমপ্লিমেন্ট ফিক্সিং এন্টিবডি টাইটার, এন্টি ইমিডিয়েট আর্লিএন্টিবডি টাইটার এবং CMV ভাইরাস আইসোলেশান প্রধান ।

banglainternet.com

৪র্থ অধ্যায়

২য় পরিচ্ছেদ

কিডনী সংযোজন ঃ মেডিকেল দিক
(MEDICAL ASPECT OF KIDNEY TRANSPLANTATION)

হারুন উর রশিদ।

বিংশ শতাব্দিতে চিকিৎসা জগতে যে সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, তার মধ্যে Organ Transplantation বা অংগ সংযোজন একটি প্রধান বিষয়। এর মধ্যে কিডনী সংযোজন সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেছে।

জীব জন্তুর উপর প্রথম কিডনী সংযোজন পরীক্ষা করেন ভিয়েনার ডাঃ এমেরিক উলম্যান ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পর যুক্ত রাষ্ট্রের এলেক্সিস কারেল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কিডনী সংযোজনের চেষ্টা করেন।

১৯৫১ সালে David Hane একের পর একমৃত ব্যক্তির কিডনী সংযোজন শুরু করেন। এদের ভেতর অন্ততঃ ১ জনের কিডনী ৬ মাস ধরে টিকে গিয়েছিল।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের (Peter Bent) পিটারবেনট হাসপাতালে জমজ ভাইয়ের কিডনী সাফল্য জনক ভাবে সংযোজন করা হয় এবং এর পর থেকেই কিডনী সংযোজন ব্যাপ্তিলাভ করে।

কিডনী সংযোজন কি ?

একজন মানুষের কিডনী অন্য আর একজনের শরীরের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সংস্থাপন করাকে কিডনী সংযোজন বলে।

দুধরনের কিডনী সংযোজন হয়ে থাকে। নিকট আত্মীয়ের কিডনী তার নিকট আত্মীয়কে সংযোজন করলে তাকে বলে Living related transplant। নিকট আত্মীয় বলতে বাবা মা ও ভাই বোন বোঝায়। বাবা মার কিডনী ছেলে বা মেয়েকে দান করলে তাকে বলে Parent to Sibling transplant এবং ভাই

বোনের কিডনী একে অপরকে দান করলে বলে Sibling to Sibling transplant.

অন্যদিকে মৃত ব্যক্তির কিডনী অন্য কাউকে দান করলে তাকে বলে Cadaveric Kidney সংযোজন।

উন্নতঃ বিশ্বে ৮০ – ৯০ ভাগ কিডনী সংযোজন Cadaveric Kidney transplant এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এবং বাকী ১০ – ২০ ভাগ কিডনী নিকট আত্মীয়দের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অপর দিকে উন্নয়নশীল বিশ্বে ১০০ ভাগ কিডনী সংযোজন নিকট আত্মীয়ের মাধ্যমে সংযোজিত হয়ে থাকে।

Tissue typing কি?

কিডনী সংযোজন করতে হলে রক্তের গ্রুপ ও টিস্যু টাইপিং মিল থাকা প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ মিল না হলে কিডনী সংযোজন করা যায় না। তেমনি টিস্যু টাইপিং এর মিল যত বেশী হবে কিডনী সংযোজন ততবেশী নিরাপদ হবে। শরীরের রক্তে থাকে লোহিত কণিকা বা R B C এবং শ্বেত কণিকা বা W B C । লোহিত কণিকাতে থাকে রক্তের গ্রুপ আর শ্বেত কণিকাতে থাকে টিস্যু টাইপিং এর এন্টিজেন। রক্তের গ্রুপ যেমন বংশানুক্রমিক চলে অসে তেমনি টিস্যু এন্টিজেনও তাই। এরা দুইটি পৃথক ক্রমোজোম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রক্তের গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত হয় ক্রমোজোম ১১ এবং টিস্যু টাইপিং নিয়ন্ত্রিত হয় ক্রমোজম ৬ দ্বারা। ক্রমোজম ৬ টিস্যু এন্টিজেন ছাড়াও কমপ্লিমেন্ট কে নিয়ন্ত্রিত করে। এই জন্য একে বলে মেজর হিষ্টোকম্পাটিবিলিটি কমপ্লেক্স (Major histocompatibility Complex)। টিস্যু এন্টিজেনকে সাধারণত A B C D এই ৪ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এই এন্টিজেন গুলো বাবা মার কাছ থেকে ছেলে মেয়েরা পেয়ে থাকে। পিতার নিকট হতে ৫০ ভাগ এবং মায়ের কাছে বাকী ৫০ ভাগ। ছেলে মেয়েদের ভিতর প্রতি ৪ জনের ১ জনের সম্পূর্ণ, দুই জন আংশিক ভাবে, ১ জনের ২৫ ভাগ মিলে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের মধ্যে আদৌ মিল নাও থাকতে পারে। যদি সম্পূর্ণ মিল থাকে, তাকে বলে পরিপূর্ণ মিল বা Full home match আর যদি আংশিক বা ৫০ ভাগ মিলে থাকে তাকে বলে অর্ধেক মিল বা One haplotype মিল আর একেবারে মিল না থাকলে বলে Mismatch.

টিস্যু এন্টিজেন শ্বেতকনিকার লিমফোসাইটে এ পাওয়া যায়। এটা দুরকমের হয়ে থকে। এদের ১ ভাগ হচ্ছে T cell আরেক ভাগ B cell। T ও B সেল শরীরের এন্টিবডিকে নিয়ন্ত্রিত করে বা ইমিউন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত করে। টিস্যু টাইপিং এর যে এন্টিজেন এর কথা বলা হল, এরা লিমফোসাইটের এর T ও B cell এ থাকে। DR এন্টিজেন যেটা টিস্যু টাইপিং

banglainternet.com

এর নূতন সংযোজন এরা B cell এ থাকে এবং এরাও জিন (Gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। DR এন্টিজেন আবিস্কারের ফলে কিডনী সংযোজন এর সাফল্য বেড়ে গেছে। কেননা দাতা (Donar) এবং গ্রহিতা (Recepient) এর মধ্যে এই এন্টিজেন এ মিল পরিলক্ষিত হলে কিডনী সংযোজনের সফলতা আরও বেড়ে যায়।

দাতার বৈশিষ্ট্য বা কারা কিডনী দান করতে পারে (Donar characteristics)

কিডনী সাধারণতঃ নিকটতম আত্মীয় থেকে নেয়া হয়ে থাকে। এদের বয়স ২১ থেকে ৬০ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। স্বেচ্ছায় এরা কিডনী দান করতে রাজী হতে হবে এবং সুস্থ শরীরের অধিকারী হতে হবে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনীতে পাথর বা অন্য যে কোন কিডনী রোগ হওয়া চলবেনা। কিডনী ছাড়া অন্য অন্য রোগ যেমন পিত্তথলিতে পাথর, পেপটিক আলসার অথবা ব্রেন টিউমার হলে কিডনী দিতে বাধা নেই। তবে Systemic disease যেমন ভাবে S L E, পলি আর্টিরাইটিস নডোসা, সারকয়ডোসিস হলে চলবেনা। কিডনী দেবার পুর্বে তার নিম্নলিখিত পরীক্ষা করতে হয়। যেমন ঃ-

(১) প্রস্রাবের সাধারণ পরীক্ষা।

(২) প্রস্রাবের কালচার।

(৩) ২৪ ঘন্টার প্রস্রাবে এলবুমিন নির্গত হয় কি না?

(৪) রক্তের ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন এবং ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স।

(৫) রক্তের ক্যালসিয়াম, ফসফেট, ইউরিক এসিড।

(৬) লিভার ফাংশন টেষ্ট।

(৭) Hbs Ag.

(৮) এক্সরে চেষ্ট এবং ই, সি, জি।

(৯) আই, ভি, পি।

(১০) রেনাল এনজিওগ্রাম।

উপরোক্ত পরীক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে স্বাভাবিক থাকলে কিডনী সংযোজন করা হয়ে থাকে। একটা কিডনী দান করার পর অন্য কিডনীর উপর তেমন কোন চাপ পরিলক্ষিত হয় না। ১টা কিডনী নিয়ে সুস্থ্য জীবন যাপন করা সম্ভব। কিডনী দান করার পর পাঁচ বছরে শতকরা ৯৯.৯ ভাগ কিডনীর

কার্য্যকরীতা অক্ষুন্ন থাকে অর্থাৎ কোন বিরুপ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

Receipient Workup বা কিডনী সংযোজন গ্রহন কারীর বৈশিষ্ট ঃ

দু'টো কিডনী সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হবার পরই কিডনী সংযোজনের চিন্তা করা হয়ে থাকে। কোন রোগীর ক্লিয়ারেন্স যদি ৫ এর কম হয়, তখন তার পক্ষে নিজস্ব কিডনী দিয়ে বাঁচার উপায় থাকেনা। এই সময়ে তাকে ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স ১০ মিঃ লিঃ এর নীচে এলে রোগীর হাতে ফিসচুলা তৈরী করা হয়। ভবিষ্যতে এই ফিসচুলা দ্বারা ডায়ালাইসিস করা হয়ে থাকে।

নিম্নলিখিত পরীক্ষা রোগীর করা হয়ে থাকে ঃ-

(১) প্রস্রাবের সাধারণ পরীক্ষা। প্রস্রাবের কালচার।

(২) ২৪ ঘন্টার প্রস্রাবে এলবুমিন এর পরিমান এবং ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স।

(৩) রক্তের ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন।

(৪) HbsAg.

(৫) রক্তে শর্করা, কোলেষ্টেরল, ক্যালসিয়াম, ফসফেট, ইউরিক এসিড।

(৬) লিভার ফাংশন টেষ্ট।

(৭) বুকের এক্স-রে এবং ই সি জি।

(৮) হাই ডোজ I V U (যদি দরকার হয়)।

(৯) মিকচুরেটিং সিসটোইউরেথ্রোগ্রাম।

(১০) কিডনী আলট্রাসাউণ্ড।

রোগীর প্রাথমিক রোগ নির্ণয় করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। প্রাথমিক রোগ সাধারণত গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, পাইলোনেফ্রাইটিস, পলিসিসটিক কিডনী, হাইপারটেনশান বা ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। রোগীর পুণঃ পুণঃ প্রস্রাবে ইনফেকশান হলে, অথবা I V U X-Ray Reflux দেখা গেলে ট্রান্সপ্লান্ট এর পরে জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। রোগীর অবশ্যই প্রস্রাবের রাস্তা পরিস্কার থাকতে হবে এবং মূত্রথলীর কার্য্যকরীতা স্বাভাবিক হতে হবে। ষ্ট্রিকচার ইউরেথ্রা বা ব্লাডার নেক অবষ্ট্রাকশান থাকলে প্রাথমিক পর্যায়ে এর চিকিৎসা

banglainternet.com

করাতে হবে। রোগীর শরীরের কোথাও ইনফেকটিভ ফোকাস থাকা বাঞ্চনীয় নয়। ফুসফুসে যক্ষা থাকলে তার পূর্ণ চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। অনেক সময় প্রাথমিক ভাবে রোগীর যদি মেজেনজিও ক্যাপিলারী ডেপ্স ডিপোজিট নেফ্রাইটিস থাকে তবে তা সংযোজিত কিডনীতে ও হতে পারে। যে কোন বয়সে কিডনী সংযোজন করা যেতে পারে তবে সাধারণতঃ ১৫ থেকে ৫৫ বছরই বেশী করা হয়।

কিডনী দাতা ও গ্রহিতা কিভাবে নির্ণয় করা হয় (Selection of Donar & Recepient)

প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনী দাতা ও গ্রহিতার রক্তের গ্রুপ ও টিস্যু ম্যাচিং করা হয়ে থাকে। রক্তের গ্রুপ মিল হবার পর H L A ম্যাচ করা হয়। এর পর দু'জনার রক্তের বিশেষ ক্রশম্যাচ করা হয়। এই ক্রশ ম্যাচকে বলে সাইটোটক্সিক এন্টিবডি ম্যাচ। এই এন্টিবডি ২৫ ভাগের উপর হলে কিডনী সংযোজন করা হয় না। কেননা সেই ক্ষেত্রে কিডনী Rejection হয়।

Cadaveric কিডনী সংযোজন কি ভাবে করা হয় ঃ –

উন্নত বিশ্বে শতকরা ৯০ ভাগ কিডনী Cadaveric সংযোজন এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। যান্ত্রিক দুর্ঘটনায় অথবা Stroke জনিত কারনে যারা মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছে, তাদেরকে বাঁচানোর জন্য ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এরা জীবিত কালে তাদের কিডনী দান করে থাকেন এবং কিডনী ডোনার কার্ড সংগে রাখেন। দুজন Neurologist এদেরকে পরীক্ষা করে যখন মত প্রকাশ করেন যে, এদের বাঁচার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন এদের কিডনী সংগ্রহ করা হয়। পূর্বে কিডনী ডোনার এর রক্তের গ্রুপ ও টিস্যু টাইপ করে কম্পুটার এর মাধ্যমে কিডনী রোগীর সংগে মিল বের করা হয়। যে সমস্ত রোগীর সংগে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, এদের ভেতর দুজনাকে বাছাই করে কিডনী বরফের ভেতরে ঢুকিয়ে ১০ ঘন্টার ভেতর পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। এই ধরনের কিডনী সংযোজনকে বলে Cadaveric কিডনী সংযোজন।

কিডনী সংযোজনের প্রস্তুতি (Live related)

কিডনী গ্রহিতা এবং কিডনী দাতার সম্ভাব্য সব রকম পরীক্ষার পর অপারেশনের দিন ধার্য্য করা হয়। ১ সপ্তাহ পূর্বে কিডনী গ্রহিতা ও দাতার Nasal, Aural Swab, প্রস্রাব কালচার এবং X-Ray chest, E C G পরীক্ষা করা হয়। যে সমস্ত ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ডবয়, সুইপার রোগীর পরিচর্যায় থাকবেন

তাদেরও Swab test করা হয়। শরীরে কোন ইনফেকটিভ ফোকাস থাকলে তাকে রোগীর সংস্পর্শে আসতে দেয়া হয় না।

নিম্নলিখিত ঔষধ রাগীকে দেয়া হয়ে থাকে (Live Kidney) সংযোজন।

(১) Cyclosporin – ১০ মিঃ গ্রাম / প্রতিকেজি শরীরের ওজন মুখে ২ দিন (অপারেশনের ২ দিন পূর্বে থেকে)।
(২) Tab. Azathioprin – ১ মিঃ গ্রাম / প্রতিকেজি বডিওয়েট অপারেশনের ১ দিন পূর্বে।
(৩) Inj. Filucloxacillin 2 gm I. V. অপারেশনের দিন সকলে।
(৪) Inj. Ampicillin 2 gm IV সকালে।
(৫) Inj. জেন্টামাইশিন ৮০ মিঃ গ্রাম I V সকালে।
(৬) Inj. Methyl Prednisolone ৫০০ মিঃ গ্রাম I V অপারেশানের চলাকালীন সময় যখন শিরা বাঁধা হয়।
(৭) Inj. Mannitol ৫০ – ২০০ মিঃ লিঃ বা ৮০ মিঃ গ্রাম ফ্রুসেমাইড, শিরা বাঁধা শেষ হবার পর।

অপারেশনের পর রোগীর প্রস্রাব সাধারণত শুরু হয়। প্রস্রাব পরিমানে খুব বেশী হতে পারে। প্রতি ঘন্টার ১০০ সি সি থেকে ৫০০ সি.সি বা তারও বেশী। এই সময়ে রোগীকে জীবাণুমুক্ত ICU তে নিয়ে আসা হয়। এবং Inj. Normal Saline, Dextrose aqua, Na^+ , K^+, HCo_3 মিশ্রিত স্যালাইন (Hartman Solution) দেয়া হয়। প্রস্রাব পরিমাণে ঘন্টায় ৪০০ সি.সি র উপর হলে শরীরের সোডিয়াম ও পটাশিয়াম কমে যেতে থাকে। সুতরাং যত প্রস্রাব বেশী হবে তত বেশী সোডিয়াম, পটাশিয়াম , বাইকারবোনেট মিশ্রিত স্যালাইন লাগবে। শরীরে যাতে পানির পরিমাণ কম না হয় সে জন্য প্রস্রাবের পরিমাণ অনুযায়ী জলীয় পদার্থ দিয়ে পূরণ করতে হয়। ঠিক তেমনি প্রস্রাব কমে গেলে কম পরিমানে জলীয়পদার্থ দিতে হয় যাতে শরীর ফুলে না যায়। যেমন প্রস্রাব একে বারে না হলে, ঘন্টায় ১০০০ সি,সি জলীয় পদার্থ দেয়া যায়। প্রথম ১৪ দিন রোগীকে ICU তে নিরাপদ এ রাখাই ভাল। রোগীর Pulse, Blood Pressure, Urine Output এবং IV Fluid ঘন্টায় পুংখানুপুংখ ভাবে দেখা হয়। প্রতি ২–৩ ঘন্টা বাবদ Drainage bag এবং temperature নেয়া হয়। প্রতিদিন রক্তের TC,DC, এবং Urea, Creatinine, electrolyte দেখে ঔষধের পরিবর্তন করা হয়। প্রতিদিন রোগীর শারীরিক পরিবর্তন যেমন জ্বর, কাশি, বমি বমি ভাব, সংযোজিত কিডনীতে ব্যাথা ওজন বেশী হওয়া বা কমে যাওয়া লক্ষ্য করা হয়। ২–৩ দিন পর রোগীকে মুখে খাবার দেয়া যেতে পারে। প্রথমে পানিয় বা Soup জাতীয় খাবার এবং পরবর্তীতে পরজ (Soft) জাতীয় খাবার। ৮ – ১০দিন পর পর সেমাই, ১২ –১৪ দিন পর Catheter

banglainternet.com

ও Drainge bag সরে দেয়া হয়। Drainage tube এ জলিয় পদার্থ যখন ঘন্টায় ১০ সিসির নিম্নে থাকে, তখন বের করাই নিরাপদ।

প্রথম ১ মাস Cyclosporin সাধারণত ৯ -- ১০ মিলিগ্রাম / কেজি body weight হিসাবে দেয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ঔষধের মাত্রা কমিয়ে প্রথম তিনমাস ৬-৭ মিলিগ্রাম/প্রতিকেজি দেয়া হয়।

Azathioprine প্রথম তিন মাস ১ মিলিগ্রাম /প্রতি কেজি দেয়া হয় এবং ব্লাড এর TC, DC, দেখে মাত্রা ঠিক করা হয়। রক্তে শ্বেত কণিকা ৫০০০ এর নীচে নেমে এলে Azathioprine সাময়িক ভাবে কমিয়ে দেয়া হয়।

Tab. Prednisolone ২ – ৩ দিন পর মুখে দেয়া হয়। সাধারণত ঃ ৬০ -৮০ মিলিগ্রাম প্রথম ৩ -- ৪ দিন , তারপর ১০ -- ২০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন বাদে কমিয়ে ১৪ দিন, ২০ মিলিগ্রাম হিসাবে প্রথম তিন মাস দেয়া হয়।

তিন মাস পর প্রতি মাসে ২.৫ মিলিগ্রাম কমিয়ে ৬ মাসে ১০ মিলিগ্রাম হিসাবে চালিয়ে যেতে বলা হয়। Cyclosporin কয়েকমাস পরে Azathioprine এ কনভার্ট করা যায় অথবা Cyclosporin আরও কমিয়ে ৬ মাস থেকে ২ বছর চালানোও যায় এবং পরে Conversion করা যায়। Azathioprine প্রথম থেকে বাদ দিয়ে শুধু Cyclosporine সারা জীবন ধরে নেওয়া যেতে পারে।এটা নির্ভর করে রোগীর Economic Solvency এর উপর। Cadaveric Kidney সংযোজন ঐ একই নিয়মে করা হয় থাকে এবং একই ধরণের ঔষধ দেয়া হয়। Cyclosporin ও অন্যান ঔষধ অপারেশন এর দিন থেকে শুরু করা হয়ে থাকে।

সংযোজিত কিডনী কাজ নাও শুরু করতে পারে। দুটো কারণে সংযোজিত কিডনী কাজ নাও করতে পারে (১) কিডনী Rejection (২) Acute Necrosis Rejection । Rejection সাধারণতঃ ৪ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

(১) Hyperacute Rejection :-

কিডনী সংযোজনের পর অপারেশন চলাকালীন সময় যদি কিডনী এর দ্রুত রং পরিবর্তন হয় এবং তা নিলভ বর্ণ ধারণ করে তার ধারণা করা হয় যে, ঐ কিডনী শরীর গ্রহন করছে না এবং কিডনী কোন ধরণের কাজ সম্পাদন করতে অপারগ। এই কিডনীকে বলে Hyperacute rejection। সাধারণতঃ কিডনী গ্রহীতার কোন Preformed antibody থাকার দরুন ঐ ধরণের rjection হয়।

(২) Accelerated rejection ঃ–

যদি কিডনী সংযোজনের ২৪ ঘন্টা পরথেকে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত কোন কাজ

না করে, তাকে অনেক সময় accelerated rejection হিসাবেও গণ্য করা হয়।এই পর্যায়ে কিডনীতে acute tubular necrosis ও হতে পারে। acute tubular rejection যেমন ১–২ সপ্তাহে ভাল হতে পারে এবং কিডনী আবার তার কার্যকারীতা ফিরে পেতে পারে। কিন্তু accelerated rejection এ ফিরে আসার খুবই ক্ষীন আশা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে Prednisolone বড় ধরনের dose দিয়ে accelerated rejection check দেয়া হয়ে থাকে। Accelerated rejection হলে রোগীর জ্বর,শ্বেত কনিকার আধিক্য বা কমে যাওয়া, সংস্থাপিত কিডনীতে ব্যাথা হতে পারে। Renal Scan করলে দেখা যায় যে, কিডনী কোন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না।

Acute Rejection ঃ

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কিডনী সংস্থাপনের পর ১ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত Acute rejection হয়ে থাকে। Acute Rejection বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঔষধে নিবারণ করা সম্ভব। এটা হলে রোগীর প্রস্রাবের পরিমান হঠাৎ করেই কমে যায়। রোগীর শরীরের ওজন বেড়ে যায় (০.৫ কেজি থেকে ১ কেজি পর্যন্ত) রক্তের ইউরিয়া প্রতিদিন ৪ মিঃ গ্রাঃ / ডি,এল এবং Creatinine ০.২ মিঃ গ্রাম / ডি,এল বেড়ে যায়। এছাড়া জ্বর, সংস্থাপিত কিডনীতে ব্যাথা এবং প্রস্রাবে এলবুমিন যেতে পারে। একুইট রিজেকশন হবার সঙ্গে সঙ্গে Solumedrol ৫০০ মিঃ গ্রাম I V প্রতিদিন ১ বার করে এক নাগাড়ে তিন দিন দিতে হয়। Inj, Solumedrol ধীরে ধীরে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে দেবার নিয়ম ৯০% ক্ষেত্রে acute rejection সাময়িক ভাবে হলেও বন্ধ হয়ে যায় , Inj. Solumedrol ছাড়াও Acute Rejection oral prednisolone দিয়ে চিকিৎসা চালানও সম্ভব। এ ক্ষেত্রে প্রথম তিনদিন ২০০ মিলিগ্রাম করে দেয়ার পর, ৪র্থ দিনে ৬০ মিলিগ্রাম করে প্রতিদিন কমিয়ে শুধু ৬০ মিলিগ্রাম নামিয়ে আনা হয়। এবং শুধু তা দু সপ্তাহে ২০-৩০ মিলিগ্রাম হিসাবে দেয়া হয়। সাধারণতঃ কিন্তু সংযোজন শুরু হবার ৫ দিন থেকে ৩ মাসের ভেতর acute rejection হয়ে থাকে। acute rejection, acute tubular recrosis মনে করে ভুল হতে পারে। সুতরাং Acute tubular necrosis কি না তা ভাল ভাবে যাচাই করে দেখা প্রয়োজন।

Chronic rejection :

সাধারণতঃ ৩ মাস পরে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে কিডনীর কার্যকারীতা কমে যায় । প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীর উচ্চরক্তচাপ দেখা যায় এবং ওজন বাড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে প্রস্রাবে albumin নির্গত হয়।

banglainternet.com

৪র্থ অধ্যায়

৩য় পরিচ্ছেদ

কিডনী সংযোজন সার্জিকেল দিক
(SURGICAL ASPECT OF KIDNEY TRANSPLANTATION)

গোলাম রসুল মেজর জেনারেল কে, এম ,সিরাজ জিন্নাত
এম, এ ওয়াহাব সাজ্জাদুর রহমান
এস, এ, এস, গোলাম কিবরিয়া এম, এ সালাম
এ, কে, এম আনোয়ারুল ইসলাম

যে কোন কারণে কিডনী সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়লে কিডনী সংযোজনই একমাত্র আধুনিক সর্বোত্তম ব্যবস্থা। বিভিন্ন কারণে মাত্র কিছুদিন পূর্বেও কিডনী সংযোজন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং সহজলভ্য ছিল না। আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর , অতিথি অঙ্গের প্রতি শরীরের সহনশীলতার বিষয়ে আরো অভিজ্ঞতা, সাইক্লোসপরিনের ব্যবহার এবং কিডনী দাতার রক্ত, গ্রহীতার দেহে সংযোজনের পূর্বে পরিচালনের (Donar Specific transfusion), ব্যবস্থা কিডনী সংযোজন প্রক্রিয়াকে এক নতুন জগতে নিয়ে এসেছে।

তবুও অনেক সমস্যাই থেকে যাচ্ছে। যথেষ্ট মাত্রায় ইমিউনোসাপ্রেসিভ ঔষধ পত্র ব্যবহার করায় ইউরেমিয়ার জন্য শরীরে রোগ প্রতিরোধ শক্তি অতিমাত্রায় কমে যায় এবং ফলশ্রুতিতে এরা যে কোন সময় বিভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এই সমস্ত রোগীদের ঘা জোড়া লাগবার প্রবণতা অতি ধীরে। এই সমস্ত ব্যাপার সংযোজন শল্যবিদদের অতি সাবধানী করেছে। সংক্রমনের প্রতি বিশেষ নজর রাখা সম্পূর্ণ জীবাণু মুক্ত পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার কিডনী সংযোজনকে ব্যয়বহুল করে তুলেছে বটে, কিন্তু ঝুঁকির পরিমাণ অনেক কমেছে।

কিডনী সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেলে তাকে প্রাথমিক ভাবে সংযোজনের

জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। কিন্তু এই সংযোজন কার্যক্রমের ১০ বৎসর হতে ৫৫ বৎসর রোগীদের বাছাই করা হয়। অপ্রতিরোধ্য ক্যানসার জাতীয় অসুখ, হৃদপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন জাতীয় গুরুতর সমস্যা, সিষ্টেমিক লুপাস এরিথোমেটোসাস, পেরি আরটিরাইটিস নডোসা, অতিমাত্রায় জটিল ডায়াবেটিস মেলাইটাস প্রভৃতি অসুখ থাকলে তার জন্য কিডনী সংযোজন অস্ত্রোপচার অর্থহীন। তাদের জন্য ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা করা হয়।

বিভিন্ন কারণে দুটি কিডনী সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। তার মধ্যে হিউম্যান ট্রান্সপ্লান্ট রেজিষ্ট্রির ত্রয়োদশ রিপোর্ট অনুযায়ী ক্রনিক গ্লোমেরিউলো নেফ্রাইটিস (৫৪%), ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস (১২%), পলিসিষ্টিক ডিজিজ (৫%) এবং নেফরোস্কেলেরোসিস (৬%) ও অন্যান্য (২৩%)।

রোগীর নিজস্ব কিডনী দুটি যথাস্থানে রেখেই প্রায় ৯০% কিডনী সংযোজন অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। যদি প্রচণ্ড রক্তচাপ যা ঔষধ দিয়ে বা ডায়ালাইসিস করে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না, খারাপ ধরণের পাইলোনেফ্রাইটিস, রিফ্লাক্স জনিত অসুবিধা অথবা আক্রান্ত কিডনীদ্বয় হতে যদি প্রায়ই রক্তক্ষরণ হতে থাকে তবে কিডনী সংযোজনের পূর্বে তার নিজস্ব কিডনী দুটি অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হবে।

জীবিত বা মৃত উভয় দাতার নিকট হতেই কিডনী সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে পদ্ধতিগত জটিলতা এবং নানাবিধ কারণে মৃতদেহের কিডনী সংযোজনের জন্য আমাদের দেশে ব্যবহার এখনও সম্ভব হয় নি। এবং সে কারণেই মা, বাবা, ভাই,বোন জাতীয় রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়ের যদি এই এল এ (H L A) এক রকম বা প্রায় এক ধরণের হয় এবং তাদের মিক্সড লিম্ফোসাইড কালচারে (M L C) যদি সহনশীলতা প্রকাশ পায় তার কিডনী সংস্থাপন করার জন্য নেওয়া যেতে পারে।

কিডনী দাতার কিডনী সংগ্রহ করার পর অস্ত্রপচারের প্রস্তুতি সাধারণ নেফ্রেকটমির মতই নেয়া হয়। দাতার কিডনী পূর্ণ মাত্রায় সচলরাখতে অজ্ঞান করার পর তাকে ১০০০ সিসি ডেক্সট্রোজ সেলাইন দেয়া হয়। এবং কিডনী বিচ্ছিন্ন করবার আগে ম্যানিটল ১০০ সিসি দেওয়া হয়। দাতার অস্ত্রপচারের এক পর্যায়ে যখন কিডনীকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ততক্ষনে গ্রহীতার উপর অস্ত্রপচার কারীদল কিডনী সংস্থাপন করবার জন্য প্রস্তুত। একই সময়ে পারফিউশনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া শেষ। এই সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড এক সঙ্গে তাল মিলিয়ে করতে হবে।

banglainternet.com

দাতার কিডনী বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে পারফিউশন টীমের কাজ শুরু হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন কিডনী পূর্ব হতেই সংরক্ষিত একটি পাত্রে তরলীকৃত বরফের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।এবং পরক্ষনই কিডনীর আটারী দিয়ে বেগে বরফ শীতল ইলোকট্রোলাইট সঞ্চালন করা হয় যতক্ষন না রেনাল ভেইন দিয়ে পরিস্কার , সলিউশন বেরিয়ে আসে।এই পদ্ধতিকে পারফিউশন বলে। এই অবস্থায় কিডনীকে গ্রহীতার শল্যবিদগনের নিকট হস্তান্তর করা হয় যারা আগে হতেই অতিথি অংগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

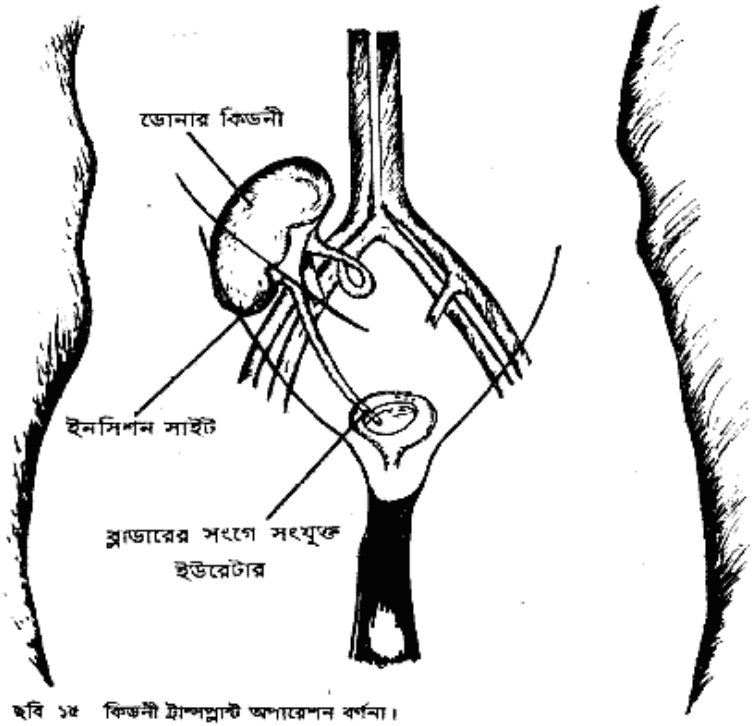

ছবি ১৫ কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন বর্ণনা।

সাধারণতঃ গ্রহীতার তলপেটের ডান দিকে কিডনী প্রতিস্থাপনের জন্য একটি জায়গা তৈয়ার করা হয়। ইন্টারনাল আইলিয়াক আটারীর সাথে রেনাল আর্টারীর মুখোমুখী সংযোগ সাধন করা হয়। এক্ষেত্রে ৬/০ সূতা ব্যবহার করা হয়। রেনাল ভেইন কমন আইলিয়াক ভেইনের সাথে জুড়ে দেয়া হয়। আর্টারী এবং ভেইনের সংযোগ অবশ্যই ৬০ মিনিটের মধ্যে

সম্পন্ন হতে হবে। ইউরেটারের শেষপ্রান্ত মূত্রথলির সাথে এমন ভাব জুড়ে দেওয়া হয় যাতে কোন অবস্থাতেই মূত্রথলির প্রস্রাব কিডনীর মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে (Anti reflux mechanism) । এর পর রোগীকে বিশেষ শশ্রুষা কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ দলের চিকিৎসাধীন থাকেন। কিডনী সংযোজন অস্ত্রপচার এত ব্যাপক এবংজটিল একটি পদ্ধতি যা জটীলতামুক্ত থাকতে পারেনা। তবে অতিমাত্রায় সাবধান থাকলে বহু জটীলতা এড়িয়ে চলা সম্ভব ।

তাৎক্ষনিক জটিলতা হিসাবে আটারী বা ভেইনসংযোগ সঠিক ভাবে না হওয়া অথবা সংযোগ হতে রক্তপাত হওয়ার দরুণ প্রচুর টিসুরস নিঃসরন ইত্যাদি।

পরবর্তীতে আটারীর সংযোগস্থলের সংকীর্ণতা, সংক্রমন, অতিথি অঙ্গের প্রতিশরীরের অসহনশীলতা (Graft rejection) ই প্রধান যা কিনা আগের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

banglainternet.com

৪র্থ অধ্যায়

৪র্থ পরিচ্ছেদ

কিডনী সংযোজন ও এনেসথেশিয়া
(KIDNEY TRANSPLANTATION AND ANAESTHSIA)

কাজী মেসবাহউদ্দিন ইকবাল
মোঃ খলিলুর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

সার্থক বৃক্ক সংযোজনের জন্য যেমন চাই উপযুক্ত দাতা ও গ্রহীতার বাছাই, তেমনি প্রয়োজন সংযোজন কালের কর্মীদের দক্ষতা, একাগ্রতা, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার পুরোপুরি ব্যবহার। সংযোজনস্তোর কালটিও নিঃসন্দেহে বিপদ সংকুল এবং তা সংযোজনকারীদলের পূর্ণ সহযোগীতার আর একটি আদর্শ সময়। একথা মোটামুটি বোধগম্য যে এক দেহের কলা বা টিসু অন্য দেহে আদৌ গ্রহণ যোগ্য নয় এবং দেহের প্রতিরোধক ব্যবস্থা বা ইমিউন সিসটেমই এর জন্য দায়ী। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাতে প্রতিরোধ করার আয়োজন দিয়ে অন্যদেহের কলা সংযোজনের (এলোগ্রাফট) যাত্রা শুরু। এনাসাথেশিওলজিষ্ট বা অসাড়তত্ববিদগন এই সংযোজন প্রক্রিয়ায় অন্যতম অংশীদার, কারণ অকেজো বৃক্কের রোগীদের বেশ কিছু উপরি শারীরিক অসুস্থতার সম্মুখীন হতে হয়, যা অস্ত্রপোচারের প্রেক্ষিতে জীবন নাশের হুমকির কারণ হতে পারে। তাই তাদের দায়িত্ব থাকে, চিকিৎসার মাধ্যমে এই ঝুঁকিকে কমিয়ে আনা, রোগীকে অস্ত্রপোচার চলাকালীন যথাসম্ভব সুস্থরাখার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণকরা এবং সংযোজনস্তোর কালে রোগীর শুশ্রুষার সহযোগীতা করা।

রেণাল ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশণ ও তার প্রিপারেটরী অবস্থা নির্দেশ করেহয় রোগীর রেনাল ফাংশন একেবারেই নেই অথবা রেনাল ফাংশন এত কমে গিয়েছে যে স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রায় অসম্ভব। সেজন্য এনাসথেসিয়া দেওয়ার সময় যে সমস্ত ফ্যাকটর গুলি দেখতে হবে তা হলো

ক) গ্রহিতার উপরে এনাসথেসিয়ার সময় দেয় ঔষধের প্রতিক্রিয়া।

খ) ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনীর স্বাভাবিক কাজের উপর ঐ সমস্ত ঔধের প্রতিক্রিয়া।

গ) ঐ সমস্ত ঔষধ ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনী দিয়ে সঠিক ভাবে নির্গত হচ্ছে কি না তা দেখা।

উপযুক্ত হেমোডায়ালাইসিস করলে এ সমস্ত বিরুপ প্রতিক্রিয়া অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব।তবে হাইপারটেনশান ও এনিমিয়া থেকেই যায়। অনেক ঔষধ যেমন ষ্টেরয়েড, এন্টি হাইপারটেনসিভ এজেন্ট, এন্টিকোয়াগুলেন্ট, এন্টিবায়োটিক এবং ইমুউনোসাপ্রেসিভ । এ সমস্ত ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে। সে জন্য এ সমস্ত এজেন্ট ও ঔষধের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা এনাসথেশিয়ারে সময় খেয়াল রাখা উচিৎ।

১। এনিমিয়া

ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর রোগীদের এনিমিয়া একটি স্বীকৃত লক্ষন। এই এনিমিয়ার ধরণ নরমোক্রোমিক নরমোসাইটিক এবং এর কারণ বহুবিধ। তবে সাধারণত এটা ইরিথ্রোপয়েটিক হরমোন নির্গমনের ফেইলারের কারণে অথবা খুব অল্প হারে ইরিথ্রোপয়েটিন নির্গমনের কারণে হয়ে থাকে। অন্যান্য সেকেণ্ডারী ফ্যাকটরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হেমোডায়ালাইসিস, ইরিথ্রোসাইট এবং ফলিক এসিডের লস হেমোডায়ালাইসিস এর কারনে। এই এনিমিয়া কোনো সময়ে আইরন, ফোলেট বা ভিটামিন বি২ দিয়ে চিকিৎসা দিলেও কাজ হয় না, সেক্ষেত্রে হোল ব্লাড ট্রান্সফিউশন বা কনসেন্ট্রেটেড ইরিথ্রোসাইট ট্রানসফিউশন করলে সাময়িকভাবে রোগীর উপকার হতে পারে। নিয়মিত রক্ত সঞ্চালন করলে হেমোগ্লবিনের মান হয়তো একটু বাড়বে কিন্তু এর ইরিথ্রোপয়েটিনতৈরী কমে যাবে এবং যেহেতু রক্ত সঞ্চালনের পরে ইরিথ্রোসাইট ধ্বংসপ্রাপ্তির হার বেড়ে যায় এ জন্য শরীরে আয়রণ জমা হয়ে হেমোসিডেরোসিস বা সাইটোটক্সিক এন্টিবডি রেসপন্স হবে । উপরন্ত HbsAg স্ক্রিনিং না করলে হেপাটাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এ জন্য রক্তসঞ্চালন যত কম করা যায় তত ভালো। বেশি এনিমিয়ার কারণে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যায়, এবং রক্তের ভিসকোসিটি কমে যায় তবুও এর ফলে টিস্যু পারফিউসান ভালো হয়। এজন্য এ সমস্ত রুগীর এনাসথেসিয়ার প্রয়োজন হলে কম হেমোগ্লোবিন হলেও এদের গ্রহণ করা হয়।

banglainternet.com

২। এসিড বেস ইমব্যালান্স

কার্বনিক এসিড যদিও ফুসফুস দিয়ে নির্গত হয় তবে অন্যান্য মেটাবলিক এসিডিক পদার্থ কিডনী দিয়েনির্গত হয় অথবা শরীরের মধ্যে বাফার্ড অবস্থায় থাকে। রেনাল ফেইলিউরের রুগীদের বেশীর ভাগ কিছু না কিছু মেটাবলিক এসিডোসিস থাকে। আবার মারাত্মক ক্রনিক রেনাল ফেইলিউর রুগীরা পজিটিভ হাইড্রোজেন আয়ন ব্যালান্স এ থাকে। মেটাবলিক এসিডোসিস কার্ডিয়াক ফাংশন কমিয়ে দেওয়ার ফলে এসিডোসিস মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। যদি এসিডোসিসের সংগে ইউরেমিয়া থাকে তা হলে ক্যালশিয়াম নির্গমন বেড়ে যায় এবং সিরাম আয়োনাইজড ক্যালশিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে হার্ট ব্লক এবং হাইপারটেনশন দেখা দিতে পারে। যদিও হেমোডায়ালাইসিসের কারনে মেটাবলিক এসিডোসিস খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে না তথাপি এনাসথেসিয়ার সময় এটা মনে রাখা উচিত যে এসিডোসিস মারাত্মকভাবে বেড়ে যেতে পারে, হাইপোটেনশান, হাইপোকশিয়া বা রক্ত সঞ্চালনের কারনে।

৩। হাইপারকেলিমিয়া

রেনাল ফেইলিউর রোগীদের সিরাম পাটাশিয়ামের মান কোন কোন সময় বেড়ে যায় এবং এর সংগে ইসিজির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যদি কিডনী বহির্ভূত পাটাশিয়াম নির্গত হতে না পারে তা হলে সিরাম পাটাশিয়াম প্রতিদিন ০.৩ থেকে ৩ মিঃ লিঃ ইকুভ্যালেন্ট হিসাবে বাড়তে থাকবে। হাইপার ক্যালিমিয়ার বিষক্রিয়া শুধু মাত্র সিরাম পটাশিয়ামের মানের উপর নির্ভর করেনা বরং অন্যান্য আয়নের ঘনত্ব অর্থাৎ এসিডোসিস, হাইপোক্যালিমিয়া, হাইপোনেট্রিমিয়া ইত্যাদিও পটাশিয়ামের বিষক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এনাসথেসিয়ার সময় হঠাৎ করে পটাশিয়ামের মান বৃদ্ধিতে কার্ডিয়াক ডিসটারবেন্স করতে পারে যার উল্লেখযোগ্য কারণ গুলো হচ্ছে হাইপোকশিয়া, হাইপারকেপনিয়া, এবং উত্তেজনার কারনে ইপিনেফ্রিন নির্গত হলে। এজন্য অপারেশনের পূর্বে যদি সিরাম পটাশিয়ামের মান বেশী থাকে তাহলে প্রি অপারেটিভপেরিটোনিয়াল বা হেমোড়ায়ালাইসিস করতে হবে যতক্ষন পর্যন্ত না সিরাম পটাশিয়ামের মান ৫ মিলিঃ ইকুইভ্যালেন্টএর নীচে না নামে। ততক্ষন পর্যন্ত অপারেশন স্থগিত রাখতে হবে। যদি জরুরী হয় তাহলে ক্যাটায়ন ড্রিপ এক্সচেঞ্জ রেজিন বা গ্লুকোজ ইনসুলিন সহযোগে দিয়ে পটাসিয়ামের মান কমাতে হবে।

৪। হাইপার ম্যাগনেশিমিয়া ঃ

রেনাল ইনসাফিসিয়েনসি তে সিরাম ম্যাগনেশিয়ামের মান কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। ম্যাগনেশিয়াম আয়ন মোটরনার্ভ এনডিংয়ে এসিটাইল কোলিন নিঃসরণ কমিয়ে দেয়। ম্যাগনেশিয়াম ইনটকসিকেশন এর ফলে নিউরোভাসকুলার ব্লক হয়ে কিউরেয়ার এর বিষক্রিয়ার মত লক্ষন প্রকাশ পেতে পারে।

৫। আর্টারিয়াল হাইপারটেনশন ঃ

ক্রনিক রেনাল ফেইলিউর এর বেশির ভাগ রোগীর কিছু না কিছু হাইপারটেনশন থাকেএবং যখন এনাসথেসিয়া ও সার্জারীর প্রয়োজন হয় তখন এরা ঔষধের উপর নির্ভরশীল থাকে। যদি হাইপারটেনশান বহুদিন পর্যন্ত থাকে তাহলে এথেরোস্কেলেরোসিস এবং অন্যান্য হৃদরোগের জটিলতা হতে পারে। এসমস্ত কারনে এন্টি হাইপারটেনসিভ ঔষধ দিলেও এদের রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়না কারণ এদের প্লাজমায় অধিক পরিমানে রেনিন হরমোন থকে। এ সমস্ত রোগীর বাইলেটারাল নেফ্রেকটামী করলে উপকার পাওয়া যায়। এনাসথেসিয়ার সময় এই সমস্ত এন্টি হাইপারটেনসিভ ঔষধ এনাসথেটিক এজেন্ট যেমন – হেলোথেন বা টিউবো কিউরেরাইন সংগে প্রতিক্রিয়া করে হঠাৎ করে হাইপারটেনশান হতে পারে, যা খেয়াল রাখা উচিত।

এছাড়াও এ সমস্ত রোগীর ইনফেকশন হওয়ার প্রবনতা বেশী থাকে। বিশেষত ফুসফুসের ইনফেকশন। এজন্য ব্রড স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক এনাসথেসিয়ার পূর্বে ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও এণ্ডোট্রেকিয়াল টিউব, লেরিংগোস্কোপ, কেথেটার, ক্যানেকটার এবং ইন্ট্রাভেনাস ড্রীপ ইত্যাদি সম্পূর্ণ জীবানু মুক্ত অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে রোগী এবং ট্রান্সপ্লানটেশনকারী টিমের সদস্যদের সিরাম হেপাটাইসিস বিশেষতঃ বি হেপাটাইসিসের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকা বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশন নেওয়া উচিত।

রোগীর শারীরিক কারণ ছাড়াও আছে কিছু চেতনাহরক ঔষুধ নিয়ে জটিলতা, আছে পেশী অসাড়কারক ওষুধের সীমাবদ্ধতা এবং অস্ত্রপোচার চলাকালীন অন্য সব প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রয়োগের ব্যাপারে সাবধানতা। বস্তুতঃ এই ঔষুধগুলো রোগীর জন্যে প্রয়োজনীয়, প্রয়োগবিদকেও হতে হয় সুচারু পরিকল্পনা ও নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধ হয়। সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা

banglainternet.com

যেমন মনে রাখতে হবে তেমনি তার প্রতিকারের ব্যবস্থার আয়োজন আগে থেকে করে নিতে হবে।

রেনাল ট্রান্সপেন্টেশনের জন্য এনাসথেসিয়া ঃ

প্রি-অপারেটিভ প্রিপারেশন ঃ- রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন এর জন্য দু'ভাবে কিডনী সংগ্রহ করা হয়। প্রথমত মৃত ব্যক্তির কিডনী বা কেডাভার কিডনী, দ্বিতীয় লিভিংডোনার কিডনী। যদি মৃত ব্যক্তির কিডনী সংযোজনের প্রয়োজন হয় তা হলে মৃত ব্যক্তির থেকে কিডনী সংগ্রহের পর তা কিডনী পারফিউশন মেশিনে পরিফিউশন করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রহিতাকে কিডনী সংযোজন করতে হবে। এখানে পারফিউশনে কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সংগৃহীত কিডনীর ভেতরকার জমাট রক্ত সরিয়ে দেওয়ার জন্য হেপারিন মিশ্রিত পানি সঞ্চালন করার নামই পারফিউশান। আর যদি লিভিং ডোনার হয় তা হলে দাতা এবং গ্রহিতার অপারেশন একই সময় এবং প্রয়োজন বোধে পাশাপাশি অপারেশন রুমে করতে হবে। এই ক্ষেত্রে খুব সাবধানে প্রিঅপারেটিভ প্রিপারেশন করতে হবে। দাতা এবং গ্রহিতার অপারেশনের পূর্বে তাদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা (যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে)এবং প্রয়োজন বোধে জরুরী হেমোডায়ালাইসিস করতে হবে। যদি দাতা এবং গ্রহিতা অস্থির থাকে তা হলে কিছু সিডেটিভ দিতে হবে। এনাসথেসিয়ার রুমে দাতা এবং গ্রহিতার প্রবেশ করার পর ই সি জি'র ইলেকট্রোড লাগাতে হবে এবং ইন্ট্রাভেনাস ক্যানুলা ঢুকাতে হবে। আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেসার কাফ হাতে লাগাতে হবে এবং একটি ক্যাথেটার পাস করতে হবে।

এনাসথেসিয়া ইনডাকশান

রোগীকে ৫ থেকে ১০ মিনিট প্রি অক্সিজিনেশেন করতে হবে যাতে ডিনাইট্রোজিনেশান হয় এবং রোগীর হাইপোক্সিয়া না ডেভেলপ করে। এরপর এনেসথেসিয়া ইনডাকশান করতে হবে হয় ইনহেলেশান (সাইক্লোপ্রপেন) বা ইন্ট্রাভেনাস ইনডাকশান এজেন্ট দিয়ে (থাইওপেন্টম)। অপারেশান টেবিলে তার যথাযথ অবস্থান (পজিশান) নিশ্চিত করার পর এর ইন্ট্রাভেনাসলি সাক্সামেথোনিয়াম দিতে হবে এবং অপারেশন করতে হবে। ষ্টোমাক কনটেন্ট এর রিগারজিটেশান এবং এসপিরেশান বন্ধ করার জন্য ষ্টেরাইল এণ্ডোট্রাকিয়াল টিউব ঢুকাতে হবে। যখন রোগীর স্পনটেনিয়াস রেসপিরেশান ফিরে আসবে তখন একটি মাসল রিলাকজেন্ট যেমন পানকিউরেনিয়াম দিতে হবে।

এনাসথেসিয়ার মেইনটেনেন্স ঃ -

রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশনের সময় জেনারেল এ্যানাসথেসিয়া মেইনটেইন করার জন্য ৩০% অক্সিজেন ইন নাইট্রাক্সাইড, মডারেট হাইপারভেন্টিলেশানের জন্য IPPB, নিউরোমাসকুলার ব্লকিং এজেন্ট রিলাকজেশানের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। এর সংগে হ্যালোথেন (০.২৫ থেকে ০.৫%) বা ট্রাইক্লোরোইথাইলিন (০.৩ থেকে ০.৫%) দেওয়া হয়। এছাড়াও পেন্টাজোসিন বা ফেন্টানিন ইন্টারমিটেন্ট ডোজে যেতে দেওয়া যেতে পারে। রোগীর আর্টারিয়াল ব্লাড প্রেসার সার্বক্ষণিক ভাবে মনিটর করতে হবে এবং ইসিজির পরিবর্তন সমূহ লক্ষ্য করতে হবে। অপারেশান চলাকালীন সময় ব্লাড গ্যাস, সিরাম পটাসিয়াম, ব্লাড ও ফ্লুয়িড লস ইত্যাদি মাপার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এগুলো কারেকশনের ব্যবস্থা করতে হবে। অপারেশন শেষে মাসল রিলাকজেন্ট একশান রিভার্স করার জন্য নিওস্টিগমাইন দিতে হবে, রোগীর ভেন্টিলেশনের জন্য অক্সিজেন দিতে হবে এবং স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ও সচেতনতা ফিরে আসার সংগে সংগে সাকশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এক পার্শ্বে রুগীকে কাত করে টিউব গুলো বের করে ফেলতে হবে।

তাৎক্ষণিক পোষ্ট অপারেটিভ কেয়ার ঃ -

অক্সিজেন মাস্কএর সাহায্যে রুগী অক্সিজেন গ্রহন করবে এবং ই সি জি মনিটার করতে হবে। শরীরের তাপ, পালস, ব্লাড প্রেসার, সেন্ট্রাল ভেনাসপেশার, রেসপিরেটরী রেট এবং ইউরিন আউটপুট মনিটর করতে হবে। রক্ত নমুনা দিয়ে ব্লাড গ্যাস, বান, ই.লকট্রোলাইট, হেমগ্লোবিন এবং হেমাটোক্রিট নির্ণয়ের জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে সংগে সার্বক্ষণিক তৎপরতা ও নার্সিং কেয়ার অপরিহার্য্য।

স্পাইনাল ও ইপিডুরাল এনাসথেসিয়া ঃ-

যদিও এই পদ্ধতিতে এনাসথেসিয়া দিতে পারলে কিছু কিছু সুবিধা আছে তথাপি বহু ক্ষেত্রে রিজিওনাল এনাসথেসিয়া দেওয়ার পর জেনারেল এনাসথেসিয়া দেওয়ার প্রয়োজন পরে। এছাড়া ও দেখা গেছে যে ইপিডুরাল এবং স্পাইনাল এনাথেসিয়া দেওয়ার পরে রেনাল প্লাজমা ফ্লো এবং গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশান রেট কমে যায় উপরন্ত স্থায়ী নিউরোলাজিক্যাল ডামেজের কারনে এই পদ্ধতিতে এনাসথেসিয়া না দেওয়াই ভাল।

banglainternet.com

এনাসথেসিয়া ও গ্রাফট রিজেকশান ঃ –

হোমোগ্রাফট ট্রান্সপ্লান্টেশান যদিও বহু ফ্যাকটর এর উপর নির্ভরশীল তথাপি কোন এনাসথেটিক এজেন্ট এর কারনে ইমোউনোসাপ্রেশানের ফলে এই প্রতিক্রিয়া আরও স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে। আগে বলা হোত যে হ্যালোথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড রিজেকশান রেসপন্স এফেক্ট করতে পারে, লিমফোসাইট কাউন্ট এবং এন্টিবডি প্রডাকশান ডিপ্রেস করে। তবে গবেষণাগারে পরীক্ষাকরে দেখা গেছে যে এদের গ্রাফট রিজেকশানে কোন ইফেক্ট নেই যদিও ইউরিথেন গ্রাফট সারভাইভালকে প্রলংগ করতে পারে।

উপসংহার ঃ—

একথা অনস্বীকার্য্য যে সংযোজন একটি জটিল টীম ওয়ার্ক যেখানে নেফ্রোলজিষ্ট, সার্জন, এনাসথেটিস্ট ও অন্যান্য ষ্টাফদের সুচারু সমন্বয় প্রয়োজন। এর কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি হলে রোগী, দাতা বা গ্রহিতার জীবন নাশের সম্ভাবনা হতে পারে। সংযোজিত রোগীর মূত্র উৎপাদন এনাসথেসিস্টদের জন্য খুব স্বস্তির কারণ তখন বৃক্ক নির্ভর ঔষধ প্রয়োগে আর অসুবিধা থাকে না। অপ্তোপচার শেষে জাগিয়ে তুলে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের নিশ্চয়তা প্রদান করতে এনাসথেসিষ্টদের যথেষ্ট অবদান আছে। সংযোজন পরবর্তী রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তোলার ব্যাপারেও অন্যান্য দলের মত এনাসথেসিস্টদের অবদান অনস্বীকার্য্য। সুতরাং কিডনী সংযোজনকারিদের প্রত্যেক উপদল নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আগামীদিনের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সূচনা করেছেন।

৪র্থ অধ্যায়

৫ম পরিচ্ছেদ

কিডনী সংযোজনে ব্লাড ট্রান্সফিউশান, ভাল ও খারাপ দিক

(BLOOD TRANSFUSION IN KIDNEY TRANSPLANTAION)

মোশারফ হোসেন
জুবায়ের আহমেদ
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

১৯৬০ সনের দিকে কোন জরুরী অবস্থা ছাড়া কিডনী সংযোজীত রোগীদের রক্ত ট্রান্সফিউশান করা হোতনা কারণ ধারনা করা হোত এতে সার্কুলেটিং সাইটোটক্সিক এন্টিবডি বেড়ে যাবে, হেপাটাইটিস এর সংক্রামন হবে, এরিথ্রোপয়টিন সিনথেসিস কমে যাবে এবং আয়রণ ওভারলোড হবে। কিন্তু ১৯৭৪ সনে ওপেলজ ও টেরাসাকির গবেষণায় প্রমানিত হোল যে রক্ত সঞ্চালন এর কিডনী সংযোজনের উপর ভাল প্রভাব আছে। সম্ভাব্য কিডনী গ্রহণকারীর অনেক সময় রক্ত শূন্যতার জন্য, অপারেশনের পূর্বে বা পরে রক্ত বা রক্তের উপাদান পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন পড়ে। রক্তশূন্যতা দুর করা ছাড়াও প্রায়ই উন্নতির ক্ষেত্রে রক্ত পরিসঞ্চালনের এই প্রভাব কিডনী সংযোজনের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এরপর থেকেই কিডনী সংযোজনের পূর্বে রক্ত সঞ্চালন এর ব্যবহার শুরু হয়ে গেল। যদিও কিডনী সংযোজন রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণা হয়েছে তথাপি কি প্রকৃত কারনে এই ভাল প্রভাব তা এখনও পরিস্কার নয়। রক্ত সঞ্চালন এর থেকে তিন ধরনের ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রথমত ঃ

ভাল গ্রহিতা নির্বাচন। (Recepient Selection) যে সমস্ত রোগী ব্রড স্পেকট্রাম সাইটোটক্সিক এন্টিবডি তৈরী করে এদের বাদ দিয়ে গ্রহীতা নির্বাচন করলে কিডনী রিজেকশান কম হবে।

banglainternet.com

দ্বিতীয়ত ঃ

ভাল দাতা নির্বাচন (Donar Selection) দাতার টিস্যু টাইপিং এর স্পেসিফিসিটি গ্রহিতার রক্ত সঞ্চালনের পর তৈরী সাইটোটক্সিক এন্টিবডির স্পেশিফিসিটির সংগে মিলিয়ে দাতা নির্বাচন করলে কিডনীর রিজেকশান কম হবে।

তৃতীয়ত ঃ

পূর্বে রক্ত সঞ্চালিত গ্রহিতার ইমিউনোলজীক্যাল এনহ্যান্সমেন্ট এর ফলে গ্রহীতা ব্রডস্পেকট্রাম সাইটোটক্সিক এন্টিবডি তৈরী করবে না এবং কিডনী রিজেকশান কম হবে। সুতরাং সফল গ্রহীতার সঙ্গে দাতার HLA DR ম্যাচ হতে হবে। এর ফলে সাইটোটক্সিক এন্টিবডি হবেনা এবং সংযোজনের প্রথম ছয়মাসের মধ্যে কম রিজেকশান হবে।

সেনসিটাইজেশান ঃ

যে সমস্ত রোগী ভালমত এন্টিবডি তৈরী করতে সক্ষম তাদের সেনসিটাইজেশান প্রতি ইউনিট রক্ত সঞ্চালনে বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ায় কতবার রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন এর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন যে সমস্ত রোগীর ১১ বা এর বেশী সঞ্চালনের ইতিহাস আছে তাদের ৪০% এন্টিবডি ডেভেলপ করে। আবার এর মধ্যে ১৫% হাইটাইটার এন্টিবডি তৈরী করে। অন্য এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৩০ % রোগী ইমিউনাইজড হয় এবং এদের ৬% হাইপার ইমিউনাজড হয়।

রক্ত সঞ্চালনের পর এন্টিবডির মনিটারিং করা যায়। যদি ৫ম বার রক্ত সঞ্চালনের পূর্বে এন্টিবডি তৈরী হয় তাহলে ৫০% রোগীর ২ বৎসরের মাথায় রিজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার যাদের ৫ম বার রক্ত সঞ্চালনের পর এন্টিবডি তৈরি হয় তাদের এই সম্ভাবনা শতকরা ৭৩%। সুতরাং মাঝে মধ্যে এই এন্টিবডির মান নির্ণয় করে এন্টিবডি ষ্টেটাস (Status) মনিটর করতে হবে। কোন ধরনের সাইটোটক্সিক এন্টিবডি তৈরী হয় সেটা মুখ্য নয়। যেমন একদল গবেষক এর ধারণা বি কোল্ড এন্টিবডি হলে গ্রাফট রিজেকশান কম হবে আবার অন্য দলের ধারণা বি এবং টি ওয়ার্ম এন্টিবডি হলে তা হবেনা।

ইউরেমিয়ার প্রভাব ঃ

ইউরেমিয়া, রক্ত সঞ্চালনের ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্সিভ কে

পরিবর্তীত করতে পারে। বার বার রক্ত সঞ্চালন করলে নন ইউরেমিক রোগীর ব্রড স্পেপট্রাম এন্টিবডি তৈরী হবে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯ জন থ্যালাসেমিয়া রোগীর ১৮ জন (৯৫%) মাল্টি স্পেসিফিক এন্টিবডি তৈরী করেছে। এদের ৭০ ইউনিট রক্ত দেওয়া হয়েছিল বহু বছর ধরে। ঠিক এর বিপরীত অন্য এক গবেষণায় দেখা গেছে ইউরিমিয়া রোগীর মধ্যে ২০ – ৩০ % মত ব্রড স্পেকট্রাম এন্টি বডি তৈরী করেছিল।

রক্ত সঞ্চালনের ভাল দিকের কারণ ঃ

নির্বাচন ঃ ট্রান্সপ্লান্ট পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে সমস্ত রোগীর সাইটোটক্সিক এন্টিবডি তৈরীর প্রবনতা থাকে তাদের সংযোজন থেকে বাদ দেওয়া ভাল। সুতরাং এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এন্টিইডিওটাইপিক এন্টিবডি ঃ

এন্টিবডি মলিকুল এর ভেরিএবেল রিজিওনের এন্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্টস বা বি ও টি সেলের এন্টিজেন স্পেশিফিক রিসেপটারকে এন্টি ইডিওটাইপিক এন্টিবডিজ চিনতে পারে। ক্লাশ ১ এন্টিজেনের বিপরীতে তৈরী এন্টি ইডিওটাইপিক এন্টিবডিজ ইদুরের অর্গান এলোগ্রাফটকে এনহ্যান্স করতে পারে। একটি গবেষনায় দেখা গেছে যে কিডনী সংযোজিত রোগী যাদের পূর্বে রক্ত সঞ্চালনের ইতিহাস আছে তাদের থ্রিট্রান্সপ্লান্টেশান সিরাম MLR ইনহিবিট পারে। এর অর্থ হোল দাতা ও গ্রহিতা HLA ইনকমপার্টিবিলিটি কমাতে পারে। রক্ত সঞ্চালিত রোগীর সিরামে উপস্থিত এন্টি Fab এন্টিবডি কে এনিট ইডিওটাইপিক এন্টিবডি মনে করা হয় এবং যার গ্রাফট সারভাইভাল এ প্রভাব আছে। অন্যান্য এন্টিবডি মেডিয়েটেড প্রক্রিয়া যেমন এন্টি Fc রিসেপটার এন্টিবডি তৈরী গ্রাফট এনহ্যানসমেন্টে সাহায্য করে যা শুধু মাত্র রক্ত সঞ্চালনের কারনেই হয়ে থাকে।

সাপ্রেসার সেল ঃ

রক্ত সঞ্চালনের প্রভাব কি স্পেসিফিক এর সদুত্তর এখনও মেলেনি। রক্ত সঞ্চালনের পরে স্পেসিফিক সেল একটিভিটির কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। কিছু গবেষক ইনভিট্রোতে সাপ্রেসার ইনডাকশান করে দেখিয়েছেন সেকেণ্ডারী ও টারশিয়ারি মিক্সাড লিমফোসাইট রিএকশন, যখন দেখা গেছে যে কোন একটা সল্যুবল ফ্যাকটর ডোনার রেসপণ্ডিং সেল এর উপর প্রতিক্রিয়া করে এই এনহ্যান্সমেন্ট করে। অন্য দু একজন অন্য এক গবেষনায় দেখিয়েছেন যে সাপ্রেশার সেল ফাংশান এনহ্যান্স হয় ২ ইউনিট

banglainternet.com

প্যাকড সেল ট্রান্সফিউজ করার পর। তবে এই প্রতিক্রিয়া এবং গ্রাফট সার্ভাইবাল এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা পরিস্কার নয়। অনেকের মতে রক্ত সঞ্চালন করারপর সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি কমে যায় এবং ট্রান্সফিউজড রোগীর মনোনিউক্লিয়ার সেল মিক্সড লিমফোসাইট রিএকশান সাপ্রেশ করে।

ঃ ডোনার স্পেশিফিউশান ঃ

সাম্প্রতিককালে জীবন্ত দাতাদের ঐচ্ছিক রক্তসঞ্চালন শুরু হয়েছে সতর্কতার সাথে। কোন কোন গবেষক রক্ত সঞ্চালনের পর কিডনী গ্রাফট এর রোগীদের সাভাইবাল এর মধ্যে কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য লক্ষ্য করেননি।তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বহু বার রক্ত সঞ্চালন কারী রোগীর কিডনী গ্রাফটের সার্ভাইবাল রেট ভাল এবং তাদের একুট রিজেকশান কম হয়ে থাকে। ডোনার স্পেশিফিক ট্রান্সফিউশনের ফলে শতকরা ৩১ ভাগ রোগীর টি বা বি ওয়ার্ম এন্টিবডি পাওয়া যায়।

ঃ রক্ত সঞ্চালনের সংখ্যা এবং কি সঞ্চালিত করা হোল ঃ

এখনও রক্ত সঞ্চালনের মাত্রা এবং ভাল দিক তৈরীর প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। যত মাত্রা রক্ত সঞ্চালিত হয়েছে (বিশেষত ২০ ইউনিট রক্ত সঞ্চালিত করার পর) তার সংগে গ্রাফষ্ট সাভাইবাল এর একটি ষ্টাটিস্টিকাল কোরিলেশান পাওয়া গেছে। অনেক গবেষক একবার রক্ত সঞ্চালন করেও এই ভাল প্রভাব পেয়েছেন। আবার অনেকে ২ থেকে ৫ ইউনিট রক্ত সঞ্চালন করার পর ভাল ফল পেয়েছেন কিন্ত এর উপর রক্ত সঞ্চালন করলে ভাল ফল পাননি।

ঃ শেষ কথা ঃ

রক্ত একটা জটীল প্রডাকট এবং এটা মনে রাখা দরকার যে লোহিত কনিকা একাই এলোগ্রাফট সাভাইবাল কে উন্নত করতে পারে মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইটিক রিএকশানকে ইমপেয়ার্ড করে বা DR রিলেটেড এন্টিজেন লোহিত কণিকার উপর অনুপস্থিত থাকলে। অনুচক্রিকার বেলায়ও একই কথা খাটে।

প্রিঅপারেটিভ রক্ত সঞ্চালন বিশেষতঃ মাল্টিপল ট্রান্সফিউশান কিডনী সংযোজনের জন্য উপকারী। আবার অন্য এক দল গবেষকের মতে ২-৫ ইউনিট রক্ত সঞ্চালন খুব উপকারী এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুব কম এবং এর

থেকে বেশী ইউনিট রক্ত সঞ্চালন করলে কোন ভাল ফল পাওয়া যাবেনা। কিডনী দাতা এবং গ্রহিতার HLA . A, B. C, DR ম্যাচিং হলে রক্ত সঞ্চালনের ভাল দিক আরও উন্নত করে। তবে ভাল দিকের বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সাইটোটক্সিক এন্টিবডি রেসপন্ডিং রোগীর মধ্যে পাওয়া গেলে এবং তাদের কিডনী সংযোজন থেকে বাদ দিলে সংযোজনের সাফল্য অনেক খানি বাড়বে।

ঃ রক্ত সঞ্চালন ও সাইটোমেগালোভাইরাস সংক্রমন ঃ

সাইটোমেগালো (CMV) ভাইরাস কিডনী সংযোজিত রোগীর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। উন্নতবিশ্বে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে এই CMV ইনফেকশনের হার ৪০z। কাজেই দাতা ও গ্রহিতার রক্ত CMV নেগেটিভ হলেই রক্ত পরিসঞ্চালন করা যাবে নতুবা নয়। এছাড়াও HbsAg, VDRL, এইউস এর স্ক্রিনিং টেষ্ট করে এ রোগ গুলো মুক্ত দাতাদের রক্ত সঞ্চালন করতে হবে।

banglainternet.com

৪র্থ অধ্যায়

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশনের আর্থ সামাজিক ও আইন গত দিক

(SOCIOECONOMIC AND LEGAL ASPECT OF KIDNEY TRANSPLANTATION)

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
মতিউর রহমান

ভুমিকা ঃ

উন্নত বিশ্বের লোকজন অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের সুফল ভোগ করার কারণে মৃত্যুর পর তাদের ভাইটাল অর্গান দান করার জন্য তৎপর। সেখানে অর্গান দান করার জন্য প্রচলিত আইন রয়েছে এবং অর্গান সংগ্রহকারী দলও রয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো ও আফ্রিকান দেশগুলোর সাংস্কৃতিক ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে ক্যাডেভারিক ডোনার প্রোগ্রাম বা মৃত ব্যাক্তির অর্গান সংগ্রহ এখনও ব্যাপক ভাবে প্রচলিও হয় নি। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। মাত্র কিছুদিন আগে ও বাংলাদেশে কিডনী ফেইলার রোগীরা কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে ভারতে বা অন্য দেশে যেত। বর্তমানে বাংলাদেশে সাফল্য জনক কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশান শুরু হওয়ার পর এই প্রবণতা কমে গেছে যদিও এই ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সুতরাং রোগীদের স্বার্থে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বোঝার কথা চিন্তা করে এই বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান অত্যন্ত জরুরী।

কিডনী দান করার প্রধান বাধা গুলো কি ?

সত্যিকার অর্থে কিডনী দান বা যে কোন অংগ দান করার প্রধান বাধা

অশিক্ষা, কুসংস্কার ও কৃষ্টি। এখানে ধর্মের কোন বিজ্ঞান সম্মত বাধা আছে বলে মনে হয় না। এশিয়া, আফ্রিকার অধিবাসীদের একটি আবেগপূর্ণ ঐতিহ্য হচ্ছে মৃত্যুর পর কোন অর্গান শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন না করা। এর প্রধান কারণ অশিক্ষা ও কুসংস্কার । জন সাধারণ যত বেশী শিক্ষিত হবে তত তারা এ ব্যাপারে কুসংস্কারমুক্ত হবে। এটা যদি জনগনকে বুঝানো যায় যেমৃত্যুর পর তার প্রদত্ত অর্গান দিয়ে অন্য এক রোগী তার প্রায় স্বাভাবিক জীবন ফিরে পারে তা হলে নিশ্চয় সে অর্গান ডোনেশনে দ্বিধাগ্রস্থ হবে না। এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হলো বাংলাদেশে ইতিমধ্যে মরনোত্তর চক্ষুদান কার্যক্রম যা সুষ্ঠুভাবে জন সাধারণের সহযোগিতায় এগিয়ে চলেছে।

উন্নত বিশ্বের সব খানেই আরেকটি বাধা হচ্ছে ডাক্তারদের ও অন্যান্ন সহযোগী ষ্টাফদের অনুৎসাহিতা। মৃত্যু পথযাত্রী বা মরনাপন্ন রোগীদের আত্মীয়স্বজনদের সথে যোগাযোগ, দান পত্রে রোগী বা তার নিকট আত্মীয়ের সই নেওয়া এ সমস্ত কাজকে তারা বাড়তি ঝামেলা বলে মনে করে। যদিও রোগীর ব্রেন ডেথ হয়ে গেছে তথাপি তার হৃদপিণ্ড কিছুক্ষন চালু থাকতে পারে সে অবস্থায় রোগীর আত্মীয়স্বজন অর্গান দান করতে প্রত্যাখান করে। সে জন্য ব্রেণ ডেথ সম্পর্কে আত্মীয় স্বজনদের পূর্ণ ধারণা দিলে এটা হয়তো অতিক্রান্ত করা সম্ভব হবে। ব্রেন ডেথ বলতে বৈজ্ঞানিক ভাবে যা বুঝায় তা নীচে বর্ণনা করা হল।মৃত্যু বলতে সাধারনত সেই ব্যক্তির মস্তিস্কের সকল প্রকার কাজের বন্ধ হয়ে যাওয়া কে বুঝায়। এটা নির্ণয় করার জন্য ২ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকা হয়। তারা রোগীকে পরীক্ষা করে নীচের ৭টি ক্রাইটেরিয়া পেলে রোগীর ব্রেন ডেথ হয়েছে বলে ঘোষনা করতে পারেন।

১) উভয় চোখের পিউপিল ফিক্সড এবং ডাইলেটেড ।

২) উভয় চোখের কর্নিয়াল রিফ্লেক্স অনুপস্থিত থাকলে।

৩) পেইনফুল ষ্টিমুলাই দেওয়ার পর কোন রিফ্লেক্স না পাওয়া গেলে।

৪) অকুলোসেফালিক রিফ্লেক্স (ডোলস রিফ্লেক্স) অনুপস্থিত থাকলে।

৫) গ্যাগ রিফ্লেক্স অনুপস্থিত থাকলে, গলায় দুইপাশ থেকে ষ্টিমুলাই দেওয়ার পরও।

৬) উভয় কানের মধ্যে বরফ পানি ৩ মিনিট ধরে দেওয়ার পর কোন অকুলোমুভমেন্ট না থাকলে।

banglainternet.com

৭) যখন $Paco_2$ ৫০ মিলিমিটার Hg মার্কারীর উপর কিন্তু তখন কোন সাসটেনিয়াস রেসপিরেশান হচ্ছে না।

দেশে অর্গান দানের প্রচলিত আইন না থাকলে সেটা আরও একটা প্রধান বাধা অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য। এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হলে ডাক্তার, আইনজীবী, পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ এবং জন সাধারণের সক্রিয় সহযোগীতা আবশ্যক। উপরন্তু রাষ্ট্রের পরিচালনা কারী যন্ত্রসমূহকেও পদক্ষেপ নিতে হবে। উন্নত বিশ্বে যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, আমাদের নিকটতম দেশ সিংগাপুর এ ব্যাপারে আইন আছে। যাকে বলা হয় হিউম্যান অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট এক্ট (HOTA)। এই আইনের আওতায় অর্গান দানকে আইনানুগ উৎসাহিত করা হয়েছে এবং অর্গান কেনা বেচা আইনানুযায়ী নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী যে কোন সুস্থমন ও দেহের অধিকারী ১৮ বৎসরের বা তদুর্দ্ধলোক তার শরীরের যে কোন অর্গান বা সব অর্গান, অর্গান ডোনেশান বা পোষ্টমর্টেম করার জন্য দিতে পারেন। আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সম্মতি নেয়া যেতে পারে।

কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট ঃ ডোনার বা অন্য অর্গান ডোনার প্রোগ্রাম ঃ কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা নীচে বর্ণনা করা হল।

ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করণ --- রোগী, রোগীর আত্মীয়, জনসাধারণ সবাইকে কিডনী রোগের ব্যাপকতা , এর জটিলতা, অর্থনৈতিক দিক ইত্যাদি বুঝিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশান কোন বাধা নেই বরং প্রয়োজনের সময় তারা ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য কিডনী পাবেন। এ ব্যাপারে ধর্ম, সমাজ সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণ মাধ্যম ইত্যাদি কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে। মাঝে মধ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, রেডিও, টেলিভিশন বক্তৃতার আয়োজন করতে হবে এবং এতে সব ধরণের পেশার প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

খ) প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন -- অর্গান ডোনেশন উৎসাহিত করা, এবং কেনা বেচা একেবারেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় আইন জারি করা । এ ব্যাপারে রাজনীতিবিদ, পার্লামেন্ট মেম্বার , আইনজীবি, চিকিৎসক, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় থেকে উদ্যোগ নিতে হবে।এই পদক্ষেপ অর্গান ডোনেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

গ) অর্গান ডোনেশনের যে বাধাগুলো র কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর যথাযথ বিধান করতে হবে।

ঘ) যারা অর্গান ডোনেশান করবেন তাদের পরিবারদের জন্য বিশেষ চিকিৎসার সুবিধা যেমন হাসপাতালে বিনা পয়সায় বা স্বল্প মুল্যে চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি নিশ্চয়তা করার ব্যবস্থা। প্রয়োজন বোধে প্রিমিয়ামদিয়ে স্বাস্থ্য বীমা পলিসির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বীমা কোম্পানী বহন করে। এতে রোগীর আত্মীয় স্বজনদের উৎকন্ঠা কম হবে এবং সরকারের দায়িত্ব কমে যাবে।

ঙ) চিকিৎসক ও অন্যান্য প্রশিক্ষন ঃ

যেহেতু অর্গান ডোনেশান কার্যক্রমে জনসাধারণ ,রোগী, আইনগত সমর্থন পেলেই সব শেষ হবে না বরং যদি চিকিৎসকদের ও তাদের সহযোগীদের অর্গান ডোনেশনের সব তাত্বিক দিক , কিভাবে অর্গান সংগ্রহ করতে হবে, সংরক্ষন করে পাঠাতে হবে এ ব্যাপারে আধুনিক, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা সব প্রচেষ্টাই অকেজো প্রমাণিত হবে।

চ) নন কমপ্লায়েন্স :

রোগী ও আত্মীয়দের অসহযোগীতা একটা অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ব্যপার সংযোজনের জন্য। অশিক্ষা , কুসংস্কার, অর্থনৈতিক চাপ, ভয় ভীতি ইত্যাদির কারনে এটা হয়ে থাকে। এজন্য এ ব্যাপারে রোগী, তার আত্মীয় স্বজনদের বুঝিয়ে এই ব্যাপারটা সমাধান করতে হবে। এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে বলতে হবে যে একটি কিডনী দান করলে অন্য কিডনী দিয়ে আজীবন সুস্থ জীবন যাপন করা যাবে।

কিডনী সংগ্রহের পদ্ধতিঃ

১) তিন ভাবে কিডনী সংযোজনের জন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রথমত: রিলেটেড ডোনার এর কাছ থেকে কিডনী সংগ্রহ । বর্তমানে বাংলাদেশে এই পদ্ধতিতে বেশী কিডনী সংযোজিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় রোগীর নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে সফল বা কাছাকাছি ব্লাডগ্রুপ ও টিস্যু টাইপিং মেলার পর কিডনী সংগ্রহ করে তা রোগীর দেহে সংযোজন করা হচ্ছে।

২) দ্বিতীয়ত: আনরিলেটেড ডোনার। এই পদ্ধতিতে কিডনী ক্রয়/বিক্রয় বেআইনী। বাংলাদেশে এই পদ্ধতি অনুৎসাহিত করা হয়। এর ফলে

banglainternet.com

সামাজিক ভাবে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

৩) তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে -- মৃতব্যক্তির কাছথেকে কিডনী সংগ্রহ বা ক্যাডাভারিক কিডনী। আমাদের মনে হয় এই পদ্ধতিটি সঠিক ভাবে আইন প্রণয়ন, উদ্বুদ্ধায়ন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষারপ্রসার দিলে খুবই ফলপ্রসু হবেএবং তখন কিডনী সংযোজনের সফলতা ও কার্যক্রম আরও জোরদার হবে। এ ছাড়াও আন্তঃ দেশীয় (Intercountry) সহযোগীতা কার্যক্রমের সাহায্যে মাঝেমধ্যে (বিশ্বের অনেক দেশে এভাবে কিডনী সংযোজিত হয়ে থাকে) কিডনী সংযোজন প্রক্রিয়া চালানো যেতে পারে।

৪র্থ অধ্যায়

৭ম পরিচ্ছেদ

রেনাল ট্রান্সপ্লানেন্টশনের তাৎক্ষনিক ও সুদুর প্রসারী জটিলতা

(EARLY AND LATE COMPLICATIONS OF RENAL TRANSPLANTATION)

মতিউর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশনের জটিলতার কারণ সমূহের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো ইমিউনোলজিক্যাল অথবা রোগীকে দেয় ঔষধের কারণে সৃষ্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া । এ সমস্ত জটীলতার ফলে সংযোজিত রোগীর মারাত্মক এবং জীবন বিনাসী হুমকির সৃষ্টি হতে পারে।

এই জটিলতাসমুহকে দু ভাগে বর্ণনা করা যায়। প্রথমতঃ তাৎক্ষনিক ও আর্লি যা প্রথম সপ্তাহ থেকে কয়েকমাসের মধ্যে হয়ে থাকে । দ্বিতীয়তঃ দেরীতে বা লেট সংযোজনের কয়েক মাস থেকে শুরুকরে কয়েক বৎসর পরে দেখা দিতে পারে।

তাৎক্ষনিক জটিলতা ঃ (Immediate Complication)

ক) ত্রনুরিয়া বা অলিগুরিয়া ঃ-- এটা সাধারণত ঃ মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে সংগৃহীত কিডনী সংযোজনের পর থেকে শুরু হয়। এর প্রধান কারণ একিউট টিবিউলার নেক্রোসিস। তবে অন্যান্য কারণ যেমন হাইপার একিউট রিজেকশান, ইউরেটারীক অবষ্টাশন, কেথেটার ব্লক হওয়ার কারণে বা আটারী থ্রম্বোসিস হওয়ার কারণেও এটা হতে পারে। এ ব্যাপারে অন্য পরিচ্ছদে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

banglainternet.com

খ) রক্তপাত ঃ- ইউরেমিয়া রোগীদের সাধারণতঃ কিছু না কিছু কোয়াগুলেশান ডিফেক্ট থাকে। এ ছাড়া যে সমস্ত কিডনী রোগীদের ডায়ালাইসিস করা হয় তাদের কিছু প্লাটিলেট অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে। এর ফলে সংযোজনের পর রক্তপাত হতে পারে এবং ইনসিশন সাইট এ হেমাটোমা তৈরী হতে পারে। যেহেতু এই সমস্ত হেমাটোমার ইনফেকশান হওয়ার প্রবণতা বেশী সেজন্য এই সমস্ত হেমাটোমাকে অপারেশন থিয়েটারে এভাকুয়েশন করা উচিৎ।

আর্লি কমপ্লিকেশন ঃ- (Early Complication)

ক) প্রস্রাব সংক্রান্ত জটিলতা ঃ- টুইষ্টিং, হেমাটোমা, বিশেষতঃ ইউরেটারের অবস্থানে হলে প্রথম সপ্তাহে প্রস্রাবের অসুবিধা হয়। এই জটিলতার কারণে প্রস্রাব লিক করতে পারে। যদি প্রস্রাব লিক, এক্সরে করে নির্ণিত করা হয় তাহলে সার্জারীর প্রয়োজন হয় এটা ঠিক করার জন্য।

খ) ষ্টেরোয়েড সম্পর্কিত জটিলতা ঃ- এর মধ্যে পেপটিক আলসার, পেনক্রিয়াটাইটিস এবং ডায়াবেটিস প্রধান। আস্তে আস্তে ষ্টেরোয়েড এর মাত্রা কমিয়েআনলে এইগুলির প্রবণতা কমে আসে। খুব স্বল্প ক্ষেত্রে গ্রাফটসার্কিফাইস করলে এই সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

গ) কুশিনয়েড ফেসিস ঃ- এটা সাধারণতঃ ষ্টেরেয়েড বেশী ব্যবহার করার জন্য হয়ে থাকে। বিশেষত: ট্রান্সপ্লান্টেশানের প্রথম কয়েকমাসের মধ্যে যখন বেশী ডোজে ষ্টেরয়েড ব্যবহার করা হয়। তবে ষ্টেরয়েডের মাত্রা কমিয়ে এনে মেইন টেন্যান্স ডোজে ব্যবহার শুরু করলে এটা কমে যায়।

ঘ) একিইউট রিজেকশন ঃ- অন্য পরিচ্ছদে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঙ) ইনফেকশন বা প্রদাহ ঃ ইনফেকশান হচ্ছে কিডনী সংযোজনের পরবর্তী জটিলতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ। এই ইনফেকশনকে প্রধানতঃ ২টা ভাগে ভাগ করা যায়। কিডনী সংযোজনের পর প্রথম ৬ সপ্তাহ এর মধ্যে সাধারণতঃ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়। ৬ সপ্তাহ পরে ফাংগাস বা ভাইরাস ইনফেকশন হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ও সঠিক এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের ফলে এবং খুব বেশী ষ্টেরিলিটি মেইনটেন করার কারণে ইনফেকশনের হার পূর্বের ৩০ -৪০z থেকে কমে ৫z নেমে এসেছে।

যে কোন ধরণের ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ইনফেকশন হতে পারে। তবে সুযোগ সন্ধানী ব্যাকটেরিয়া যেমন -- লিসটেরিয়া, এবং ইমিউনোসাপ্রেশন এর কারণে সংযোজিত রোগীদের টিউবারকুলোসিস হতে পারে।এছাড়াও ভাইরাস, ফাংগাস ইনফেকশনেও হতে পারে।

ভাইরাল ইনফেকশনের মধ্যে সাইটোমেগালো ভাইরাস দিয়ে ঘটিত প্রদাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান। সংযোজিত রোগীদের মধ্যে ৬০-৭০z এর একুইট CMV ইনফেকশান হতে পারে। এই রোগ স্ব নিয়ন্ত্রিত তবে রোগীর জীবননাশের সম্ভাবনা অধিক । রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলে বেশী এন্টি CMV টাইটার পাওয়া যায়। চিকিৎসা সিমটোমেটিক। এ ছাড়াও সংযোজিত রোগীদের হারপেস সিমপ্লেক্স ইনফেকশান, হারপেস জোষ্টার, হিউম্যান ওয়ার্ট ভাইরাস ইনফেকশানও হতে পারে। এন্টিভাইরাল ঔষধ যেমন আয়োডক্সিইউরিডিন সহযোগে চিকিৎসা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ফাংগাল ইনফেকশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নকার্ডিয়া, এসপারজিলাস, ক্রিপটোকক্কাস, নিউমোসিসটিস কেরিনি এবং কেণ্ডিডা, এন্টিফাংগাল ঔষধ যেমন এমফোটেরিসিন বি, ফ্লোরোসিসটোসিন এবং এর সঙ্গে এমপিসিলিন বা কট্রিম দিয়ে চিকিৎসা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কোন কোন সময় রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য ইমিউনোসাপ্রেসিভ থেরাপী বন্ধ করার প্রয়োজন হয়।

রোগ নির্ণয় ঃ -

রোগীর ইতিহাস ---

রক্তপরীক্ষা ঃ--- (টিসি,ডিসি, ইএসআর, হেমোগ্লাবিন),

বুকের এক্সরে ঃ-- - নডুলার --(ফাংগাল) ডিফিউজ -- (ভাইরাল),সেগমেন্টাল (ব্যাকটেরিয়াল)

কালচার ঃ- (প্রস্রাব , রক্ত, কফ)

চিকিৎসা ঃ- সঠিক এন্টিবায়োটিক, এন্টিফাংগাল ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

banglainternet.com

চ) লিমফোসিল ঃ – সংযোজিত রোগীর ৬ সপ্তাহের মধ্যে ২০ ভাগের এই জটিলতা দেখা দিতে পারে। সাধারণতঃ কিডনীর কাছাকাছি প্রস্রাব লিকেজ হয়ে অথবা ডিসসেকশন এরিয়াতে আপনাতেই লিমফোসিল হতে পারে। এ ছাড়া কিডনী এরিয়ার ছোট ছোট লিমফেটিকস বন্ধ হওয়ার কারণেও এটা হতে পারে। আলট্রাসাউণ্ড স্কেন করলে এই রোগ ধরা পড়ে। ছোট লিমফোসিল হলে এটা আপনিতেই রিজলভ হয়ে যায়। তবে বেশী পরিমানে ফ্লুয়িড জমলে এর এক পার্শ্বেএণ্ডোথেলিয়াল লেয়ার তৈরী হয় ফ্লুয়িড জমার কারণে এবং এর প্রেসার হাইড্রানেফ্রোসিস, পা ফুলে যাওয়া, অলিগুরিয়া এবং ডাইরিয়া পর্যন্ত হতে পারে। এই লিমফোসিলে ইনফেকশনের প্রবণতা বেশী থাকে।

এন্টিবায়েটিক সহযোগে এটা সার্জিক্যালি ড্রেন করলে ফলাফল ভাল হয়।

দেরীতে জটিলতা বা লেট কমপ্লিকেশন ঃ–

হাইপারটেনশান ঃ– কিডনী সংযোজিত রোগীর হাইপারটেনশন একটি গুরুত্বপূর্ণ জটিলতা। অনেক রোগী যারা ডায়ালাইসিসের সময় নরমোটেনসিভ ছিল কিন্তু সংযোজনের পরেই তাদের হাইপারটেনশন বেড়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে বেশী মাত্রায় ষ্টেরয়েড এর ব্যবহার এবং স্বাভাবিক সল্ট এবং ওয়াটার ব্যালান্স এর অনিয়ন্ত্রন । অনেকেই মনে করেন এর সঙ্গে সংযোজিত কিডনী থেকে নিঃসৃত রেনিন নামক হরমোন এই হাইপারটেনশনের জন্য দায়ী। খুব স্বল্প ক্ষেত্রে আটারী ষ্টেনোসিস এই হাইপারটেনশানের কারণ। হাইপোটেনসিভ ঔষধ সঠিক ভাবে ব্যবহার করে এর চিকিৎসা করতে হবে।

কিডনী সংযোজন এবং ক্যানসার ঃ – কিডনী সংযোজিত রোগীদের মেলিগন্যান্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। দেখা গেছে যে, কিডনী সংযোজিত রোগীদের মেলিগন্যান্ট লিমফোমা হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৩০%। এটা সাধারণত ব্রেনের নীচে হয়ে থাকে। এছাড়াও স্কিনের স্কয়ামাস সেল এবং বেজাল সেলকার্সিনোমা এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সার্ভিক্স এর ক্যান্সার বেশী পরিমানে হয়ে থাকে। ধারণা করা হয় যে, এইসব রোগীর ইমিউনিটি কমের কারণে বা সংযোজিত কিডনী থেকে এই ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশী হয়।

চোখের জটিলতা ঃ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্লুকোমা।

বিশেষত ঃ রোগী বেশীর মাত্রায় ষ্টেরয়েড খেলে এই জটিলতা দেখা

দিতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্যাটারাক্ট হতে পারে যার জন্য সার্জারির প্রয়োজন হয়।

পূর্বের রোগ – যেমন সিসটিনোসিস, মেমব্রেনাস এবং ফোকাল গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস ইত্যাদি পুনরায় হওয়ার সম্ভাবণা বেশী থাকে। তবে অনেক সময় ক্রনিক রিজেকশন থেকে এটা আলাদা করা সম্ভব হয়না।

কার্ডিও ভাসকুলার জটিলতা ঃ– কিডনী সংযোজিত রোগীদের মধ্যে এই জটীলতা খুবই কমন বিশেষতঃ মাইয়োকার্ডিয়াল ইসকিমিয়া, ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ, হাইপারটেনশন এবং হাইপারলাইপিডিমিয়া ডেভেলপ করার কারণে সাধারণত চল্লিশোত্তর বয়সের সংযোজিত রোগীদের এটা বেশী হয়। এই সমস্ত রোগীদের পূর্ব থেকেই কিছু না কিছু এক্সাজিষ্টিং আর্টারিয়াল ডিজিজ থাকে উপরন্ত ইমিউনোসাপ্রেশান এবং ষ্টেরয়েড ব্যবহার এর কারণে এই সমস্ত জটীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

মাসকুলো স্কেলেটাল জটিলতা ঃ– ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর রোগীদের পূর্বে থেকেই রেনাল অষ্টিওডিষ্ট্রোফি থাকার কারণে এবং ষ্টেরয়েড ব্যবহার করার ফলে অষ্টিওপোরেটিক পরিবর্তনের কারণে এই জটিলতা সমুহ ডেভেলপ করে। প্রায় শতকরা ৫০% লংটার্ম ট্রান্সপ্লান্ট রোগীদের এই পরিবর্তন সমুহ দেখা যেতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো এভাসকুলার নেক্রোসিস অফ বোন । এছাড়াও নন ইনফেকটিভ আর্থাইটিস এবং ষ্টেরয়েড ম্যায়োপ্যাথি হতে পারে। অনেক সময় কোন ঔষধ ছাড়াই এই রোগগুলো আপনাতেই ভাল হয়ে যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষ ষ্টেরয়েড এর মাত্রা কম বা বেশী করলে উপকার পাওয়া যায়।

অন্যান্য জটিলতা ঃ– সংযোজিত রোগীর জ্বর একটা প্রধান এবং কমন উপসর্গ। এর সঙ্গে একিউট রিজেকশন বা ইনফেকশান সম্পৃক্ত থাকতে পারে। যদিও বেশীর ভাগ রোগীর এই জ্বরের কারণ অজানা তথাপি প্রায় অর্ধেক রোগীর সাইটোমেগালো ভাইরাস ইনফেকশনের কারণে এই জ্বর হয়ে থাকে। কিছু কিছু রোগীর ষ্টেরয়েডের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে এই জ্বর কমে আসে।

লিউকোপেনিয়া --সাধারণতঃ এজোথিউপ্রিন দেওয়ার ফলে বোন মেরোডিপ্রেশন হওয়ার কারণে লিউকোপেনিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সাইটোমেগালো ভাইরাস ইনফেকশন বা হাইপারস্পীলিনিজমএর কারণেও

banglainternet.com

এটা হয়ে থাকে। স্পিলিনেকটমী করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ইনটেসটিনাল ইসকেমিয়া ঃ- ইসকেমিয়ার কারণে কোলাইটিস যদিও কমন নয় তথাপি অনেকে এর উল্লেখ করেছেন এবং এই রোগে মৃত্যুর হার খুব বেশী। এর আসল কারণ অজানা তবে ল্যাবরেটারী এনিমেলের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ইউরেমিয়ার ফলে এ রোগ পটেনশিয়েট করতে পারে। এছাড়া মেজেনট্রিকভাসকুলার ডিজিজ এর ফলে এথেরোস্কেলেরোসিস হলে এ রোগ বেশী হতে পারে।

৫ম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

কিডনী রোগীর খাদ্য
(DIET IN KIDNEY DISEASE)

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
মিসেস শানে আরা কবির
মতিউর রহমান

কিডনীর প্রধান কাজ হোল শরীরের বিপাকের প্রান্ত দ্রব্য (বিশেষতঃ প্রোটীন মেটাবলিজমের প্রান্ত দ্রব্য) নির্গত করা, এর মধ্যে ইউরিয়া হচ্ছে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যহ প্রায় ৩০ গ্রাম ইউরিয়া নির্গত হয়। এই নির্গত ইউরিয়ার অর্ধেকটা আসে খাবার থেকে, বাকীটা শরীরের বিভিন্ন টিস্যু ধ্বংসপ্রাপ্তি থেকে। কিডনীর সর্বোচ্চ ইউরিয়া কনশেনট্রেট করার ক্ষমতা হচ্ছে ৪z। অর্থাৎ ৩০ গ্রাম ইউরিয়া নির্গমন করার জন্য (৪z কনসেনট্রেশন) কমপক্ষে ৭৫০ মিঃ লিঃ প্রস্রাব তৈরী এবং নির্গত হতে হবে। সেজন্য যখন একুইট নেফ্রাইটিস শুরু হয় তখন প্রস্রাব কমে যায় এবং ইউরিয়া ও অন্যান্য প্রান্ত দ্রব্য শরীরে জমা হয়। তখন রোগীকে শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার বেশী দিলে শরীরে টিস্যু ধ্বংস কম হয় এবং সংগে খাবার প্রোটিন রেসট্রিক্ট করলে ইউরিয়া এবং অন্যান্য প্রান্ত দ্রব্যের শরীরে জমা হওয়া কমে যাবে। আবার যখন কিডনী ফাংশন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হবে এবং প্রস্রাব নির্গমন স্বাভাবিক হবে তখন পর্যাপ্ত প্রোটিন শুরু করা যায়। কিডনীর রোগ গুলোকে প্রধান ৪টি ভাগে ভাগ করে এখন এর খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করব।

১। একুইট নেফ্রাইটিক ইলনেস।
২। নেফ্রোটিক সিনড্রোম।
৩। একুইট রেনাল ফেইলার।
৪। ক্রনিক রেনাল ফেইলার।

banglainternet.com

একুইট নেফ্রাইটিক ইলনেস

সর্বমোট ক্যালরীর প্রয়োজন দৈনিক প্রায় ১৭০০ ক্যালরী।

প্রোটীন (আমিষ)

প্রোটীন খাওয়া সীমাবদ্ধ করতে হবে যতটুকু সম্ভব। এনুরিয়া হলে প্রোটিন সীমাবদ্ধ ২০ গ্রাম ডেইলি করে ১০ – ২০ ٪ গ্লুকোজ বা ফ্রুকটোজ মুখে বা ইন্ট্রাগ্যাষ্ট্রিক ড্রিপ বা আইভি ফ্লুয়িড দিতে হবে। যখন প্রস্রাব আবার স্বাভাবিক হবে তখন প্রোটিন আস্তে আস্তে বাড়ানো যাবে। ৫০০ – ৭০০ মিঃ লিঃ প্রস্রাব হলে প্রতি কেজি বডিওয়েট ০.৫ গ্রাম প্রোটীন দেওয়া যেতে পারে। প্রস্রাব স্বাভাবিক হলে ৬০ গ্রাম প্রোটীন প্রত্যহ দেওয়া যেতে পারে। প্রোটীন বেশী সীমাবদ্ধ করলে এসথেনিয়া এবং এনিমিয়া হতে পারে।

ফ্যাট (চর্বি)

যেহেতু ফ্যাটের বিপাকের প্রান্ত দ্রব্য কিডনীর উপর নির্ভরশীল নয় সেহেতু ফ্যাট এনুরিয়া থাকলেও দেওয়া যাবে।

কার্বহাইড্রেট (শর্করা) ঃ

একুইট নেফ্রাইটিস এর সময় এটাই রোগীর শক্তির প্রধান উৎস।

ভিটামিন ঃ

ভিটামিন সি বা বি কমপ্লেক্স যদি ডেফিসিয়েন্সী থাকে তাহলে সাপ্লিমেন্ট করতে হবে।

মিনারেলস ঃ

কিডনী স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাভাবিক হরমন নিয়ন্ত্রনাধীনে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম নিয়ন্ত্রন করতে পারে। এ্যাকুইট নেফ্রাইটিস হলে কিডনী স্বাভাবিক ভাবে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম নির্গত করতে পারেনা, যেহেতু ইলেকট্রলাইট ইমব্যালান্স হয়। সেই জন্য ইলেকট্রোলাইট পরীক্ষা করার পর সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম দিতে হবে। শরীরে ইডিমা থাকলে সোডিয়াম দেওয়া যাবে না বা সীমা বদ্ধ করতে হবে। ইডিমা কমে গেলে পুনরায় সোডিয়াম দেওয়া যেতে পারে। আবার প্রস্রাব কম হলে পটাশিয়াম সীমাবদ্ধ করতে হবে।

ফ্লুইড ঃ

যেহেতু প্রস্রাবের সংগে পানি নির্গত হওয়া ছাড়াও প্রায় ১০০০ মিঃ লিঃ পানি নিশ্বাস প্রশ্বাসে, ঘাম এবং পায়খানার সংগে নির্গত হয় সেই জন্য প্রত্যহ একটা ফ্লুইড চার্ট তৈরী করতে হবে। যে পরিমান পানি প্রস্রাবের সংগে নির্গত হয় এর সংগে আরও ১০০০ মিলি লিটার রুগীকে দিতে হবে। যদি রুগীকে চা, সুপ, দুধ ফলের রস খেতে দেওয়া হয় তার পরিমান বের করে মোট ফ্লুইড থেকে বাদ দিতে হবে।

নেফ্রোটিক সিনড্রোম

ক্যালরী ঃ– প্রত্যহ প্রায় ২০০০ ক্যালরি রুগীকে দিতে হবে।

প্রোটীন ঃ– নেফ্রোটিক সিনড্রোমে খুব সামান্য থেকে প্রচুর পরিমান প্রোটিন শরীর থেকে প্রস্রাবের সংগে নির্গত হয়। এবং এর ফলে সিরাম এ্যালবোমিনের পরিমান কমে যায়, কলয়ডাল অংকোটিক প্রেসার কমে যায়, ফলে ইডিমা হয়। সংগে সিরাম কোলেষ্টেরল এর মান বেড়ে যায়। এই জন্য সমস্ত রুগীর প্রোটীন ডাইট কম পক্ষে ১.৫ থেকে ২ গ্রাম প্রোটীন / প্রতি কেজি বডি ওজন হিসাবে দিতে হবে।

ফ্যাট ঃ স্বাভাবিক পরিমান ফ্যাট অর্থাৎ ১ গ্রাম / প্রতি কেজি বডির ওজন হিসাবে দিতে হবে।

কার্বোহাইড্রেট ঃ

প্রোটীন এবং ফ্যাট থেকে প্রাপ্ত ক্যালোরী বাদ দিয়ে বাকিটা কার্বোহাইড্রেট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

ভিটামিন ঃ ভিটামিন সি এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সাপলিমেনট দেওয়া যেতে পারে।

মিনারেলস ঃ– ইডিমা থাকলে সোডিয়াম কম যুক্ত খাবার দিতে হবে। এই জন্য খাবার এর সংগে অতিরিক্ত লবন না দেওয়া ভাল। লবন যুক্ত খাবার যেমন -- সলটেড বিস্কুট, সলটেড বাটার, টিনজাত মাছ এবং মাংস পরিত্যাগ করা ভাল। এর পরেও যদি ইডিমা থকে তাহা হলে ইলেক্ট্রোলাইট করতে হবে। যদি সোডিয়ামের মান কম থাকে তা হলে খাবার লবন খেতে দেওয়া যেতে পারে।

banglainternet.com

এ্যাকুইট রেনাল ফেইলিওর

ক্যালরী ঃ–

৬০০ থেকে ১০০০ ক্যালরী প্রত্যহ প্রয়োজন। কার্বোহাইড্রেড এবং ফ্যাট থেকে বেশী ক্যালরী সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রোটীন ঃ–

যদি রুগী কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে থাকে এবং বান (BUN) এর মান বাড়তে থাকে তাহলে সব ধরনের প্রোটিন বন্ধ করতে হবে। যদি রুগী পেরিটনিয়াল ডায়ালাইসিস বা হেমোডায়ালাইসিস এ থেকে তাহলে ৪০ গ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন দেওয়া যেতে পারে।

ফ্যাট ঃ–

ফ্যাট থেকে বেশী পরিমান ক্যালরী নেওয়ার জন্য বেশী পরিমানে ফ্যাট রুগীকে দেওয়া যেতে পারে।

কার্ব হাইড্রেড ঃ–

টিস্যু ব্রেকডাউন রোধ করার জন্য প্রতিদিন ১০০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দেওয়া যেতে পারে। ৫% ইন্ট্রাভেনাস গ্লুকোজ ইনফিউশন দেওয়া যেতে পারে। তবে যেহেতু বেশী ঘনত্বের কারনে ভেনাস থ্রমবোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেহেতু বেশী করে মুখে গ্লুকোজ, ফ্রুকটোস রুগীকে খেতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। যদি মুখে খাওয়ানো সম্ভব না হয় তা হলে ন্যাজোগ্যাসট্রিক টিউব দিয়ে দিতে হবে।

ফ্লুইড ঃ –

৫০০ মিলি লিটার এবং এর সংগে যে পরিমান প্রস্রাব বা ঘামের সংগে বেড়োবে সে পরিমান যোগ করে রুগীকে ফ্লুইড দিতে হবে।

সোডিয়াম ঃ

প্রস্রাবে কতটুকু সোডিয়াম নির্গত হলো সেটা মেপে তা রিপ্লেস করতে হবে। অনেক সময় শরীরে পানি বেশী জমার কারনে ডাইলুসন্যাল হাইপোনেট্রিমিয়া (সোডিয়ামের পরিমান ১২০ মিলি ইকুইভেলেন্ট) হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে লবন না কমিয়ে পানির পরিমান সীমাবদ্ধ করলে রুগী উপকৃত হবে।

পটাশিয়াম ঃ–

এ্যাকুইট রেন্যাল ফেইলিউর রুগীদের হাইপার ক্যালিমিয়ার জন্য পটাশিয়াম ইনটকসিকেশন হতে পারে এবং প্রত্যহ পটাশিয়ামের পরিমান বাড়তে থাকে। পটাশিয়ামের হার্টের উপর প্রতিক্রিয়া আছে সেই জন্য ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ১০z , ৩০ থেকে ৫০ মিলিলিটার ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশান দিলে উপকার পাওয়া যাবে। অনেক ক্ষেত্রে ১০ x গ্লুকোজ ২০০ মিলিলিটার এবং এর সংগে ১০ ইউনিট ইনসুলিন দিয়ে ইনফিউশান দিলে পটাশিয়াম সেলের মধ্যে জমা হবে। এর সংগে বাওয়েল ওয়াশ করলে প্রায় ১০০ মিলি ইকিউভেলেন্ট পটাশিয়াম নির্গত হবে।

ক্যাটায়ন ঃ

একচেঞ্জ রেজিন ব্যবহার করলে পটাশিয়ামের মান কমে আসে। পলেষ্ট্রিইন সোডিয়াম সালফোনেট ১৫ গ্রাম মুখে ২ থেকে ৩ বার দেওয়া যেতে পারে। এই রেজিন পটাশিয়াম একচেঞ্জ করে এবং এর নির্গমন এর জন্য ক্যালসিয়াম সলবিটল ব্যবহার করা হয়। রেজনিয়াম যা পটাশিয়াম এর পরিবর্তে ক্যালশিয়াম একচেঞ্জ করে তা ১৫ থেকে ৩০ গ্রাম মুখে খাওয়ার জন্য রুগীকে দেওয়া যেতে পারে। যে সমস্ত রুগীর বমি ভাব বা ইনটেসটিন্যাল অবষ্ট্রাকশন থাকে উপরোক্ত রেজিন সমূহ হাইরেকটাল রিটেনশন এনেমা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্রনিক রেনাল ফেইলিউর ঃ

ক্যালরি ঃ–

৩৫ থেকে ৫০ ক্যালরী প্রতি কেজি বডি ওজন হিসাবে কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

প্রোটীন ঃ–

ক্রনিক রেনাল ফেয়লিউর রুগিদের ৪০ গ্রাম প্রোটিন প্রতিদিন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট প্রতি মিনিটে ১০ মিলি লিটার এর কম হলে প্রোটিন একদম সীমাবদ্ধ করতে হবে। শরীরের জন্য কম পক্ষে ২০ গ্রাম প্রোটিনের প্রায়োজন। যদি গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট প্রতি মিনিটে ৪ মিলি লিটারের কম হয় তবুও ২০ গ্রাম প্রোটিন দিতে হতে। কারন শরীরের প্রয়োজনীয় এসেনশিয়াল এ্যামাইনো এসিড দুধ ও ডিম থেকে পাওয়া যাবে। এবং নন এসেনশিয়াল এ্যামাইনো এসিড পাওয়া যাবে শরীরে

banglainternet.com

জমাকৃত ব্লাড এ্যামাইনো নাইট্রোজেন থেকে। ক্রনিক রেনাল ফেইলিওর প্রোটিন সীমা বন্ধ করার জন্য ব্লাড ইউরিয়ায় মান ১০০ মিলিগ্রাম প্রতি মিলি লিটারের কাছা কাছি থাকবে ফলে ইউরেমিয়ার লক্ষন সমুহ কম হবে।

ফ্যাট ঃ –

শরীরের শক্তির জন্য ফ্যাট কার্বোহাইড্রোটের সংগে বেশি পরিমানে খেতে দিতে হবে যদিও এ সমস্ত রুগীর সিরাম টাইগ্লিসারাইডের মান বেশী থাকে বেশী পরিমান কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার জন্য বা হেমোডায়ালাইসিস করার সময় প্রচুর পরিমান গ্লুকোজ দেওয়ার ফলে।

কার্ব হাইড্রেট ঃ –

ইউরেমিয়ার রুগীদের বেলায় কার্বোহাইড্রেট থেকে আরও বেশী পরিমান শক্তি সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। কারণ শরীরের ভিতরে যেন প্রোটিন বেশী ভাংগা চুড়া না হয়। এর সংগে শাক সবজী বা ফল মুল বিশেষ ভাবে প্রোসেস করে (যাতে পটাশিয়ামের পরিমান কম থাকে) খেতে দেওয়া হয়। এই সমস্ত রুগীদের কোন কোন সময় গ্লুকোজ টলারেন্স টেষ্ট করলে ফলস ডায়াবেটিক কার্ভ বা ডায়াবেটিক কার্ভের চিত্র পাওয়া যায় এবং রুগীকে হেমোডায়ালাইসিস করলে ডায়াবেটিস ভাল হয়ে যায়।

ফ্লুইডস ঃ

ক্রনিক রেনাল ফেইলিওরের প্রাথমিক অবস্থায় টিবিউলসের কনসেনট্রেটিং পাওয়ার কমে যাওয়ার কারনে প্রসাবের পরিমান বেশী হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে রুগীকে ফ্লুয়িড দেওয়া হয়। এবং পরবর্তীতে বমি এবং না খাওয়ার কারনে রুগী ডি হাইড্রেটেট হয়ে যায়, যেখানে ইন্ট্রাভিনাস ফ্লুইডস দেওয়ার প্রয়োজন পরে। পরবর্তিতে আস্তে আস্তে কিডনী ফাংশন খারাপ হতে থাকলে, গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট কমতে থাকলে প্রস্রাবের রেট ও কমতে থাকে। ফলে ইডিমা হয় এবং ডাইলুসন্যাল হাইপোনেট্রিমিয়া হয় যেখানে ফ্লুয়িড এর সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন হয়।

সোডিয়াম ঃ–

যেহেতু ক্রনিক রেনাল ফেয়লিউর রুগিদের কিডনীর সোডিয়াম ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায় সেই জন্য খুব সহজেই এদের সোডিয়াম কমে যায়। এর উপর খাওয়ার অরুচি এবং স্বল্প খাওয়া এই অবস্থাকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যায়। ফলে শরীরের ব্লাড ভলিয়ুম কমে যায়। গ্লোমেরুলার

ফিলট্রেশন রেট কমে যায়, ফলে কিডনী ফাংশন আরও খারাপ হয়। যদি সোডিয়াম ওভারলোডের ক্ষমতা না থাকে তাহলে রুগীকে ইনট্রাভেনাসস্যালাইন, খাওয়ার সংগে লবন বা অন্যান্য ফ্লুয়িড খেতে দেওয়া হয়। হাইপারনেট্রিমিয়ার লক্ষন থাকলে (যেমন পায়ে ইডিমা, পালমোনারি কনজেশন, হাইপারটেনশান, এনগর্জড ভেইন ইত্যাদি থাকলে) সোডিয়াম সীমাবদ্ধ করতে হবে।

পটাশিয়াম ঃ –

হাইপারক্যালিমিয়া হতে পারে খুব বেশী টিস্যু ভাংগা চুড়া হলে, প্রস্রাব কম হওয়ার কারনে। যদি হাইপারকেলিমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া এবং হাইপারম্যাগনেশিমিয়া একত্রে থাকে তাহলে এ্যারিথমিয়া, মাইয়োকার্ডিয়াল চেঞ্জ বা অন্যান্য ইসিজি চেঞ্জ থাকতে পারে। এই গুলোর ব্যবস্থা পুর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। খাওয়ার পটাশিয়াম সীমাবদ্ধ করতে হবে যেমন – শাকসব্জী এবং আলুতে প্রচুর পটাশিয়াম পাওয়া যায়। এদের পটাশিয়াম কনটেন্ট বহুল পরিমানে কমানো সম্ভব যদি এগুলোকে স্লাইস করে কাটা যায়, অনেক ক্ষন পানি দিয়ে ধোয়া হয় এবং ৫০ থেকে ৬০ ডিগ্রী সেন্টি গ্রেড ২ ঘন্টা রাখা যায়।

কিডনী রোগীর খাদ্যের কিছু নমুনা ঃ

(ক) **২০ গ্রাম প্রোটীন খাদ্য**

ক্যালরী -- ১৬০০ ।
শর্করা --- ২২২.৮ গ্রাম।
চর্বি ------ ৬৭.০ গ্রাম।
প্রোটিন --- ২০.০ গ্রাম।
(প্রানীজ ---- ৭.৬ গ্রাম)।

সকালের নাস্তা =
পারাটা ১ টা (১ ছটাক) অথবা
পাউরুটি + মাখন
+ চিনি --- ২ টুকরা।
ডিম ভাজি – বা হালুয়া – ১ ডিমের।

দুপুর =
ভাত – ১ ছটাক চালের।
• মাছ বা মাংস – ১/ ৪ ছটাক বা ১/২ ডিম।
শাক -- সালাদ -- বেশী।
• সবজি -- ভাজি -- ১ কাপ।

banglainternet.com

রাত্রি = দুপুরের মত।

(রান্নায় তেল বেশী)।

- মাছ বা মাংস --২ বেলার জন্য যে কোন ১ টি খেতে হবে।
রুই বা অন্য টুকরা মাছ ২´´ × ২´´ × ১´´ মাপের ১ টুকরা অথবা ছোট টেংরা মাছ ৯ – ১০ টা, অথবা মলা মাছ – ১৪ – ১৫ টা অথবা পুঁটি মাছ ৩ – ৪ টা, অথবা কেচকি মাছ ৫০ – ৬০ টি, অথবা মাংস ১ পিস $\frac{১}{২}$ ´´ × $\frac{৩}{৪}$ ´´ মাপের ১ টুকরা, অথবা ডিম --১ টা।

- সবজি ঃ লাউ, চালকুমড়া, ঝিংগা, চিচিংগা, শশা, বাধাকপি, মুলা, পটল, লালশাক, পালংশাক, ডাটা, ডাটাশাক, ব্যতিত অন্য কোন সবজি খাওয়া নিষেধ।

লবনের পরিবর্তে লেবু ও ভিনেগার খাওয়া যাবে।

(খ) ৩০ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য

ক্যালরী -- ১৭০০।
শর্করা --- ১৭৯.১ গ্রাম।
চর্বি ------ ৭৪.৫ গ্রাম।
প্রোটিন --- ৩০.০ গ্রাম।
(প্রানীজ ---- ১৭.৪ গ্রাম)।

সকালের নাস্তা = পারাটা ১ টা (১ ছটাক) অথবা
পাউরুটি + মাখন + চিনি --২ টুকরা।
ডিম ভাজি – বা হালুয়া --১ ডিমের।

দুপুর = ভাত – ১ ছটাক চালের।
- মাছ বা মাংস – ১/ ২ ছটাক।
শাক -- সালাদ -- বেশী।
- সবজি -- ভাজি -- ১ কাপ।

রাত্রি = দুপুরের মত।
(রান্নায় তেল বেশী)।

- মাছ বা মাংস = ২ বেলার জন্য যে কোন ২ টা খেতে হবে।

রুই বা অন্য টুকরা মাছ ২´´ × ২´´ × ১´´ মাপের ১ টুকরা অথবা ছোট টেংরা মাছ ৯ – ১০ টা, অথবা মলা মাছ – ২৪ – ২৫ টা অথবা পুঁটি মাছ ৩ – ৪ টা, অথবা কেচকি মাছ ৫০ – ৬০ টা, অথবা মাংস ১ $\frac{১}{২}$ ´´ × ১ $\frac{১}{২}$ ´´ × $\frac{৩}{৪}$ ´´ মাপের ১ টুকরা।

- সবজি ঃ লাউ, চালকুমড়া, ঝিংগা, চিচিংগা, শশা, বাধাকপি, মুলা, পটল, লালশাক, পালংশাক, ডাটা, ডাটাশাক ছাড়া অন্য সবজি খাওয়া নিষেধ।

লবনের পরিবর্তে লেবু ও ভিনেগার ব্যবহার করা যাবে।

(গ) ৪০ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য।

ক্যালরী -- ১৯৫০।
শর্করা --- ২৫৯.৭ গ্রাম।
চর্বি ------ ৭৯.৬ গ্রাম।
প্রোটিন --- ৪০.০ গ্রাম।
(প্রানীজ ---- ২৭.০ গ্রাম)।

সকালের নাস্তা ঃ পারাটা ১ টা (১ ছটাক) অথবা
পাউরুটি - মাখন + চিনি --২ টুকরা।
ডিম ভাজি – বা হালুয়া -- ১ ডিমে।

১১টায় ঃ দুধ – ১ / ২ পোয়া (চিনিসহ)।

দুপুর = ভাত – ১ $\frac{১}{২}$ ছটাক চালের।
- মাছ বা মাংস – ১ ছটাক।
শাক -- সালাদ -- বেশী।
- সবজি -- ভাজি -- ১ কাপ।

বিকালে ঃ দুধ -- ১ / ২ পোয়া (চিনিসহ)।

রাত্রি = ভাত – ১ ছটাক।
- মাছ বা মাংস ১/২ ছটাক।
শাক – সালাদ – বেশী।
- সবজি ভাজি – ১ কাপ।

(রান্নায় তেল বেশী)।

banglainternet.com

* মাছ বা মাংস = ২ বেলার জন্য যে কোন ৩ টা খেতে হবে।
রুই বা অন্য টুকরা মাছ ২″ × ২″ × ১″ মাপের ১ টুকরা অথবা ছোট ট্যাংড়া মাছ ৯ – ১০ টা, অথবা মলা মাছ – ২৪ – ২৫ টা অথবা পুঁটি মাছ ৩ – ৪ টা, অথবা কেচকি মাছ ৫০ – ৬০ টা, অথবা মাংস স স ১ $\frac{১}{২}$″ × ১$\frac{১}{২}$″ × $\frac{৩}{৪}$″ মাপের ১ টুকরা।

* সবজি ঃ লাউ, চালকুমড়া, ঝিংগা, চিচিংগা, শশা, বাধাকপি, মুলা, পটল, লালশাক, পালংশাক, ডাটা, ডাটাশাক, ব্যতিত অন্য সবজি খাওয়া নিষেধ।

লবনের পরিবর্তে লেবু ও ভিনেগার ব্যবহার করা যাবে।

(ঘ) <u>১০০ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য</u>

ক্যালরী -- ২৭০০।

শর্করা --- ৩০৮.৯ গ্রাম।

চর্বি ------ ৬৫.৮ গ্রাম।

প্রোটিন --- ৯৫.৬ গ্রাম।

(প্রানীজ ---- ৪২.৬ গ্রাম)।

সকালের নাস্তা = আটার রুটি বা পারাটা ১$\frac{১}{২}$ ছটাক (৯০ গ্রাম)।

ডিম ভাজি বা ডিমের হালুয়া -- (২টা ডিমের)।

চা – চিনি ও দুধ সহ।

১১ টায় ঃ দুধ – ১ পোয়া।

সুজির হালুয়া -- (১/২ ছটাক সুজি ও চিনি)

অথবা বিস্কুট ১ / ২ ছটাক।

দুপুর = ভাত – ১/২ পোয়া চালের।

* মাছ বা মাংস – ১$\frac{১}{২}$ ছটাক ।

ডাল -- ৩ কাপ মাঝারী ঘন।

শাক -- সালাদ = ইচ্ছামত।

* সবজি ইচ্ছামত।

বিকালে ঃ দুধ – ১ পোয়া।

হালুয়া বা বিস্কুট বা সেমাই।

রাত্রি = দুপুরের মত।

(রান্নায় তেল বেশী)।

* মাছ বা মাংস = ২ বেলার জন্য যে কোন ৫ টি খেতে হবে।
রুই বা অন্য টুকরা মাছ ২″ × ২″ × ১″ মাপের ১ টুকরা অথবা ছোট টেংরা মাছ ১২ – ১৩ টা, অথবা মলা মাছ – ৩৫ – ৪০ টা অথবা পুঁটি মাছ ৪ – ৫ টা, অথবা কেচকি মাছ ৫০ – ৬০ টা, অথবা মাংস ১$\frac{১}{২}$″ × ১$\frac{১}{২}$″ × $\frac{৩}{৪}$″ মাপের ১ টুকরা।

* ডাল = ১$\frac{১}{২}$ ছটাক ডাল রান্না করে ২ বেলায় খেতে হবে।

banglainternet.com

৫ম অধ্যায়

২য় পরিচ্ছেদ

কিডনী রোগ প্রতিরোধ
(PREVENTIVE ASPECTS OF KIDNEY DISEASE)

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)
হোসনে আরা বেগম (চারু)

ইংরেজীতে একটি প্রচলিত কথা আছে Prevention is better than cure. এটা প্রায় সব রোগের ক্ষেত্রেই কম বেশী প্রযোজ্য বিশেষতঃ কিডনী রোগের বেলাতে তো বটেই। কিডনী রোগসমূহের একটা শ্রেনী বিন্যাস করে এর প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করব।

ক) একুইট নেফ্রাইটিস

কারণ	প্রতিরোধ ব্যবস্থা
১. গলায় প্রদাহ, সোরথ্রোট বা ষ্ট্রেপটোকক্কাল প্রদাহ	ক) ষ্ট্রেপটোকক্কাল সোর থ্রোট এর দ্রুত ও সঠিক চিকিৎসা ।
২. খোস পাঁচড়া (পায়োডারমা), ম্যালেরিয়া	খ) খোস পাঁচড়া , ম্যালেরিয়ার সঠিক ও দ্রুত চিকিৎসা।
৩.ঔষধের কারণে নেফ্রাইটিস (যেমন বাতজ্বর , মৃগীর ঔষধ ইত্যাদি)	গ) যে সমস্ত ঔষধের কারণে নেফ্রাইটিস এর লক্ষন প্রকাশ পায় সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা।
৪. জণ্ডিস (ভাইরাল হেপাটাইটিস)	ঘ) রক্ত দেওয়া ও নেওয়ার সময় বি হেপাটাইটিসের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডিসপোজেল সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে ও প্রয়োজনে ভ্যাকসিন নিতে হবে।

খ) কিডনীর প্রদাহ

কারণ	প্রতিরোধ
১. পেরিএনাল রিজিওন বা মলদ্বারের আশে পাশে থেকে যেয়ে জীবানু যোনীপথে বাসা বাঁধে এবং সেখান থেকে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিডনীতে যায় এবং প্রদাহের সৃষ্টি করে। রক্তে কোন জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে কিডনীর প্রদাহ হতে পারে।	ক) ব্যক্তিগত শরীরচর্য্যা বিশেষতঃ পেরিনিয়াল হাইজিন ভাল রাখা প্রয়োজনীয়। কিডনীর প্রদাহ হলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শমত চিকিৎসা হয়ে গ্রহণ।
২. বিবাহিত এবং গর্ভবতী মেয়েদের এটা বেশী হয়ে থাকে।	খ) বিবাহিত মেয়েদের বার বার প্রস্রাব ইনফেকশানের জন্য ও গর্ভবতী মার কিডণীর প্রদাহ হয়ে কিডনীর ক্ষতি রোধ করার জন্য অনেক দিন ধরে একটা এন্টিবায়োটিকখেতে বলতে হবে।
৩.ডায়াবেটিস রোগীদের শর্করা অনিয়ন্ত্রণ এবং ইমিউনিটি কমের কারণে এটা বেশী হয়।	গ) ডায়াবেটিস রোগীদের সাথে সাথে রোগ নির্ণয় করতে হবে । ডায়াবেটিস রোগীদের শর্করা নিয়ন্ত্রন অপরিহার্য।
৪. বাচ্চাদের যদি জন্মগত কোন ম্যালফরমেশন থাকে বা বয়স্কদের প্রষ্টেটিক এনলার্জমেন্ট এরজন্য এটা হয় বা রিফ্লাক্স থাকে।	ঘ) জন্মগত ত্রুটি, প্রষ্টেটিক এনলার্জমেন্ট সার্জারী করে ভাল করতে হবে।

গ) কিডনী পাথুরি রোগ

কারণ	প্রতিরোধ
১. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির অতিরিক্ত কাজের জন্য	ক) প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি বেশী কাজ করলে তা সার্জারীর মাধ্যমে ফেলে দিতে হবে।
২. কিডনীর টিবিউলস স্বাভাবিক কাজ না করলে, পানি কম খেলে, ঘাম বেশী হয়ে প্রস্রাব কম হলে।	খ) বেশী পরিমানে পানি ৪-৫সের পরিমানে দৈনিক খেতে বলতে হবে।

banglainternet.com

৩.অতিরিক্ত দুধ ও এন্টাসিড খেলে ও বেশী ভিটামিন "ডি" খাওয়ার কারণে	গ) অতিরিক্ত ভিটামিন, ডি, দুধ, এন্টাসিড খাওয়া বন্ধ করতে হবে।
৪.গাউট জাতীয় জয়েন্ট ডিজিজ	ঘ) গাউটের চিকিৎসা করতে হবে এলুপুরিনাল দিয়ে।
৫. কোন কারণে অন্ত্রের থেকে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম রক্তে চলে আসলে।	ঙ) যে সমস্ত খাবারে পাথর তৈরীর কম্পোনেন্ট বেশী আছে সেগুলো কম খেতে হবে বা পরিহার করতে হবে।

ঘ) কিডনী ফেইলিওর

একুইট রেনাল ফেইলিওর এর কারণ	প্রতিরোধ
১.ডায়ারিয়া বা বমির কারণ বেশী পরিমাণ পানি লবণ শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে ।	ক) জ্বর , ডায়রিয়া, বমির কারণে ও শরীরে লবন বা পানির ঘাটতি হলে রোগীকে প্রচুর পানি খাওয়াতে হবে এবং ওরাল স্যালাইন খাওয়াতে হবে বা স্যালাইন দিতে হবে।
২.যে কোন কারণে শরীরের ভেতরে বা বাহিরে রক্তক্ষরণ বেশী হলে।	খ) রক্তপাত হলে রোগীকে রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা করাতে হবে।
৩.মারাত্মক কোন নেফ্রাইটিস রোগ হলে	গ) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
৪.কোন ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে	ঘ) কোন ঔষধ খাওয়ার পর প্রস্রাব কম হলে সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ বন্ধ করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতেহবে। জ্বর ও প্রদাহের কারণ যারা প্যারাসিটামল বা কোট্রাইমোক্সাজোল ঔষধ খাচ্ছেন তাদের প্রচুর পানি খেতে উপদেশ দিতে হবে।
৫. পাথর টিউমার বা অন্য কোন কোন কারণে একত্রে দুইদিকের ইউরেটার বন্ধ হয়ে গেলে।	ঙ) সার্জারীর মাধ্যমে বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মত চিকিৎসা নিতে হবে।

৬. অজ্ঞ ধাত্রী দিয়ে গর্ভপাত করালে।	চ) প্রয়োজন হলে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী,সম্ভব হলে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে গর্ভপাত করানো উচিৎ।
৭. সেপটিসমিয়া বা ব্যাকটেরিমিয়ার কারণে রক্ত সংক্রমিত হলে	ছ) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমত চিকিৎসা করাতে হবে।

ঙ) ক্রণিক রেনাল ফেইলিওর

কারণ	প্রতিরোধ
১. নেফ্রাইটিস	ক) এই সমস্ত রোগগুলো যেহেতু অনেকদিন ধরে চলতে থাকে সে জন্য রোগীদের সব সময় ডাক্তারের পরামর্শ মত চলতে হয়। নেফ্রাইটিসের কারণ বের করে চিকিৎসা করতে হবে।
২. বহুমুত্র জনিত কিডনী রোগ	খ) বহুমুত্র বা উচ্চচাপের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা।
৩. উচ্চরক্তচাপ জনিত কিডনী রোগ	

উপরের আলোচনা থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে বেশী পরিমাণ পানি খেলে, গলায় প্রদাহ বা খোস পাঁচড়াকে অবহেলা না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিলে কিডনী রোগ বিশেষতঃ নেফ্রাইটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব। উপরন্ত জ্বর, বমি, পাতলা পায়খানা, রক্তপাত ইত্যাদি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে উপযুক্ত ফ্লুইড বা রক্ত রিপ্লেশমেন্ট দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও বেশী ঔষধ খাওয়ার কারণে বা ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে কিডনীর অসুবিধা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সে ঔষধ বাদ দিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়াও জন্মগত এন্টী, প্রষ্টেট গ্লাণ্ড বা প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি বড় হলে বা পাথর টিউমার এর কারণে দুই দিকের ইউরেটার একত্রে বন্ধ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক ভাবে সার্জারীর সাহায্যে এই সব বাধা দুর করতে হবে। সুতরাং এই সমস্ত ফ্যাক্টরগুলো মনে রাখলে কিডনী রোগ বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

banglainternet.com

৫ম অধ্যায়

৩য় পরিচ্ছেদ

কিডনীর জন্য ক্ষতিকারক ঔষধ সমুহ
(NEPHROTOXIC DRUGS)

মতিউর রহমান
মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

ঔষধের বিষক্রিয়ার জন্য কিডনী খুব ভালনারেবল যার উল্লেখযোগ্য কারণ হোল এর রক্তচলাচল, যেহেতু কিডনীর মধ্য দিয়ে শতকরা ২৫ ভাগ কার্ডিয়াক আউটপুট এর রক্ত প্রবাহিত হয়। এটা স্বাভাবিক যে কিডনীর মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমানে ঔষধ প্রবাহিত হয় যদিও ঔষধের মাত্রার পিক কিছুক্ষনের জন্য থাকে এবং এসমস্ত ঔষধের মেটাবলিজম এবং শরীর থেকে নির্গত হওয়ার জন্য কিডনী ছাড়া অন্য পথে তা সাধারণতঃ বেশী হয়। দ্বিতীয়ত মেডুলারী ইন্টারষ্টিশিয়াম এর হাইপোটোনিসিটি যা ঔষধের ঘনত্ব বাড়ায় এবং কিডনীর হাইপোভাসকুলার রিজিওনে ঔষধ জমা হতে সাহায্য করে। এর ফলে রেনাল টিবিউলার সেল শরীরের অন্যান্য টিস্যু থেকে ঔষধের ঘনত্বের সঙ্গে বেশী এক্সপোজড হয়। তৃতীয়তঃ কিডনীর স্বাভাবিক ফাংশান ও জরুরী। কেন না কোন রেনাল ডিজিজ ও সঙ্গে ইনসাফীসিয়েন্সী থাকলে এর নির্গমন করার ক্ষমতা কমে যায় এবং একট্রা রেনাল নির্গমন সঠিকভাবে কার্যকর না থাকলে ঔষধ কিডনীতে জমা হবে। উপরন্ত রক্ত প্রবাহ যে কোন ঔষধের বেশী কনসেনট্রেশন অন্যান্য টিস্যুর মত কিডনী টিস্যুকেও প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এছাড়াও কিডনী রোগে আক্রান্ত রোগীরা অনেক ধরনের ঔষধ যেমন রক্তচাপ, বোনের ওসুখ, ইনফেকশান, ইমিউনোলজিক্যাল রোগ, পেটের পীড়া এবং নিউরোলজীক্যাল রোগের জন্য খেয়ে থাকে। সুতরাং একটি কথা পরিস্কার যে, ঔষধের প্রত্যক্ষ কারণে বা এদের ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে টক্সিক লেভেলে পৌছালেই কিডনীর ক্ষতি হবে। এবারে প্রচলিত কিছু নেফ্রোটিক্সিক ঔষধ সম্পর্কে আলোকপাত করব। প্রচলিত নেফ্রোটিক্সিক ঔষধ গুলোকে আমরা প্রধান ৫টি ভাগে ভাগ করব।

(ক) এনালজেসিক ফেনাসিটিন, প্যারাসিটামল, ননষ্টেরয়ডাল এন্টি ইনফ্লামেটোরী এজেন্টেস।

(খ) এন্টি মাইক্রোবিয়াল সালফোনামাইড, পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিণ, টেট্রাসাইক্লিন, পলিমিকিজন, এমাইনোগ্লাইকোসাইড, এমফোটেরিসিন বি।

(গ) এনাসথেটিক এজেন্ট -- মেথোক্সিফ্লুরেন।

(ঘ) রেডিও লজিক্যাল কনট্রাষ্ট মিডিয়া।

(ঙ) সলভেন্ট স্লিফিং ঃ বিশেষত যার মধ্যে ট্রাইক্লোরোইথাইলিন থাকে।

ক) এনালজেসিক নেফ্রোপ্যাথি হচ্ছে একটা রেনাল ডিজিজ যা সাধারণতঃ বেশী করে এনালজেসিক ড্রাগ যেমন ফেনাসিটিন ও প্যারাসিটামল খাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট হলো কিডনীর প্যাপিলারী নেক্রোসিস হয়ে একুইট রেনাল ফেইলার হওয়া। তা ছাড়াও ইন্টারষ্টিশিয়াল নেফ্রাইটিসও হতে পারে।

খ) এন্টিমাক্রোবিয়াল এজেন্ট ঃ-

সালফোনামাইড --- যদিও এ ধরনের ঔষধ এখন বেশী ব্যবহার হয় না তথাপি আগে এদের ক্রিষ্টালগুলো এবং তার এসিটাইলেটেড পানিতে কম দ্রবণীয় বলে পানি বেশী না খেলে এদের অবষ্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথী হওয়ার সম্ভাবণা থাকত। বিশেষতঃ সালফোনামাইড ক্রিষ্টাল ডিষ্টাল টিবিউল, পেলভিস বা ইউরেটারে জমা হয়। বর্তমানে যে সমস্ত সালফার জাতীয় ঔষধ পাওয়া যায় বিশেষতঃ কোট্রাইমোক্সাজল তাদের খাওয়ার সময় প্রচুর পানি খেতে বললে এই ক্রিষ্টালিউরিয়া থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

পেনিসিলিন -- বেনজাইল পেনিসিলিন এবং এর সেমিসিনথেটিক হোমোলোগ্যাস সাধারণত রেনাল টক্সিসিটি মুক্ত। তবে যদি কোন রোগী বেনজাইল পেনিসিলিন খুব বেশী মাত্রায় যেমন ১০০ মিলিয়ন ইউনিট প্রতিদিন দেওয়া হয় ফলে হাইপোক্যালেমিয়া হয়, অসমোটিক ডায়ুরেসিস বেশী হওয়ার ফলে। অসমোটিক ডায়ুরেসিস হওয়ার কারণ হোল পেনিসিলিন নন রিএবসোরবেবল এনায়নের উপর কাজ করে। তবে সেমিসিনথেটিক পেনিসিলিন যেমন মেথিসিলিন কিডনীর প্রত্যক্ষ টিস্যু ডামেজ করতে পারে হাইপার সেনসিটিভিটি রিএকশান করে।

সেফালোস্পোরিন ঃ- এটা সেমিসিনথেটিক এন্টিবাক্টেরিয়াল এজেন্ট যা কেমিক্যালী পেনিসিলিনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেফালোস্পোরিন বেশী মাত্রায় খেলে বিশেষতঃ যাদের পূর্ব থেকেই কোন কিডনীর অসুখ আছে তাদের জন্য মারাত্মক।

banglainternet.com

টেট্রাসাইক্লিন ঃ– পুরানা টেট্রাসাইক্লিন খাওয়ার পর অনেক রোগীর ফ্যানাকোনী টাইপ রেনাল টিবিউলার ড্যামেজ লক্ষ্য করা গেছে। যে সমস্ত রোগীর এজুটেমিয়া আছে তাদের কিডনী ফাংশান আরও কমে যায়। বিশেষতঃএজুটেমিয়ার রোগীদের ডায়ুরেটিক এবং এনাসথেটিক এজেন্ট দিলে কিডনী ফাংশান খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। টেট্রাসাইক্লিনের মেটাবলিজাম এর উপর এন্টিএনাবলিক একশান এর জন্য এ সমস্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া করে তবে এই ঔষধ প্রত্যক্ষ ভাবে কিডনীর কোন ক্ষতি করে কিনা তা এখনও পরিস্কার নয়। তবে এই গ্রুপের ডক্সিসাইক্লিন এর খারাপ প্রতিক্রিয়া নেই বিধায় কিডনী রোগীদের ক্ষেত্রে তা প্রেসক্রাইব করা যেতে পারে।

পলি মিক্সিন বি ঃ– কলিষ্টিন (পলিমিক্সিনই এবং পলিমিক্সিন বি ই) এটা ট্রাকচারালী কাছাকাছি বেশী মাত্রায় এবং অনেকদিন ধরে ব্যবহার করলে টিবিউলার নেক্রোসিস, এজুটেমিয়া বেশী হওয়া, প্রোটিনিরিয়া হওয়া কাষ্ট তৈরী এবং অলিগুরিয়া হতে পারে।

এমাইনোগ্লাইকোসাইড –– এই গ্রুপের মধ্যে জেন্টামাইসিন ও ষ্ট্রেপটোমাইসিন উল্লেখযোগ্য। এই গ্রুপের ঔষধ আইনোইজড বেসিক সাবষ্টেন্স হিসেবে শরীর থেকে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশানের মাধ্যমে অপরিবর্তিত অবস্থায় নির্গত হয়। এদের মধ্যে ষ্ট্রেপটোমাইসিন এর কিডনীর উপর প্রতিক্রিয়া খুব কম এবং নিউমাইসিনের খুব বেশী আর ক্যানামাইসিন, জেন্টামাইসিনএদের অবস্থান মাঝামাঝি। এরা কিডনীর প্রক্সিম্যাল টিবিউলসে লোকালাইজড রেনাল ড্যামেজ করতে পারে। ঔষধের মাত্রা শরীরের ওজনের অনুপাতে ভাগ করে খাওয়ালে এ সমস্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া কম হবে।

এমফোটেরিসিন বি–এই এন্টিফাংগাস কিডনীর প্রকজিম্যাল এবং ডিষ্টাল টিবিউলাসের ইপিথেলিয়াম এর নেক্রোসিস করে। কিডনীর কনসেনট্রেটিং ক্ষমতা কমে যায়। এবং হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেশান কমে যাওয়ার ফলে রেনাল টিবিউলার এসিডোসিস হয়, সঙ্গে সঙ্গে নেফ্রোক্যালসিনসিস হতে পারে। পটাশিয়াম বেশী নির্গত হওয়ার কারনে হাইপোক্যালিমিয়া হয়। যদিও ঔষধ বাদ দিলে কিডনী ফাংশান কিছুটা স্বাভাবিক হয় তথাপি কিছু কিছু কিডনীর দোষ থেকে যায়।

এনাসথেটিক রিএজেন্ট ঃ– মেথোক্সিফ্লুরেন দিয়ে এনাসথেসিয়া দেয়ার পরপোষ্ট অপারেটিভ পিরিওডে টিবিউলার ডিসফাংশান লক্ষ্য করা গেছে অনেক রোগীর। রোগীর প্রধান লক্ষন হচ্ছে পলিউরিয়া এবং ইউরিনের কনসেনট্রেটিং পাওয়ার ফিরে না পাওয়া ADH দেওয়ার পরও। অনেকের

এজুটেমিয়া এবং রেনাল ফেইলার, টিবিউলসে বেশী ক্যালসিয়াম অক্সালেট জমা হয়। ফ্লুরাইড ডিষ্টাল নেফ্রোন এর কনসেনটেট্রিং ক্ষমতা ব্লক করে দেয়ার ফলে কিডনীর ক্ষতি হয়।

নস্যি হিসেবে ব্যবহৃত ঔষধপত্র ঃ– সাম্প্রতিক বৎসরগুলোতে অনেক ধরণের ঔষধ নস্যিহিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গ্লু সলভেন্ট, ড্রাই ক্লিনিং ফ্লুয়িড, বিশেষত ট্রাইক্লোরোলিন পেইন্ট, ইত্যাদি বিশেষতঃ যুবকরা ব্যবহার করে ইউফোরিক ষ্টিমুলাই এর জন্য। এগুলো বিশেষতঃ ট্রাইক্লোরো ইথালিন হেপাটিক এবং রেনাল টিবিউলার নেক্রোসিস হয়। এর কারণ হলো প্রত্যক্ষ আঘাত বা ইমিউনোজিক্যাল মেকানিজম।

রেডিওলজিক্যাল কন্ট্রাষ্ট ঃ– এগুলোর মধ্যে প্রত্যক্ষ কিডনীর ক্ষতি করতে পারে শুধু একটি বুনামাইয়োডিল (Bunamiodyl) যা বর্তমানে খুব একটা ব্যবহৃত হয় না। খাওয়ার জন্য আয়োপ্যানোইক (Telepaque) খুব সামান্য টিবিউলার ড্যামেজ করতে পারে বেশী মাত্রায় বা স্বাভাবিক মাত্রায় ব্যবহার করলে তবে Chlorgraffin বা Billigraffin ব্যবহার করলে বিশেষত IV দিলে এটা বেশী হবার সম্ভাবণা থাকে। তবে যাদের আগে থেকেই কিডনী রোগ আছে বা যকৃতের কোন রোগ (যেমন জণ্ডিস) আছে তা হলে কিডনীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এর কারণ হলো লিভার থেকে ঔষধ ডিটক্সিফিকেশান হতে পারেনা ফলে কিডনীর উপর এ সমস্ত ঔষধের নির্গমনের চাপ বেশী পড়ে এবং রোগী ডিহাইড্রেটেড থাকলে প্রস্রাব কম হওয়ার কারণে বেশী ঔষধ নির্গত হতে পারে না। এ সমস্ত কনট্রাষ্ট পদার্থ ব্যবহার করলে ইউরিক এসিড তৈরী বৃদ্ধি পায় যার ফলেই টিবিউলাসের ক্ষতি হয়। এখন আরো কিছু নেফ্রোটক্সিক ড্রাগস এবং এগুলো ব্যবহারের পরে যে পরিবর্তন হয় তা বর্ণনা করা হোল।

নেফ্রোটক্সিক ড্রাগস ঃ

কিডনীর ফাংশনাল বা ট্রাকচারাল যে পরিবর্তন হয়।	যে ঔষধ এই পরিবর্তন করে
ক) গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট জি এফ আর	ননষ্টেরয়ডাল ইনফ্লামেটরী ঔষধ যেমন ইণ্ডোমেথোসিন
খ) পলিউরিয়া	লিথিয়াম, ডিমেক্লোসাইক্লিন মেথোক্সিফ্লুরেন
গ) পারসিসটেন্ট ট্রাকচারাল বা ফাংশনাল ড্যামেজ, আর্টিরাইটিস	ডাইফেনাইল হাইডানটয়েন, গোল্ডসলট, পেনিসিলিন, প্রফাইল থাইরোসিল, সালফোনামাইড

banglainternet.com

গ্লোমেরুলার ডামেজ —

ফোকাল নেক্রোটাইসিং গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস, ডিফিউজ প্রলিফারেটিভ গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস	হাইড্রালাজাইন, ফেনাইলবুটাজন সালফোনামাইড
ঘ) এক্যুইট টিবিউলার নেক্রোসিশ	কার্বনটেট্রাক্লোরাইড, প্যারাকুয়াট, ইথাইলিন গ্লাইকোল, এমাইনোগ্লাইকো – সাইড, ফেরাস সালফেট, পেনিসিলিন, কুইনাইন, সালিসাইলেট, প্যারাসিটামল, সেফালোরাইডিন, ফ্রুসেমাইড।
ঙ) এক্যুইড ইন্টারষ্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস	মেথিসিলাম, পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, রাইফামপিসিন, সালফোনোমাইড, থায়াজাইড, ফেনাইটয়েন, খুব স্বল্প ক্ষেত্রে ফ্রুসেমাইড, এলোপিউরিনল, ফেনোবারবিটোন, জেন্টামাইসিন, প্যারাসিটামল।
চ) এক্যুইট নেফ্রোটিক সিনড্রোম সঙ্গে হিষ্টোলজিক্যাল পরিবর্তন (মিনিম্যাল লেসিওন থেকে মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলো – নেফ্রাইটিস)	পেনিসিলামাইন, ক্যাপটোপ্রিল, গোল্ড সল্ট, টিক্সিডোন, টলবুটামাইড, প্রোবেনেসিড, ফেনিনডিওন, পারক্লোরেট, হেরোইন আসক্তি।
ছ) এস, এল, ই এর মত	হাইড্রোলাজিন, আইসোনিয়াজিড, প্রকেইনামাইড এবং স্বল্প ক্ষেত্রে মিথাইলথায়োইউরাসিল, টিক্সিডোন, রেসারপিন, মিথাইল ডোপা, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ, সালফোনামাইড, গ্রাইসিও ফুলভিন।
জ) প্যাপিলারি নেক্রোসিস	ফিনাসিটিন।
ঝ) অবষ্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিস ইন্ট্রারেনাল অবষ্ট্রাকশন সঙ্গে ইউরেট সিসটাইটিস	মেথিসারজাইড, আরগটামাইন হাইড্রালাজাইন, ডিক্সমফেটামাইন মিথাইলডোপা। হাইপারইউরেসিমিয়া যেখানে সাইটোটক্সিক ড্রাগস দিয়ে ম্যালিগন্যান্সির চিকিৎসা করা হয় বা রেডিওথেরাপিরকারণে

রেনাল ফেইলিওরে ঔষধ প্রয়োগ

বেশীর ভাগ ঔষধেরই কিছু অংশ কিডনী দিয়ে নির্গমন করে। এ সমস্ত ঔষধ স্বাভাবিক মাত্রায় রেনাল ফেইলারের রোগীকে দিলে তার ঘনত্ব বাড়তে বাড়তে টক্সিকলেভেলে পৌছে জটীল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। একটি ঔষধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকলে ডেফিনিটিভ ইণ্ডিকেশন ছাড়া রেনাল ফেইলিওরের কোন রোগীকে কোন ঔষধ দেয়া উচিৎ নয়। যদি কোন কোন ঔষধ যা সম্পূর্ণ প্রস্রাবের সঙ্গে অপরিবর্তিত অবস্থায় নির্গত হয় সেরকম ক্ষেত্রে নীচের ফর্মুলা অনুযায়ী ঔষধের মাত্রা ঠিক করতে হবে। রেনাল ফেইলিওর রোগীদের ঔষধের ডোজ –

$$\text{স্বাভাবিক ডোজ}\ \frac{\text{রোগীর ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স}}{\text{স্বাভাবিক ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স}}$$

তবে যেহেতু প্রায় বেশীর ভাগ ঔষধ কিছুনা কিছু পরিবর্তন হয়েই প্রস্রাব দিয়ে নির্গত হয় ফলে নির্গমনের জন্য মেটাবলিক প্রসেস কিছুটা বৃদ্ধি পায়। সে ক্ষেত্রে কম রেনাল ফাংশান এর ঔষধের হাফ লাইফ এর উপর প্রভাব কম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যদি রেনাল ফেইলিওর এর রোগীদের পরিবর্তিত ডোজ সিডিউল করতে হবে বা ঔষধের মাত্রা কমাতে হয় তাহলে নীচের ফর্মুলা অনুযায়ী করতে হবে।

রেনাল ফেইলার রোগীর ডোজ ইনটারভ্যাল =

$$\frac{\text{স্বাভাবিক ডোজ}}{\text{ইন্টারভ্যাল}} \times \frac{1}{f(k_S-1)+1}$$

যেখানে f = ডোজ যা স্বাভাবিক ভাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রস্রাবে নির্গত হয়।

$$ks = \frac{\text{রোগীর ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স}}{\text{স্বাভাবিক ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স}}$$

$$\text{রেনাল ফেইলার রোগীর ঔষধের ডোজ} = \frac{\text{স্বাভাবিক ডোজ} \times f(ks-1)+1}{1}$$

তবে পারত পক্ষে নীচের কিছু প্রচলিত ঔষধ পত্র যা রেনাল ফেইলারের রোগীদের ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা করে দেয়া উচিৎ বা পরিত্যাগ করা উচিৎ তা বর্ণনা করা হলো।

banglainternet.com

ঔষধের নাম	স্বাভাবিক মাত্রা	যে পথে দেয়া
ষ্ট্রেপটোমাইসিন	১ গ্রাম প্রতিদিন	ইনজেকশান
ইথামবুটাল	১.৫ গ্রাম	খাওয়ার বড়ি
রিফামপিসিন	৪৫০–৬০০মিঃগ্রাঃ প্রতিদিন	ঐ
ইথিওনামাইড	৫০০ মিঃগ্রাঃ দিনে দুইবার	ঐ
প্রপানোলোল	১০০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ৩ বার	ঐ
হাইড্রোলাজাইন	৫০ মিঃগ্রাঃ দিনে চারবার	ঐ
মিনিজক্সল	৫ –৫০ মিঃ গ্রাঃ	ঐ
নিফেডিপিন	৮০–১৬০ মিঃ গ্রাঃ তিনবার	ঐ
ক্যাপটোপ্রিল	২৫ মিঃ গ্রাঃ তিনবার	ঐ
সেটারনিন		
টলবুটামাইড	০.৫–২ গ্রাঃ প্রতিদিন	খাওয়ার
এস পিরিন	*৩০০ মিঃ গ্রাঃ ৩বার*	ঐ
প্যারাসিটামল	৫০০ মিঃ গ্রাঃ ৩ বার	ঐ
অপিয়েটস		
প্রোবেনেসিড	রেনাল ফেইলিওরে	
সালফিন	অকার্যকরী	
পাইরাজোন		
এলুপুরিনল	১০০–৩০০ মিঃ গ্রাঃ	ঐ
কলকিসিন	০.৫ মিঃ গ্রাঃ ৩বার	ঐ
এমিট্রিপটাসিন	৫০–৭৫ মিঃ গ্রাঃ	ঐ
	২৫ মিঃ গ্রাঃ তিনবার	ঐ
লিথিয়াম	০.২৫ –২ গ্রাঃ	খাওয়ার
বেনজোফ্লুয়াজাইড	৫ –১০ মিঃ গ্রাঃ	খাওয়ার
ফ্লুসেমাইড	২০–৪০ মিঃ গ্রাঃ	ঐ
ইথাক্রিনিক এসিড	৫০–১৫০ মিঃগ্রাঃ	ঐ
স্পাইরোনো		
ল্যাকটোন	১০০–২০০ মিঃ গ্রাঃ	ঐ
৭০% সরবিটাল	৫০–১০০ মিঃ লিঃ	ঐ

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া	রেনাল ফেইলিওর রোগীদের দেয়া যাবে কিনা
খুব বেশী টক্সিক। ভেসটিবিউলার এবং *নেফ্রোটক্সিসিটি*	সম্ভব হলে না দেওয়া উচিৎ
অপটিক নিউরাইটিস	সম্ভব হলে না দেওয়া উচিৎ
অপেক্ষাকৃত কম টক্সিক	দেওয়া যাবে
বমি, লিভার ডামেজ, নিউরোপ্যাথি	*দেওয়া যাবে*
কোল্ড হ্যাণ্ড	দেওয়া যাবে বা ডোজ বেশী করতে হবে।
এস,এল, ই	পরিবর্তিত ডোজে।
শরীর ফোলা, হিরসুটিজম	স্বাভাবিক মাত্রায় দেওয়া যাবে
ফ্লাশিং, মাথা ব্যাথা	ঐ
জিএফ আর কমে যায়	ঐ
কিডনী ফেইলার	না দেওয়া ভাল ল্যাকটিক এসিডোসিস করে
	স্বাভাবিক মাত্রায় দেয়া যাবে।
	ঐ
	ঐ
	পরিবর্তিত মাত্রায় দেয়া যেতে পারে।
	--
	--
পাতলা পায়খানা	পরিবর্তিত মাত্রায় দেয়া যেতে পারে।
	ঐ
ট্রেমর	স্বাভাবিক মাত্রায় দেয়া যাবে। ক্লোরপ্রমাজিন স্বাভাবিকের কম মাত্রায় শুরু করতে হবে।
পলিউরিয়া	*পরিবর্তিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।*
পটাশিয়াম লস,ইমপটেন্সি	
পটাশিয়াম লস	ডোজ বাড়াতে হবে রেনাল ফেইলিওর সংগে সংগে।
কানে না শোনা	পরিত্যাগ করা ভাল
হাইপারক্যালেমিয়া	ঐ
হাইপোক্যালিমিয়া	খুব ভাল জরুরী অবস্থায় সময়

banglainternet.com

৫ম অধ্যায়

৪র্থ পরিচ্ছেদ

কিডনী রোগ সম্পর্কিত কিছু বায়োকেমিকেল টেষ্টের স্বাভাবিক মান (এস আই ইউনিটে)

(NORMAL RANGE OF SOME BIOCHEMICAL TEST IN SI UNIT IN RELATION TO KIDNEY DISEASE)

মোঃ তাহমিনুর রহমান (সজল)

প্লাজমা	রেঞ্জ	গড়
এলবুমিন	৩৫ – ৫০ গ্রাম/লিটার (৩.৫ – ৫.০ গ্রাম / ডিএল)	৪০ গ্রাম / লিটার
এমাইলেজ	৭০ – ৩০০ আই, ইউ/ লিটার ৬৩ – ৮২ গ্রাম / লিটার (৬.৩ – ৮.২ গ্রাম / ডিএল)	

ইলেকট্রোলাইটঃ–

সোডিয়াম (Na^+)	১৩৫ – ১৪৫ মিলিইকুইভালেন্ট / লিটার	১৪০ মিলিইকু ইভালেন্ট / লিটার
পটাশিয়াম (K^+)	৩.৫ – ৫.০ ,, ,,	৪.৫ ,, ,,
ক্লোরাইড (Cl^-)	৯৫ – ১০৫ ,, ,,	১০২ ,, ,,
বাইকার্বোনেট (HCO_3^-)	২২ – ৩২ ,, ,	২৭ ,, ,,

ক্যালসিয়াম (টোটাল)	২.১ – ২.৬ মিলি মোল/লিটার (৮.৫ – ১০.৫ মিলি গ্রাম/ডিএল)	২.৪ মিলিমেল / লিটার
(আয়োনাইজড)	১.০৯ – ১.২৪ মিলি মোল/লিটার (৪.৪ – ৫.০ মিলি গ্রাম / ডিএল)	
লিপিডপ্রোফাইল		
কোলেষ্টেরল (টোটাল)	৩.৬ – ৭.৮ মিলি মোল/লিটার	৫.২ মিলিমোল/ লিটার
এষ্টার	(১৪০–৩০০ মিলি গ্রাম/ডিএল) ৬০ – ৮০ ২ টোটাল এর	
এলডিএল	১৫০ – ২০০ মিলি গ্রাম/ডিএল	
এইচডিএল	৪০ – ৫৫ মিলি গ্রাম/ডিএল	
ট্রাইগ্লিসারাইড	১৯০ মিলি গ্রাম/ডিএল পর্যন্ত	
ইউরিয়া	২.৬ মিলি মোল/লিটার (১৫ – ৩৫ মিলি গ্রাম/ডিএল)	৫.০ মি মোল/লিটার
ঘান	৭.৫ – ১৮ মিলি গ্রাম/ডিএল	
ক্রিয়েটিনিন	৪৫ – ১২০ মাইক্রোমোল/লিটার (১.৫ – ১.৪ মিলি গ্রাম/ডিএল)	৮৮ মাইক্রোমোল/ লিটার
কমপ্লিমেন্ট	০.৮ – ১.৮ গ্রাম / লিটার ৩.১৩ – ০.৪৩ গ্রাম / লিটার	
ফিব্রিনোজেন	২ – ৪ গ্রাম / লিটার	
ইমিউনোগ্লোবিউলিন		
আই জি এ	০.৫ – ৩.২ গ্রাম / লিটার	
আই জি জি	৫.৫ – ১৪.৫ গ্রাম / লিটার	
আই জি এম	০.৫ – ৩.১ গ্রাম / লিটার	
ম্যাগনেসিয়াম	০.৭–০.৯৫ মিলি মোল/লিটার (১.৭–২.৩ মিলি গ্রাম/১০০ডিএল)	০.৮ মিলি মোল/লিটার
pH	৭.৩৭ থেকে ৭.৪৫	৭.৪০
হাইড্রোজেন আয়ন	৩৫.৫ – ৪২.৭ মিলিমোল/মিলি লিটারে	

banglainternet.com

কনসেনট্রেশান		
অসমোলালিটি	২৭৫ – ২৮৫ মিলি অসমোল/কেজি	২৮০ মিলি আসমোল /কেজি
এলকালাইন (টোটাল)	১ – ৪ ইউনিট (২ – ৭ ইউনিট/লিটার)	
ফসফাটেজ		
ফসফরাস (ইনঅর্গানিক)	০.৭৫ – ১.৪ মিলি মোল/লিটার	
ইউরিয়া	১০০ – ৩০০ মাইক্রোমোল/লিটার	
২৫ OH ভিটামিন D	১৫ – ৮৫ ন্যানোমোল/লিটার	
	(৬ – ৩৪ পিকোগ্রাম ডি এল/ডি এল)	
১,২৫ $(OH)_2$ ভিটামিন D	৫৫ – ১৪০ পিকোমোল/লিটার	
	২৩ – ৫৮ পিকোগ্রাম / ডিএল	

রেনাল ফাংশনাল ক্যাপাসিটিঃ (একজন যুবক যার সারফেস এরিয়া ১.৭৩ স্কয়ার মিটার)

রেনাল	প্লাজমা	ফ্লো ঃ	৬১২ ± ৬৮ মিলি লিটার/প্রতি মিনিট
রেনাল	ব্লাড	ফ্লো	১২০০ মিলি লিটার/প্রতি মিনিট
GFR	ইনুলিন ক্লিয়ারেন্স		১১২±১৫ মিলি লিটার / প্রতি মিনিট
		২০–২৯বৎসর	১২৩ ±১৬ মিলি লিটার/ প্রতিমিনিট
		৫০–৫৯ ,,	৯৯ ± ১৫ ,, ,,
		৮০ – ৮৯ ,,	৬৫ ± ২০ ,, ,,
	ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স		ইনুলিন ক্লিয়ারেন্সের সমান
	ইউরিয়া ক্লিয়ারেন্স (যদি প্রস্রাব ২ মিঃ লিঃ/মিনিট এর বেশী ফ্লো হয়)		৭৫ মিঃ লিঃ / মিনিট

read n share
for more ebook, visit us at
banglainternet.com
banglainternet.com